আদিনা

ইতিহাস । দর্শন । সাহিত্য

দুনিয়া কাঁপানো যত বিপ্লব

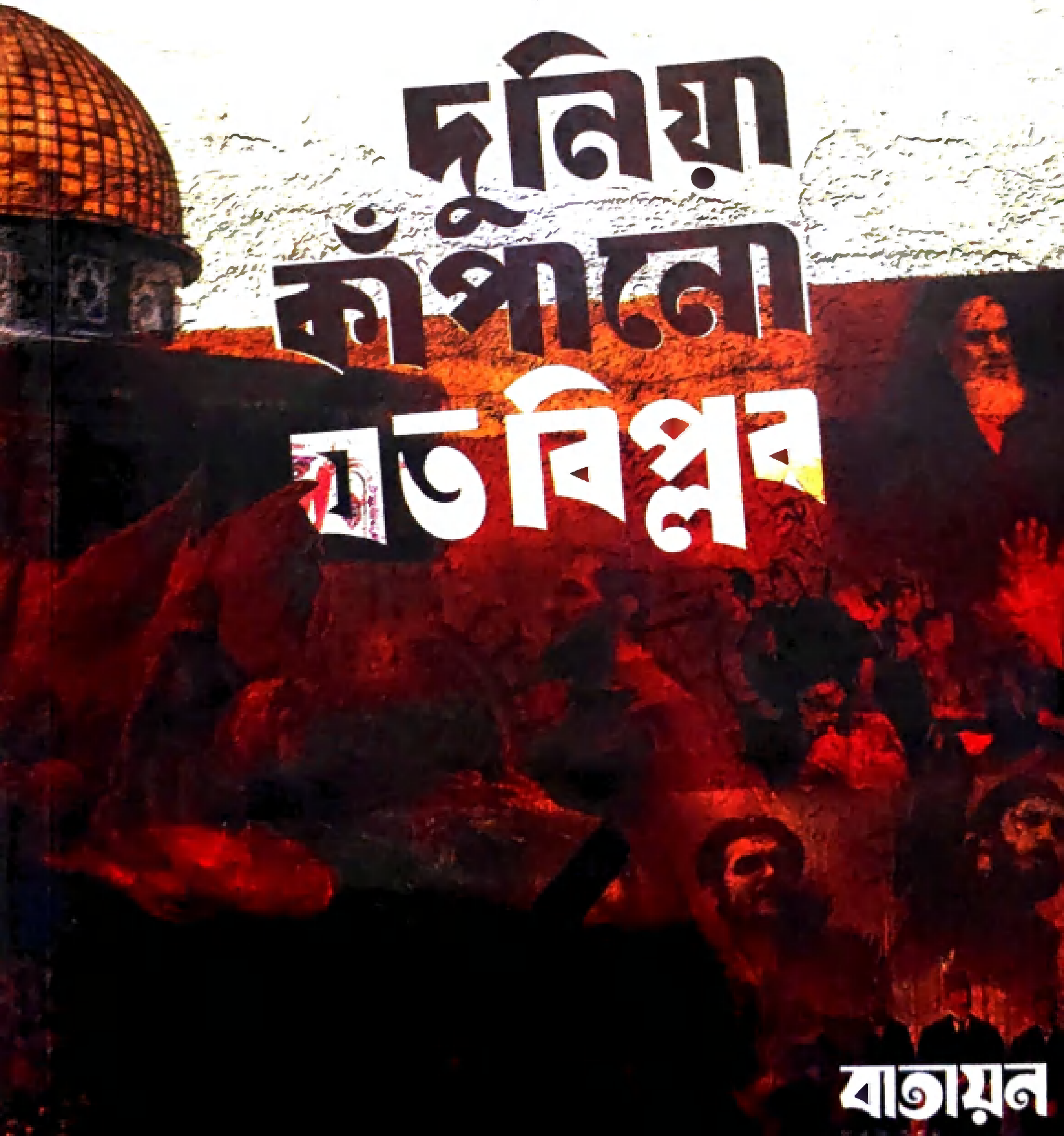

বাতায়ন

দুনিয়া কাঁপানো যত বিপ্লব

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

বাতায়ন
পাবলিকেশন

দোকান নং-২৮, কওমী মার্কেট দ্বিতীয় তলা ৬৫/১, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৯৭৩৪০৬৩০৪

আঙিনা

ইতিহাস। দর্শন। সহিত্য

সংখ্যা-৭। প্রকাশকাল : মুহাররম ১৪৪৭ হিজরি ❋ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

উপদেষ্টা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

প্রধান সম্পাদক
আরিফ খান সাদ

সম্পাদক
ফাহাদ আবদুল্লাহ

নির্বাহী সম্পাদক
আবিদ আল আহসান

সহকারী সম্পাদক
নূর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

প্রচ্ছদ ও নামলিপি
আবিদ আল আহসান
আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাসিহা

E-mail : angina.samayiki@gmail.com

নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা

সম্পাদকের কথা

সম্ভবত মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস এটাই যে, তারা থেমে গেলে আবারও পথচলা শুরু করতে পারে। নানামুখী জটিলতা ও ঝড়-ঝাপটার কারণে কখনো কখনো হয়তো তাদের থেমে যেতে হয়ে, কিন্তু পরে আবারও তারা নতুন উদ্যমে পথচলা শুরু করতে পারে। তা-ও আগের চেয়ে অনেক বেশি গুছিয়ে এবং অনেক বেশি সুন্দর করে।

মানুষ হিসেবে আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অযুত-নিযুত শুকরিয়া সেই মহান সত্তার, যিনি আমাদের থেমে যাওয়ার পর আবারও নতুন করে পথচলার সুযোগ ও সাহস দান করেছেন। এক দীর্ঘ বিরতির পর আবারও 'আঙিনা' তার পথচলা শুরু করেছে। তা-ও অনেক সুন্দর করে, গুছিয়ে—এক দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। কারণ, মানুষ তো কেবল তদবিরই করতে পারে; তাকদির তো তাঁরই হাতে।

পরিস্থিতির কারণে আমাদের থেমে যেতে হয়েছিল ঠিক, কিন্তু সময় থেমে যায়নি। পৃথিবীর ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আঙিনার নতুন এই পথচলায় আমরা প্রথমেই পৃথিবীর সমৃদ্ধ সেই ইতিহাস থেকে বিপ্লব ও বিপ্লবীদের গল্পগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই সংখ্যার প্রতিটি পাতা আমরা সাজিয়েছি তাদের ইতিহাস দিয়ে, যারা শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বুকচিতিয়ে, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন জোর আওয়াজে। তবে এখানে ইতিহাসকে আমরা তাদের দৃষ্টিতে দেখেছি, তাদের যন্ত্রণায় কেঁদেছি, তাদের স্বপ্নে নতুন দিনের আলো খুঁজেছি। আবার এটাও বাস্তব যে—আমরা সত্যের জায়গায় আপস করিনি। তাই দুয়েকটা প্রবন্ধে ভিন্নতাও দেখা যাবে।

আমাদের এই নতুন পথচলা সহজ ছিল না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, বিপ্লব শুধু ইতিহাসে নয়, মানুষের জীবনেও ঘটতে পারে। আর জীবনের এসব বিপ্লব আসলে মানুষের জেগে ওঠারই আন্দোলন। আমাদের প্রত্যাশা, জেগে ওঠার এই আন্দোলনে আপনারাও আমাদের সঙ্গী হবেন।

তাহলে চলুন, আমরা একসঙ্গে বিপ্লবীদের ইতিহাস জানি আর তাদের গল্পগুলো থেকে খুঁজে নিই নিজেদের জীবনের অর্থ।

— সম্পাদক

সুচিপত্র

ইনকিলাবে মুহাম্মাদি — ০৬
মূল : মাওলানা নঈম সিদ্দিকি। অনুবাদ : আবিদ আল আহসান

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় — ১৪
আবদুস সাত্তার আইনী

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কনস্টান্টিনোপল বিজয় — ২২
আবদুর রশীদ তারাপাশী। ফাহাদ আবদুল্লাহ

শিল্পবিপ্লবে বিশ্ব যেভাবে বদলে গেল — ৪০
আরিফ খান সাদ

আমেরিকান বিপ্লব (১৭৬৫-১৭৮৩ খ্রি.) — ৫৪
মাসউদ আহমাদ

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯) — ৬৩
মাহদি হাসান

হাইতিয়ান বিপ্লব : দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রথম সফল দাসবিদ্রোহ — ৭৪
শেখ মুজাহিদুল ইসলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগান্তকারী সিপাহি বিপ্লব — ৮৭
মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান

উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব-বিদ্রোহ — ১০০
আইনুল হক কাসিমী

সুলতান আব্দুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে ইয়াং তুর্কদের বিদ্রোহ — ১০৯
মূল : মুহাম্মাদ আল জাওয়াদি। অনুবাদ : হাসান মাহমুদ

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব ১১৪
মূল : হিস্ট্রি ডট কম টিম । অনুবাদ ও সংযোজন : মাহিম দেওয়ান

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের চীনা বিপ্লব ১২৬
মূল : অ্যালান উডস । ভাষান্তর : ফাহাদ আবদুল্লাহ

১৯৫৯ সালের কিউবা বিপ্লব ১৪৩
নূর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ইরানের ইসলামি বিপ্লব ১৫৪
মূল : হোমা কাটোজিয়ান । অনুবাদ : সুলতান মাহমুদ

১৭ ফেব্রুয়ারির বিপ্লব ১৫৯
মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা

হেফাজতে ইসলামের উত্থান এবং ১৩-এর শাপলা বিপ্লব ১৬৮
মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী

বুরকিনা ফাসো : বিপ্লব, বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের আঁতুড়ঘর ১৭৬
জমির মাসরূর

শতাব্দীর ইতিহাস বদলে দেওয়া বিপ্লব 'তুফানুল আকসা' ১৮৬
নাসরুল্লাহ ইবনে ইলিয়াস

জুলাই বিপ্লব : ১ । জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ ২০৪
আরিফ খান সাদ

জুলাই বিপ্লব : ২ । জুলাই বিপ্লব : তত্ত্ব, দর্শন ও ডিসকোর্স ২১৪
মুমিতুল মিম্মা

জুলাই বিপ্লব : ৩ । নতুন বন্দোবস্ত কি পুরানো বোতলে টিকবে? ২২০
সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সিরিয়া বিপ্লব : আহমাদ আল-শারার নেতৃত্বে এক নতুন যুগের সূচনা ২২৬
রাইয়ান আবদুল্লাহ মাকতুম

ইনকিলাবে মুহাম্মাদি

পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মহিমান্বিত বিপ্লব

মূল : মাওলানা নঈম সিদ্দিকি

অনুবাদ : আবিদ আল আহসান

❝ মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের বিপ্লবী দিকটি ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে—যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ন্যায়, সমতা এবং মানবিক মর্যাদার বিস্তার ঘটেছে। ❞

— মাওলানা নঈম সিদ্দিকী

❝ ইসলামের সূচনালগ্নে মুহাম্মাদ ﷺ এমন একটি সমাজ নির্মাণ করেছিলেন—যা একাধারে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিপ্লবের এক অতুলনীয় নিদর্শন ছিল। ❞

— স্যার উইলিয়াম মুইর, (*The life of Mohammad*)

মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর সিরাত বা জীবনী কোনো সাধারণ গালগল্প নয়, আবার এটা শুধু কোনো একজন ব্যক্তির জীবনকাহিনি কিংবা সাধারণ কোনো ইতিহাসও নয়। বরং ইতিহাস বলে, এটা এমন একটি মহান, পবিত্র ও অসাধারণ বিপ্লবের ইতিহাস, মানব-ইতিহাসে যার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না কোনো যুগ কিংবা শতাব্দীতেও। আর মহান এই বিপ্লবের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন রাসুল ﷺ নিজে। এর বাইরে আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, জাফর তাইয়ার, সাইয়িদুশ শুহাদা হামজা, বিলাল, ইয়াসির ও আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুম; এমনিভাবে বিরোধীপক্ষের আবু জাহল, আবু লাহাব, আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও কাব ইবনু আশরাফের মতো যত চরিত্র ছিল—এরা সবাই হয়তো সহযোগী, নয়তো বিরোধীর ভূমিকা পালন করেছিল। নারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা। খাদিজা হোক বা ফাতিমা, আয়িশা কিংবা জয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহুম; এরা সবাই ছিলেন সহযোগীর চরিত্রে। এর বিপরীতে আবু লাহাবের স্ত্রী কিংবা হিন্দার মতো নারীরা ছিল বিরোধী চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন এই চরিত্রগুলোর সহযোগিতা কিংবা বিরোধিতার ফলেই ইতিহাসের সেই সোনালি অধ্যায়টি রচিত হয়েছে, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা জুড়েই ছেয়ে

আছে রাসুল ﷺ-এর পবিত্র ও সুবাসিত সিরাত। রাসুলের সিরাতের সেই মহান বিপ্লবী আদর্শের প্রভাব তাঁর অনুসারী মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের জীবনেও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এবং সমগ্র পৃথিবীকেও তা বিস্মিত করেছিল। এখন কথা হচ্ছে, রাসুল ﷺ-এর সিরাতকে যদি এই ভালোবাসা-সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব-বিরোধিতা থেকে আলাদা করে নতুন কোনো আঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়, তবে তা শুধু জটিল কাজই নয়—বরং অসম্ভবও।

নাউজুবিল্লাহ! রাসুল ﷺ কোনো সংসারত্যাগী—দুনিয়াবিমুখ সন্ন্যাসী ছিলেন না, আবার তিনি শুধু একটি সাধারণ প্রথা-পার্বণে সীমাবদ্ধ এবং তথাকথিত শান্তির বুলি কপচানো ধর্ম বা মতবাদের সবক শেখাতেও আসেননি। তাঁর দায়িত্ব ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া বা কিছু নৈতিক উপদেশ প্রদানেরও মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বলা যায়, তাঁর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি দল তৈরি করা, যার প্রতিটি সদস্য হবেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শনকারী এবং পবিত্র চরিত্রে সজ্জিত। আল্লাহর রাসুলের নেতৃত্বে যারা চেষ্টা-সংগ্রামের মাধ্যমে সত্য ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীর বাকি সব মতবাদ, দর্শন ও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, যাতে وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ—দীন-ধর্ম পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে যায়।' অর্থাৎ যাতে সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আর মানবজাতিও অন্য সব ইলাহকে বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর জন্য ইবাদত-বন্দেগি করে।

বিষয়টি আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য আমরা কয়েক জায়গায় বলা রাসুল ﷺ-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বা ভবিষ্যদ্‌বাণীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, রাসুল ﷺ তাঁর দাওয়াতি কাজের প্রথম দিকের কঠিন সময়েও তিনি কী করতে যাচ্ছেন, সেই ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। দাওয়াতি কাজ শুরু করার পরপরই প্রথমে তিনি বনু হাশিমের নেতৃবৃন্দকে আপ্যায়নের জন্য একত্রিত করেন। তারপর তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলেন : 'তোমাদের কাছে আমি যে পয়গাম পৌঁছে দিচ্ছি, যদি তোমরা সেটা কবুল করে নাও—তবে তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ।' এমনিভাবে দাওয়াতের সংকটময় সেই প্রথম দিকের সময়টাতেই একবার তিনি নিজের বিরোধীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 'আমি শুধু তোমাদের একটি কালিমার দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। মাত্র একটি কালিমা। যদি তোমরা তা কবুল করে নাও, তবে তার বদৌলতে তোমরা পুরো আরবকে পদানত করতে পারবে। আর পুরো অনারব বিশ্বও তোমাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবে তখন।'

এমনই আরেক দিনের ঘটনা। আল্লাহর রাসুল ﷺ কাবার দেওয়ালের সঙ্গে হেলান

দিয়ে বসেছিলেন। খাব্বাব ইবনুল আরাত—সেই দিনগুলোতে যিনি কুরাইশের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার ছিলেন—রাসুল ﷺ-এর কাছে আরজি পেশ করে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন না?' প্রতিউত্তরে রাসুল ﷺ বললেন : 'তোমাদের পূর্বে এমন লোকেরাও অতিবাহিত হয়েছে, যাদে জন্য গর্ত খনন করে তাদের পুরো শরীর সেই গর্তে পুঁতে দেওয়া হতো। এরপর করাত দিয়ে তাদের মাথা চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এমনিভাবে লোহার তৈরি চিরুনির সাহায্যে জীবন্ত অবস্থায় তাদের মাংস এবং চামড়া হাড় থেকে তুলে নেওয়া হতো। এত ভয়াবহ সব নির্যাতনও তাদেরকে দ্বীন ও ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।' এরপর তিনি বলেন : 'আল্লাহর শপথ, এই দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা এমন এক পূর্ণতা দান করবেন যে, একসময় এক আরোহী সানআ থেকে হাজরামাওত পর্যন্ত একা একা ভ্রমণ করতে পারবে। তখন তার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ভয় থাকবে না। নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বোধ করবে।'

মদিনার যুগে একবার তিনি আদি ইবনে হাতিম তায়ির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : 'আল্লাহর শপথ, সেই দিন শিগ্‌গির আসবে, যেদিন তুমি শুনতে পাবে, একজন একাকী নারী সুদূর কাদিসিয়া থেকে বের হয়ে মক্কায় হজ করতে আসবে আর তার মনে কোনো ভয় থাকবে না।'

এই উক্তিগুলো থেকে যে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় তা হচ্ছে—রাসুল ﷺ-এর লক্ষ্য ছিল ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, ন্যায়বিচার ও শান্তির আধার এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে দুর্বল এবং একজন একাকী মানুষ পর্যন্ত সব ধরনের ক্ষতি ও জুলুম থেকে নিরাপদ থাকবে।

এটাই ছিল সেই মহান, মহিমান্বিত ও চূড়ান্ত লক্ষ্য—যেখানে সমগ্র মানবজাতির নেতা, মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ নিজের পুরো জীবনকে ব্যয় করে দিয়েছেন এক কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল, জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত সেই আরব সমাজকে আলোর দিকে নিয়ে আসা। শৃঙ্খলার অভাবে জর্জরিত মানুষগুলোকে একটি চমৎকার ও ঐশী শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা। অপরাধের আখড়া হয়ে যাওয়া সেই রাষ্ট্রকে জাহিলিয়াতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে একটি ইসলামি ও কল্যাণের রাষ্ট্রে পরিণত করা। সামগ্রিকভাবে এই মহামানব এমন এক সমাজের সংস্কারকর্মে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন, যেখানে দুর্বৃত্ত ও উগ্র স্বভাবের লোকেরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করেই সব শক্তি ক্ষয় করে যাচ্ছিল।

***

এই মুহাম্মাদি বিপ্লবের ভিত্তি ছিল 'কালিমায়ে তাইয়িবা'। যার মূলকথা হচ্ছে, এই

মহাবিশ্বের এবং সমগ্র মানবজাতির একজনই ইলাহ (উপাস্য) রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। ইবাদত-বন্দেগিও কেবল তাঁর জন্যই হবে এবং শাসন আর আইনও কেবল তাঁরই চলবে। অন্য কারও শাসন বা আইনকানুন কোনোভাবেই চলবে না। মানুষ শুধু তাঁর কাছেই নিজেদের প্রয়োজনের মিনতি করবে, দুআর জন্য হাত তুলবেও শুধু তাঁর দরবারেই। এমনিভাবে যাবতীয় মানত আর কুরবানিও তাঁরই উদ্দেশ্যে পেশ করা হবে। আকিদার ক্ষেত্রে এটা অন্তরের গভীরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, আমলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানকারীও একমাত্র তিনিই। জীবনের প্রতিটি দিক অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য, রিজিক, নিরাপত্তা, সম্মান—সবকিছু তাঁরই দান। জীবনে আর কোনো ইলাহের স্থান নেই। কোনো রাজাবাদশা, শাসক, মন্ত্রী, প্রভাবশালী পরিবার বা বংশ, বিত্তশালী, পুরোহিত, পাদরি কিংবা সমাজের ক্ষমতাবান কোনো নেতা তো দূরের কথা, এমনকি মানুষের ওপর তার নিজের নফসের কর্তৃত্বও চলবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে-ই নিজের কর্তৃত্বের দাবি করে, নিজের মর্জি মাফিক মানুষকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, নিজের আইন চালাতে চায়; এমনিভাবে অন্যদের মাথা নিজের সামনে বা অন্য কারও সামনে অবনমিত করতে চায়, কিংবা মানুষের প্রয়োজন পূরণের দাবিদার হয়ে ওঠে, সে-ই তাগুতের ভূমিকা পালন করে এবং বাতিল চিন্তা, দর্শন ও মতবাদ নিয়ে হাজির হয়।

এই বিপ্লবী কালিমার দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে : মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা নিজের রাসুল বা শরিয়তপ্রণেতা বার্তাবাহক হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে ওহির মাধ্যমে সঠিক পথ ও বিভ্রান্তি, সৎকর্ম ও পাপকর্ম এবং হালাল ও হারামের জ্ঞান দান করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত নেতা, পথপ্রদর্শক, শিক্ষক ও তরবিয়ত প্রদানকারী—সর্বোপরি উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় ও মহান আদর্শ।

এই বিপ্লবী কালিমার বীজ থেকে এমন সাম্য, ন্যায়, দয়া ও অনুগ্রহের এমন একটি পবিত্র বৃক্ষের উৎপত্তি ঘটেছে, একদিকে যার শাখাগুলো আকাশের উচ্চতাকে ছুঁয়েছে এবং পুরো আকাশমণ্ডলে বিস্তৃত হয়ে গেছে। আবার অন্যদিকে এর শিকড়গুলো মাটির গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। আর এই পবিত্র বৃক্ষের ছায়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এর চেয়েও চমৎকার বিষয় হচ্ছে, এর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ফল-ফুলের কিছু অংশ পৃথিবীর প্রতিটি জাতি, প্রতিটি সভ্যতা এবং প্রতিটি ভূখণ্ড ও সমাজ লাভ করেছে।

***

মুহাম্মাদি বিপ্লবের একটি বিস্ময়কর দিক হলো, যে ব্যক্তিই আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ

ﷺ-এর এই দ্বীন ও পয়গাম কবুল করে নিয়েছে, তার পুরো অস্তিত্বই আমূল বদলে গেছে। তার চিন্তার কাঠামো, ভাবনার ধরণ, আবেগ-অনুভূতি, রুচি-অভিরুচি, আগ্রহ, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক এবং তার আদব-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতার মানদণ্ড—একেবারে সবকিছু বদলে গেছে। মহান এই বিপ্লবের সুফল হয়েছে, চোর ও ডাকাতরা পর্যন্ত অন্যের সম্পত্তির প্রহরী বনে গেছে। ব্যভিচারীরা যখন এই দাওয়াত ও বিপ্লবের ধারক হয়েছে, তারা অন্যদের ইজ্জত-আবরু ও সতীত্বের রক্ষকে পরিণত হয়েছে। সুদখোররা তাদের আয়-উপার্জন আল্লাহর দ্বীন এবং তাঁর বান্দাদের সেবায় ব্যয় করতে শুরু করেছে। সবার মধ্যে এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। সমাজে দাম্ভিকতার মূর্তি হয়ে থাকা মানুষগুলো পর্যন্ত বিনম্রতার আদর্শে পরিণত হয়েছে। প্রবৃত্তির পূজারিরা যখন এই দ্বীনের অনুসারী হয়েছে, মুহূর্তের মধ্যে পুরো পৃথিবী দেখতে পেল—প্রবৃত্তির সব চাওয়া-পাওয়াকে পেছনে ফেলে তারা দুনিয়াবিমুখতা ও আখলাকের এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। এই বিপ্লবের তুমুল পরিবর্তন থেকে সবাই হিসসা মজার বিষয় হচ্ছে, সমাজের অজ্ঞরা যখন এই দাওয়াত ও বিপ্লবের ধারক হয়েছে, পৃথিবী বিস্ময়ভরা চোখে দেখেছে, তাদের একেকজন জ্ঞানের আকাশের সুরাইয়া তারকায় পরিণত হয়েছে। ভ্রমণ করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সপ্ত আকাশ। মজার বিষয় হচ্ছে, উটের কঠিন হৃদয়ের রাখালরা পর্যন্ত মমতায় পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে সত্যিকারের পশুপালকে হয়ে উঠেছে। আর দাস-দাসীদের নিপীড়িত শ্রেণি থেকে এমন সাহসী, মহান ও গৌরবময় ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এসেছে, যারা মুহাম্মাদি বিপ্লবের শত্রুদের সমস্ত অত্যাচার তো সয়ে গেছেন, কিন্তু নিজেদের ঈমানের সওদা করেনি। শত্রুরা কোনোভাবেই তাদের বিশ্বাসে চির ধরাতে পারেনি; এবং তাদের আত্মবিশ্বাসেও কোনো ভাঙন ধরেনি।

মুহাম্মাদি বিপ্লবের এই স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং নিয়মনীতির প্রতি এক বিস্ময়কর আনুগত্য ছিল। এই আনুগত্য এতটা বিস্ময়কর ছিল যে, নামাজে থাকা অবস্থায় যখন কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা তৎক্ষণাৎ পূর্বের কিবলা বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন তাদের জন্য মদ হারাম করা হয়, তখন তারা নিজেদের চুমুকের কাছে থাকা পেয়ালাগুলো পর্যন্ত ফেলে দেন। যখন রাসুল ﷺ-এর জবানি থেকে তাদের নারীরা হিজাবের নির্দেশনা পায়, কোনো বিতর্ক না করেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মাথা, বুক ও অন্যসব সৌন্দর্য ঢেকে ফেলেন। তাদের মধ্যে যদি কোনো পুরুষ বা নারী আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশের বিপরীত কাজ করতেন, নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে তারা দাবি করতেন—তাদের ওপর শাস্তি কার্যকর করে রাসুল যেন তাদের পবিত্র বানিয়ে দেন। এমনিভাবে যখন যুদ্ধ বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে তাদের দান করতে বলা হতো, তাদের কেউ কেউ নিজেদের সব গৃহস্থালি জিনিসপত্র মসজিদে এনে রেখে দিতেন,

কেউ আবার সারি সারি উটে ভরা জিনিসপত্রের স্তূপ তৈরি করতেন। বিস্ময়কর শোনালেও সত্য তো এটাই যে, তাদের শ্রমিকরা পর্যন্ত নিজেদের সারাদিনের উপার্জিত কয়েকটি খেজুর দান হিসেবে পেশ করতেন।

মানবসভ্যতার ওপর শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর এটাও একটা অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষের সব সম্পর্ক ও বন্ধনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, একে-অন্যের প্রতি থাকা দায়িত্বগুলোর কথা স্পষ্ট করেছেন, সবার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁর আদর্শিক সমাজে পিতামাতার ও সন্তানের, ভাইবোনের, স্বামী-স্ত্রীর, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর, ধনী-গরিবের, প্রতিবেশী ও সফরসঙ্গীর এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের পুরো কাঠামোকে খুবই চমৎকার ও আদর্শিক রূপ দিয়েছেন।

***

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—মানুষের সত্তায় ও হৃদয়-জগতে ঘটে যাওয়া এই বিপ্লবের ফলস্বরূপ আরব সমাজে যে বিপ্লব দেখা যায়, সত্যিকার অর্থেই তা ছিল চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। যখন রাসুল ﷺ মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন বেশির বেশি তা ১০০ বর্গমাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী মাত্র আট-নয় বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই এই রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়ে ১০-১২ লাখ বর্গমাইল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এটি ওহি-স্নাত এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ছিল, যেখানে কোনো ফিরকাবাজি বা শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব-বিবাদ ছিল না, যেখানে বংশ ও বংশীয় গর্বের কোনো স্থান ছিল না, যেখানে ধনী-গরিব ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত এককথায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ ভাই ভাই হয়ে একত্রিত হয়েছিল, যেখানে অপরাধের হার ছিল প্রায় শূন্য, যেখানে কেউ অন্যের উপর জুলুম করত না, সরকারি সম্পদ ও দায়িত্বে খিয়ানত করত না, ঘুসগ্রহণের চর্চা ছিল না, প্রতিটি মানুষ তার সহকর্মীকে সাহায্য করত এবং একে-অপরকে সমর্থন দিত। হ্যাঁ, এটা আসলেই সাধারণ কোনো দাওয়াত বা রাষ্ট্রগঠনের কাজ ছিল না; বরং এটা ছিল নতুন পৃথিবী গড়ার এবং পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়ার এক মহৎ অভিযান। এক মহিমান্বিত বিপ্লব।

এই পবিত্র, স্বচ্ছ-সুন্দর ও মহিমান্বিত বিপ্লব মানুষের ওপর জোর-জবরদস্তি করে আসেনি। এই বিপ্লবের বার্তা গ্রহণ করানোর জন্য কাউকে হত্যা করা হয়নি, কারাগারে রাখা হয়নি, কাউকে চাবুকও মারা হয়নি, কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়া হয়নি এবং কোনো ভয়-ভীতিও ছড়ানো হয়নি। সবকিছুর ঊর্ধ্বে বরং এই বিপ্লবের রুহ ছিল মানবতার প্রতি ভালোবাসা। রাসুল ﷺ অত্যন্ত স্নেহ, মায়া ও মমতার সঙ্গে শিক্ষকসুলভ আচরণের মাধ্যমে প্রথমে মক্কায় ১৩ বছর আর তার পর মদিনায় ১০ বছর পর্যন্ত এই কাজ আনজাম দিয়েছেন।

মক্কার যুগে তিনি গালি শুনে, তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হয়ে, কুরাইশের লোকদের হাতে মারধর খেয়ে—সর্বোপরি তিন বছর পর্যন্ত পরিবারসহ শিয়াবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ থেকেও এক বিস্ময়কর নম্রতা ও ভালোবাসার সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গী-সাথিদের উত্তপ্ত বালির ওপর শোয়ানো হয়েছে, তাদের বুকের ওপর পাথর রাখা হয়েছে, তাদের পিঠের নিচে জ্বলন্ত কয়লা পর্যন্ত নিভে গেছে, কারও কারও গলায় আবার দড়ি দিয়ে শহরের রাস্তায় টানাহেঁচড়া করা হয়েছে, কাউকে আবার মেরে মেরে অর্ধমৃত করা হয়েছে আর কেউ কেউ তো অতিরিক্ত নির্যাতনের কারণে শহিদও হয়েছেন। এরপর মদিনার যুগে তাঁকে ইহুদিদের শয়তানি এবং মুনাফিকদের গাদ্দারির শিকার হতে হয়েছে। এমনকি বহুবার রাসুল ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আল্লাহর রহমতে বেঁচে গিয়েছিলেন। এতকিছুর পরও ইহুদি ও মুনাফিকদের বড় একটি অংশ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সেখানে অবস্থান করে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেদের শয়তানি কর্মকাণ্ডও চালিয়ে যেতে থাকে।

রাসুল ﷺ যদি যুদ্ধের মাঠে মুসলিম শক্তিকে নামাতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তবে তার কারণ ছিল বিরোধী জাহিলি শক্তির নেতা ও পতাকা বহনকারীদের বারবার চালানো আক্রমণ। বদর ও আহজাবের মতো তিনটি বড় বড় যুদ্ধ মদিনার একেবারে দরজার সামনে লড়া হয়েছিল। শুধু শেষ একটি যুদ্ধ—যার প্রথম ধাপে মক্কা আর দ্বিতীয় ধাপে হুনাইন ও তায়েফ বিজিত হয়েছিল—তা অবশ্যম্ভাবী হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল; কারণ সেগুলো শত্রুদের যুদ্ধ-সক্ষমতা এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল। যদি এই কেন্দ্রগুলোকে আপন অবস্থা থাকতে দেওয়া হতো, তবে যুদ্ধের এই প্রক্রিয়া হয়তো অন্তহীন রূপ ধারণ করত আর কখনোই শেষ হতো না। তেমনিভাবে বনু মুসতালিক ও খাইবার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল, ভয়ংকররকমের সব বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রমূলক সব কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করা। আর বাকি অন্যসব ছোট ছোট যুদ্ধ বা সংঘর্ষগুলো সাধারণত লুটেরাদের দমনের জন্য পরিচালিত হতো। অনেক সময় আবার সেগুলো সীমান্তে সংঘটিত বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদের চেয়ে বেশি কিছু হতো না। সবচেয়ে সুন্দর ও অভূতপূর্ব ব্যাপার হচ্ছে, যুদ্ধগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তার নবি মুহাম্মাদ ﷺ এমন সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যার কারণে শত্রুদের সর্বোচ্চ কমসংখ্যক লোক নিহত হয়েছিল। আরও সহজ করে বললে, তিনি অধিক প্রাণহানি এড়ানোর কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেননি।

এরপর আবার যুদ্ধের সময়েও তিনি ইসলামের সৌন্দর্য ও মুসলিমদের চারিত্রিক উৎকর্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে উঁচু স্তরের নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন। যেমনটা আমরা মাত্রই বলেছি, এর পেছনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ইসলামের সৌন্দর্য এবং মুসলিমদের চারিত্রিক উৎকর্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। নয় বছরের সব যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘর্ষে শত্রুদের মাত্র ৭৫৯ জন লোক নিহত হয়েছে অর্থাৎ প্রতি বছরে ৮৪ জন।

অন্যদিকে মুসলিমদের মোট প্রাণহানি হয়েছিল ২৫৯ জনের। তাহলে ৮-৯ বছরের এই সময়কালে সংঘটিত হওয়া সব যুদ্ধে দুই পক্ষের মোট মৃত্যুসংখ্যা হচ্ছে ১০১৮টি।

***

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—সমগ্র পৃথিবীর বিশেষ করে আজকের সভ্য পৃথিবীর ইতিহাস যদি আমরা ঘেঁটে দেখি, তাহলে এমন আর কোনো বিপ্লবের সন্ধান পাওয়া যাবে, যাতে মুহাম্মাদি বিপ্লবের মতো এত কম প্রাণহানি ঘটেছে? যে বিপ্লবে এত অল্প সংখ্যক প্রাণহানির মধ্য দিয়ে এমন বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেও কি এমন বিপ্লবের দৃষ্টান্ত আছে আর? এই তথাকথিত সভ্য পৃথিবীতে বিপ্লব তো এক দৈত্য-দানবের মতো আসে এবং হাজারো নিরপরাধ বনি আদমের জীবন কেড়ে নেয়। তারপর বিপ্লবী সরকারগুলো যখন এক স্বৈরাচারী সিংহাসনে বসে, তখন তারা মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে, তাদের জেলে পুরে দেয়, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয় আর একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে রাখে। তিক্ত শোনালেও বাস্তবতা হচ্ছে, এই সংঘর্ষমূলক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবগুলো মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকেই পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে। অথচ আমরা যখন মুহাম্মাদি বিপ্লবের রহমত ও বরকতকে সামনে রেখে অন্য বিপ্লবী মতবাদ ও দর্শনগুলোকে দেখার এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তখন এটা একেবারে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় যে, সেগুলো আসলে হকপন্থি কোনো মতবাদ তো নয়ই; বরং বাতিলেরই বিভিন্ন রূপ।

এজন্য সিরাত অধ্যয়নে আমাদের চিন্তা ও উদ্দেশ্য হতে হবে—আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পয়গাম-হাদিস, জিকির ও ইবাদত, আখলাক, কর্মবিন্যাস, সংগঠন, কীর্তি, পথ ও পদ্ধতি এবং কর্মকৌশলকে গভীরভাবে উপলব্ধি করব। তারপর এ সবকিছুকে সামনে রেখে নিজেদের মধ্যে মুহাম্মাদি বিপ্লবের সূচনারেখা টানার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। একসময় যখন নিজেদের মধ্যে মুহাম্মাদি বিপ্লবের ছাপ পড়তে থাকবে, তখন আমরা শুধু আমাদের দেশ ও সমাজকেই নয়; বরং পুরো মানবজাতিকে মুহাম্মাদি বিপ্লবের কল্যাণ ও বরকত দ্বারা উপকৃত করতে পারব। যে বিষয়টা আমাদের মন ও মস্তিষ্কের গভীরে বেশ ভালোভাবে গেঁথে নিতে হবে তা হচ্ছে, একমাত্র রাসুলকেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সবকিছুর জন্য নেতা, পথপ্রদর্শক ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনো দার্শনিক, বিপ্লবী, সমাজ সংস্কারক, রাজনৈতিক নেতা কিংবা আইন প্রণেতাকে নেতা বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। নতুবা আল্লাহর পানাহ—আমাদের জীবনের সবকিছুই আল্লাহর দরবারে বাতিল ও নিরর্থক সাব্যস্ত হবে।[১]

[১] সাইয়িদে ইনসানিয়াত, পৃ.৭-১৩

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

আবদুস সাত্তার আইনী

“ইতিহাসে সালাহউদ্দিনের মতো মহানায়কদের আগমন খুব কমই হয়েছে—যারা বিজয়ের পরও শত্রুদের প্রতি এমন দয়া ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর জেরুসালেম বিজয় ছিল মানবতার ইতিহাসের এক সত্যিকারের বিপ্লব।”

— জেমস রেস্টন জুনিয়র, (*Warriors of God : Richard the Lionheart and Saladin in the Third Crusade*)

“সালাহউদ্দিন এমন একজন নেতা ছিলেন, যিনি কেবল জেরুসালেম পুনরুদ্ধারই করেননি, বরং পুরো পৃথিবীকে ন্যায়বিচার এবং উদারতার এক অনন্য সবক শিখিয়েছেন। তাঁর বিজয় শুধুই সামরিক সাফল্য নয়, এটি ছিল মানবিক মূল্যবোধেরও বিজয়।”

— কারেন আর্মস্ট্রং, (*Holy War : The Crusades and Their Impact on Today's World*)

পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস ঘিরে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের অসংখ্য ইতিহাস। তবে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ইতিহাসের বিস্ময়কর এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার সময়ে খ্রিষ্টান বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য ক্রুসেডার শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ ছদ্মবেশী শত্রুদের উত্থান ঘটে। তিনি একইসঙ্গে বহিঃশক্তি ও অভ্যন্তরীণ অপশক্তির বিষদাঁত উপড়ে ফেলেন এবং বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেন। খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত ইউরোপ বহু প্রাচীন কাল থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষাপন্ন ছিল; পুরুষের পর পুরুষ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আসছিল। প্রাচ্যের পবিত্র স্থানগুলো এবং হজরত ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের জন্মস্থানও তাদের কর্তৃত্বাধীন চলে গিয়েছিল। কয়েকটি শক্তিশালী ইসলামি সাম্রাজ্যের উপস্থিতি এবং তাদের পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত

রাষ্ট্রসমূহে উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে খ্রিষ্টানরা শাম (সিরিয়া), ফিলিস্তিন বা কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। তবে তারা সেলজুক সাম্রাজ্যের পতন এবং ইসলামি সাম্রাজের উত্তর সীমান্তের দুর্বলতা লক্ষ করে সাহসী ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠল। সেই সময় তারা পুরোহিত সেন্ট পিটার্সের ব্যক্তিত্বে এক অনলবর্ষী বক্তা ও প্রভাবসঞ্চারী ধর্মীয় উপদেশদাতা পেয়ে গেল। তিনি তাঁর আগুনে ও গর্জানো বক্তৃতা দ্বারা খ্রিষ্টান-বিশ্বের সাধারণ মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং খ্রিষ্টান দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মীয় মাতলামির এক উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। আরও কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রুসেড যুদ্ধকে মানুষের কাছে শোভনীয় করে তোলে।

ক্রুসেডারদের প্রথম বাহিনী ৪৯০ হিজরিতে শামের (সিরিয়ার) দিকে অগ্রসর হয় এবং মাত্র দুই বছরের মধ্যে রিহা ও আন্তাকিয়া এবং তাদের অধিকাংশ দুর্গে আধিপত্য বিস্তার করে। ৪৯২ হিজরিতে (১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে) তারা বাইতুল মুকাদ্দাসও দখল করে নেয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ফিলিস্তিনের বৃহৎ অংশ এবং সিরিয়ার উপকূলীয় এলাকা—আনতারাতুস, আক্কা, পূর্ব তারাবলুস (ত্রিপোলি) ও সাইদাও তাদের করতলগত হয়। বিখ্যাত ইংরেজি ইতিহাসবিদ স্ট্যানলি লেন পুল ইসলামি দেশগুলোতে ক্রুসেড যোদ্ধাদের অভিযানকে চিত্রিত করেছেন এভাবে : 'ক্রুসেড যোদ্ধারা দেশগুলোতে ঢুকে পড়েছিল যেভাবে কোনো লোক পুরোনো জীর্ণ কাঠ ফেড়ে ফেলে। কিছুটা সময়ের জন্য হলেও মানুষের মনে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, ক্রুসেডাররা অচিরেই ইসলাম-বৃক্ষের কাণ্ডকে দুমড়েমুচড়ে ফেলবে এবং তার শাখাপ্রশাখাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।'

ক্রুসেডারদের হাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন মুসলিম জাহানের দুর্বলতা ও পতন এবং খ্রিষ্টান বিশ্বের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা ঘোষণা করছিল। এটা ছিল মুসলিম জাহানের জন্য ভয়ংকর বিপর্যয়ের সতর্কবার্তা। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে চারটি খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় : জেরুজালেম, আন্তাকিয়া, তারাবলুস (ত্রিপোলি) ও রিহা। এটা ইসলামের কেন্দ্রভূমির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান দুর্যোগ ও খোলা তরবারির আকার ধারণ করেছিল। খ্রিষ্টানদের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় অভিযান চালানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা শরিফের ব্যাপারেও ধৃষ্টতাপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করে।

ক্রুসেডাররা দীর্ঘ ৮৮ বছর বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর কর্তৃত্ব করে। অবশেষে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি হিত্তিনের যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। হিত্তিনের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের ফলে ফিলিস্তিনের খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত পরিণাম নিশ্চিত হয়। ৫৮৩ হিজরি ২৪ রবিউস

সানি শনিবার (৪ জুলাই, ১১৮৭ খ্রি.) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রকাশ্য বিজয় দান করেন। ইতিহাসবিদ স্ট্যানলি লেনপুল যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র অঙ্কিত করেন এভাবে : 'এটা ছিল মূলত চূড়ান্ত ব্যাপার। ফিরিঙ্গিরা কূপের উদ্দেশে রাস্তা তৈরির চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করেছিল। 'সত্য ক্রুশকাষ্ঠ'—যা ক্লেশদীর্ণ অভিযাত্রা ও আশাহীন যুদ্ধে তাদের পতাকাসমূহের মাঝে ছিল—অবিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) হস্তগত হয়েছিল। আক্কার যে বিশপ এই ক্রুশকাষ্ঠ ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছিলেন, তিনি তার দেহে বর্ম থাকা সত্ত্বেও নিহত হয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তারা তৃষ্ণায় পীড়িত এবং গরম ও কঠোর পরিশ্রমে বিধ্বস্ত হয়ে তাদের ঘোড়াগুলোকে ত্যাগ করেছিল এবং নিজেদের চরম হতাশায় তাপ-ঝলসানো ঘাসের ওপর নিক্ষেপ করেছিল। এমন মুহূর্তে আরবরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তাদের পক্ষ থেকে কোনোরকম প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়নি। অশ্বারোহীরা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তাদের জীবনগুলো বিকিয়ে দিতে পারছিল না। তারা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করেছিল।'

'খ্রিষ্টান বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বন্দি হয়েছিলেন। জেরুজালেমের রাজা গাই, তার ভাই (দ্বিতীয় আমালরিক), কির্ক-এর শাসনকর্তা রেজিনাল্ড, জোসেলিন, হামফ্রে, নাইটস টেম্পলার ও নাইটস হসপিটার্লাস এবং আরও অনেক সম্মানিত ব্যক্তি বন্দি হয়েছিলেন। কাউন্ট র‍্যামন্ড আরবদের ব্যূহ ভেদ করে গিয়ে যখন দেখতে পেলেন যে রাজা গাই বন্দি হয়েছেন—যতদিন তিনি সুরে (Tyre) নিরাপদ ছিলেন লাগাম ছাড়েননি—তখন তার দুঃখ ও লজ্জায় মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। রূপকথাগুলো তার স্মৃতির প্রতি তেমন সুবিচার করেনি। তিনি জুদাসে পরিণত হয়েছিলেন, যে জুদাস খ্রিষ্টান-জগতের সঙ্গে প্রতারণামূলক আচরণ করেছিল। ভ্রাম্যমাণ অভিনেতা ও গীতিকারেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলে বেরিয়েছে যে, কীভাবে র‍্যামন্ড রাজা গাইয়ের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং 'সত্যক্রুশ' অবিশ্বাসীদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বালিয়ানও—যিনি অগ্রবর্তী সেনাপ্রহরায় ছিলেন—সাইদার রাজপুত্রের সঙ্গে পালিয়েছিলেন।'

'ফিলিস্তিনের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুসলমান রক্ষীদের হাতে ছিলেন। সাধারণ সৈন্যদের যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাই বন্দি হয়েছিল। একেকজন আরবকে দেখা যাচ্ছিল তিরিশজন করে খ্রিষ্টানকে বন্দি করে তাঁবুর রশি দিয়ে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভেঙে যাওয়া ক্রুশকাষ্ঠ ও কর্তিত হাত-পাসমূহের মাঝে পাথরের ওপর পাথরের মতো মৃতদেহের স্তূপ পড়ে ছিল। আর ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাগুলো পর্যাপ্ত তরমুজ-শস্যের মতো মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ময়দানে দীর্ঘদিন যাবৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চিহ্ন থেকে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, এই যুদ্ধে ৩০ হাজার খ্রিষ্টান নিহত হয়েছিল। এক বছর পরও ধূসর হাড়গোড়ের স্তূপ দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। পাহাড় ও উপত্যকাগুলোতে বন্য জন্তু-জানোয়ারের ভয়ংকর ভোজনোৎসবের

উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।'

হিত্তিনের যুদ্ধের খুব দ্রুতই সেই শুভ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, যার জন্য সুলতান কয়েক বছর ধরে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মনেপ্রাণে কামনা করছিলেন। তা হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের জয়।

৫৮৩ হিজরির ২৭ রজব (অক্টোবর ২, ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান আইয়ুবি বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। ৯০ বছর পর প্রথম কেবলা—যেখানে মিরাজের রাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবিদের (আলাইহিমুস সালাম) নিয়ে নামাজ পড়েছিলেন—ইসলামের আশ্রয় ও মুসলমানদের অধিকারে ফিরে আসে। আর এটা একটা শুভ-সংযোগ যে, সুলতান ওই তারিখেই বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিলেন, যে তারিখে আল্লাহ তাআলা তাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজের সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন।

কাজি বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ বলেন, 'এটা ছিল এক মহান বিজয়। অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, আলেম-উলামা ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ (বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে) এই বিজয় প্রত্যক্ষ করেন। লোকেরা যখন জানতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসসহ সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকা জয় করে নিয়েছে, তখন মিশর ও সিরিয়া থেকে আলেম-উলামা বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পরিচিত কোনো ব্যক্তিই অনুপস্থিত থাকেননি। উল্লাস, প্রার্থনা, তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকবির (আল্লাহু আকবার) ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। খুতবা পাঠ করা হয় এবং বিজয়ের দিনই তাতে জুমআর নামাজ আদায় করা হয়। গম্বুজের চূড়ায় যে বিশাল আকারের ক্রুশকাষ্ঠ ছিল, তা নামিয়ে ফেলা হয়। আল্লাহ তাআলা মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালীরূপে ইসলামকে সাহায্য করেন।'

সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনেক গুরুত্বের সঙ্গে এবং অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য একটি মিম্বার নির্মাণ করেছিলেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন, তখন মিম্বরটি তাতে স্থাপন করা হবে। সুলতান সালাহউদ্দিন মিম্বারটি নিয়ে আসেন এবং মসজিদে আকসায় তা স্থাপন করেন।

রোমান-বাইজেন্টাইনীয় শাসকদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধার

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের আগে আরেকবার জয় করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। খ্রিষ্টানদের হাতে বেদখল হলে এই মহান সুলতান তা পুনরায় জয় করেন। সাহাবিগণের বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের ঘটনা এইরূপ—হিজরি প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই জাযিরাতুল আরবে মুসলমানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। হজরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কঠোর হাতে রিদ্দার (ধর্মত্যাগের) ফিতনা দমন করলেন। অব্যবহিত পরেই তিনি ইরাক ও সিরিয়াকে ইসলামের ছায়াতলে আনতে চাইলেন। ইরাকের বিশাল ভূমিকে জয় করার জন্য হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (৫৯২-৬৪২ খ্রি.), ইয়ায বিন গানাম (মৃত্যু : ৬৪২ খ্রি.) এবং মুসান্না বিন হারিসা আশ-শাইবানি (মৃত্যু : ৬৩৫ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। অন্যদিকে সিরিয়াকে জয় করার জন্য প্রেরণ করলেন ইয়াযিদ বিন আবু সুফয়ান (মৃত্যু : ৬৩৯ খ্রি.), শুরাহবিল বিন হাসানা (৫৮৩-৬৩৯ খ্রি.), আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (৫৮৪-৬৩৯ খ্রি.) ও আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুম (৫৯২-৬৮২ খ্রি.)-কে। আমর ইবনুল আসের দায়িত্ব ছিল ফিলিস্তিনে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করা। তার নেতৃত্বে ছিল ৭ হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী। আমার ইবনুল আসের প্রতি হজরত আবু বকরের নির্দেশনা ছিল নিম্নরূপ—

> وإذا سرت بجيشك فلا تسر في الطريق التي سار فيها يزيد وربيعة وشرحبيل بل اسلك طريق ايليا حتى تنتهي إلى ارض فلسطين وابعث عيونك يأتونك بأخبار أبي عبيدة فإن كان ظافرا بعدوه فكن أنت لقتال من في فلسطين وأن كان يريد عسكرا فأنفذ إليه جيشا في أثر جيش

> 'ইয়াযিদ, রবিয়া ও শুরাহবিল যে পথে অভিযানে যাবে, তুমি সেই পথে তোমার সেনাবাহিনী নিয়ে এগোবে না; বরং তুমি ইলিয়ার পথে ফিলিস্তিন পর্যন্ত যাবে। তুমি তোমার গুপ্তচরদের প্রেরণ করবে, তারা তোমার কাছে আবু ওবাইদার খবর পৌঁছে দেবে। সে যদি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় তবে তুমি ফিলিস্তিনের শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। আর যদি সে সৈন্য তলব করে, তবে তার কাছে একের পর এক সেনাদল পাঠাবে।'

হজরত আমর ইবনুল আসের অভিযান শুরু হয়েছিল ১৬ হিজরি মোতাবেক ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। তিনি লোহিত সাগরের তীরবর্তী পথ ধরে এগিয়ে গেলেন এবং এবং জর্ডানের উপকূলীয় এলাকা আকাবা পার হয়ে মৃত সাগরের তীরে পৌঁছে গেলেন। এগিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন জায়গায় রোমান সৈন্যদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন এবং প্রতিবারই তাদের পরাভূত করেন। এমনকি তিনি ফিলিস্তিনের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় অংশও দখল করে নেন। এরপর কুদসের অভিমুখে অভিযান পরিচালনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু এ সময় সংবাদ আসে যে, রোমানরা এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছে, যাদের মোকাবিলায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তিনি শত্রুদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে জর্ডান উপকূলে চলে এলেন। এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নির্দেশনা চেয়ে পাঠালেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বসরায় তার অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রোমান

বাইজেন্টাইনীয় শাসকদের সঙ্গে বিভিন্ন ছোট ছোট যুদ্ধ লেগেই ছিল। অবশেষে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে (১৩ হিজরিতে) সিরিয়ার রোমান সোনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের এক চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ইয়ারমুকের যুদ্ধ নামে এই যুদ্ধ ইতিহাসবিখ্যাত। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩ হিজরিতেই (৭ই জুমাদাল আখিরা) হজরত আবু বকর মৃত্যুবরণ করেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলাকালে মদিনা থেকে দূত নতুন খলিফার পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে আসেন। পত্রে লেখা ছিল খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক ইন্তেকাল করেছেন। হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব নতুন খলিফা হিসেবে আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। পত্রে একটি নির্দেশ ছিল যে, খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে নতুন সেনাপতি মনোনীত করা হয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ এই পত্র পেয়ে কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও নীরব থাকেন এবং আবু উবাইদাকে বিষয়টি জানান। তিনি তাকে সতর্ক করে দেন যে, এই সংবাদ প্রচার করবেন না। কারণ তা যোদ্ধাদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। আবু উবাইদার নেতৃত্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ফহল ও দামেস্কের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আজদানাইনের যুদ্ধ : ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৫ হিজরিতে ফিলিস্তিনে আজদানাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে খ্রিষ্টান বাহিনীর প্রধান ছিলেন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোর। (আরবিতে তাকে আরতাবুন বলা হয়, এটি রোমান শব্দ Tribunus-এর কাছাকাছি, যার অর্থ সম্রাটের পরে সবচেয়ে বড় নেতা।) আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনীর কাছে থিওডোর ও তার সৈন্যরা চরমভাবে পরাজিত হয়। বাইরে টিকে থাকতে না পেরে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর সীমার ভিতরে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। আমর ইবনুল আস তখন বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খ্রিষ্টান বাহিনী ভেতর থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ অবরোধে প্রায় চার মাস কেটে যায়। চার মাসেও বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে না পেরে আমর ইবনুল আস খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পরামর্শ ও নির্দেশনা চেয়ে পত্র পাঠান। এই পত্র পেয়ে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেই বিখ্যাত উক্তি উচ্চারণ করেছিলেন : আমরা রোমের আরতাবুনের মোকাবিলায় আরবের আরতাবুনকে নিয়োজিত করেছি। সুতরাং দেখো কী ঘটে! এ কথা দ্বারা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমর ইবনুল আস ও থিওডোর দুজনই তাদের জাতির বীরপুরুষ।

বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধকালে আমর ইবনুল আসের সহযোদ্ধা অন্য সেনাপতিগণ

সিরিয়ায় একের পর এক এলাকা জয় করছিলেন এবং সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ খালিদ বিন ওয়ালিদকে সঙ্গে নিয়ে হিম্‌স, হুমা, কানাসিরিন ও আলেপ্পো জয় করেন। আগেই দামেস্কের পতন ঘটেছিল। এরপর তারা সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে অভিযান চালিয়ে যান এবং ত্রিপোলি জয় করে বৈরুত পর্যন্ত এগিয়ে যান। ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু বৈরুত থেকে সাইদা (Sidon) পর্যন্ত সিরীয় উপকূল এলাকা জয় করে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি সুর ও আক্কা অধিকারকারী মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানও সিরীয় উপকূলের সর্বদক্ষিণের এলাকা কিসারিয়া অধিকার করেছিলেন।

অবরোধে বিপর্যস্ত জেরুজালেমের খ্রিষ্টানরা প্রস্তাব দিলো যে, তারা সন্ধিচুক্তি করবে। তবে স্বয়ং খলিফাতুল মুসলিমিনকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং তিনি নিজেই সন্ধিপত্র সম্পাদন করবেন।

আমর ইবনুল আস তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি লেখেন : 'আমি প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কিছু শহরের বিজয় আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। এখন আপনার সিদ্ধান্তে যা হয়।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে তাকে এই চিঠি পাঠাননি। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় রওয়ানা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি মুসলিম সেনাপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আবু উবাইদা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। উমরও পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আবু উবাইদা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে চুমু খেতে চাইলেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পায়ে চুমু খেতে উদ্যত হলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদাকে তার হাতে চুমু খেতে দিলেন না, ফলে আবু উবাইদাও তাকে তার পায়ে চুমু খেতে দিলেন না। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছে পৌঁছে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলেন। তিনি শর্ত দিলেন, তিন দিনের মধ্যে সকল রোমান নাগরিক বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে চলে যাবে। তিন দিন পর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। এ দরজা দিয়েই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে প্রবেশ করেছিলেন।

জায়নবাদীদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখল

তবে বিগত শতাব্দীতে আবারও বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের ৫ জুন জায়নবাদী ইসরাইল পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। মাত্র তিন ঘণ্টার হামলায় সে জর্ডান, মিশর, ইরাক ও সিরিয়ার

আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। মাত্র তিন ঘণ্টায় ছোট একটি রাষ্ট্রের হাতে তিনটি দেশের পরাজয় ঘটে। ইসরাইল—যার আয়তন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর ২০ ভাগের ১ ভাগও নয়, যার জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীর ১৫ ভাগের ১ ভাগও নয় এবং যার সৈন্যসংখ্যা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যসংখ্যার অর্ধেকও নয়—সেই ইসরাইলের হাতে তিনটি রাষ্ট্রের পরাজয় ঘটে। হামলার তিন দিনের মাথায় ইসরাইলি স্থলবাহিনী সুয়েজ এলাকা দখল করে নেয়। একই গতিতে তারা মিশর ফ্রন্টে গাজা ও সিনাই উপত্যকা, জর্ডান ফ্রন্টে পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীর এবং সিরিয়া ফ্রন্টে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। মাত্র ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ সময় তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পুরোনো অংশ অর্থাৎ মূল অংশও দখল করে নেয়; ইতঃপূর্বে দখল করেছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের অনেকটা অংশ।

জায়নবাদী নেতা মোশে দায়ান ১৯৬৭ সালে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে বলেছিলেন, 'জেরুজালেম থেকে ইয়াসরিব পর্যন্ত যে রাজ্য শাসন করা হয়েছিল, আমি এখানে দাঁড়িয়ে তার ঘ্রাণ পাচ্ছি।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি খাইবার থেকে আমার পিতৃপুরুষদের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' ইসরাইলি সৈনিকরা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে এবং বলতে থাকে, 'মারা গেছে..., হ্যাঁ মারা গেছে..., মুহাম্মাদ মারা গেছে আর কিছু অবলা তার উত্তরসূরি হয়েছে।'

প্রবন্ধ উৎস ও সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. হুরুব আল-কুদ্স ফি আত-তারিখ আল-আরাবি, কর্নেল ড. ইয়াসিন সুওয়াইদ
২. আন-নাওয়াদির আস-সুলতানিয়্যাহ ওয়া আল-মাহাসিন আল-ইউসুফিয়্যাহ, কাজি বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ রহ.
৩. সালাদিন অ্যান্ড দ্য ফল অফ দ্য কিংডম অফ জেরুজালেম, স্ট্যানলি লেনপুল
৪. সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.
৫. যিকরায়াতু ফিলিস্তিন (বাংল অনুবাদ : ফিলিস্তিনের স্মৃতি), শহিদ ড. আবদুল্লাহ্ আযযাম রহ.
৬. প্যালেস্টাইন থেকে বসনিয়া, মঈন বিন নাসির
৭. http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/3/11

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কনস্টান্টিনোপল বিজয়

এক বিপ্লবী শাসকের যুগান্তকারী বিপ্লব

আবদুর রশীদ তারাপাশী । ফাহাদ আবদুল্লাহ

❝ কনস্টান্টিনোপল বিজয় শুধু একটি নগরীর দখল নয়, বরং এটি ছিল ইসলামের মহান এক বিজয়, আর ছিল পূর্ববর্তী বহু শতাব্দীর সব প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তি। ❞

— ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন, (মুকাদ্দিমাতু ইবনু খালদুন)

❝ কনস্টান্টিনোপলের পতন শুধু একটি শহরের পতন নয়, এটি ছিল এক সভ্যতার সমাপ্তি। মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক বিশ্বের সূচনা। ❞

— রজার ক্রাউলি, (*1453: The Holy War for Constantinople and the Clash of Islam and the West - 2005*)

❝ অটোমানরা কনস্টান্টিনোপলকে দখল করে শুধু সামরিক জয় অর্জন করেনি, বরং তারা সভ্যতার এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, আর নিঃসন্দেহে তা বৈশ্বিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ❞

— ইতিহাসবিদ স্টিভেন রান্সিম্যান, (*The History of the Crusades*)

এক. যেখানে সূচনা বিজয়ের ইতিহাস

১. কনস্টান্টিনোপল : একটি ঐতিহাসিক দুর্গ

কনস্টান্টিনোপল—ইতিহাসের পাতায় একে এমন একটি নগরী হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়, যা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন প্রথম এই নগরীকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার শাসনামলেই মূলত এটি দুর্ভেদ্য ও অজেয় এক দুর্গে পরিণত হয়। শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্যও দুর্গটি জগদ্বিখ্যাত ছিল। তবে নিজের

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এর মর্যাদা আরও বহু গুণে বেড়ে যায় এবং কালের পালাবদলে এটি ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনস্থল হিসেবে গড়ে ওঠে।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেল, কনস্টান্টিনোপল শুধু একটি নগরী বা বিশার দুর্গই ছিল না, বরং একটি সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রও ছিল। মুসলিমরা বহু শতাব্দী ধরে এই শহরটিকে পদানত করার চেষ্টা করে। প্রথমে উমাইয়া খলিফারা আর পরবর্তীকালে আব্বাসি ও অন্যান্য মুসলিম শাসকরা শহরটিকে জয় করার চেষ্টা করেন, কিন্তু শহরটির দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর মজবুত প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কারণে কেউ সফল হতে পারেননি।

তদানীন্তন বিশ্বে যে ক'টি শহরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে 'অজেয়' বলে বিবেচনা করা হতো, কনস্টান্টিনোপল ছিল সেই তালিকার শীর্ষে। তিন স্তরের বিশাল প্রাচীর, গভীর পরিখা, সুবিশাল দুর্গ ও ভূ-মধ্যসাগরের অনিঃশেষ জলরাশি, আর সঙ্গে রয়েছে কৌশলগতভাবে স্থাপিত প্রতিরক্ষামূলক বেশ কিছু বুর্জ; এ সবকিছু মিলে কনস্টান্টিনোপল পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী এক দুর্গে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের বিস্ময়—সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাঁর অসাধারণ সামরিক কৌশল ও দক্ষ-নেতৃত্বের কাছে এই অজেয় দুর্গটি শেষ পর্যন্ত পদানত হয়। কুফুর ও শিরকের আঁতুড়ঘর মক্কার মতো অবশেষে কনস্টান্টিনোপলও ইসলামের আলোর দীপ্তিময় আভায় উদ্ভাসিত হয়।

২. বিজয়ের মাহাত্ম্য : কেন এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লব

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মে দিনটি শুধু ইসলামি ইতিহাসেরই নয়; বরং সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেরই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি। কারণ, কনস্টান্টিনোপলের বিজয় শুধু একটি নগরীর পতন নয়; বরং এটি ছিল এক বিপ্লব—মহাবিপ্লব, যা বিশ্ব রাজনীতির সব সমীকরণ পাল্টে দিয়েছিল। মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল বিশাল এক সভ্যতারও। এর বাইরে আধ্যাত্মিক দিকটি বিবেচনায় নিলে বলতে হয়, এ দিনটির গুরুত্ব মুসলিমদের কাছেও অপরিসীম। কারণ, এ দিনেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাস্তবায়ন ঘটেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলেছিলেন :

لَتُفتَحنَّ القُسطنطينيةُ ولنِعمَ الأميرُ أميرُها ولنعم الجيشُ ذلك الجيشُ

> তোমরা অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। আর সেই আমির (বিজেতা) হবে সর্বশ্রেষ্ঠ আমি, আর তাঁর বাহিনী হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী। (মুসনাদে আহমাদ : ১৮৯৫৭)

এ হাদিসটি মুসলিম শাসকদের যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা—মহান এই বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছেন উসমানি খিলাফতের সপ্তম সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ। প্রকৃতপক্ষে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীই এই বিজয়কে এক অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

দুই. সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ : শৈশব ও শিক্ষা

১. এক মহান বিজেতার প্রস্তুতি : জ্ঞান, নৈতিকতা ও সামরিক প্রশিক্ষণ

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ছিলেন এমন একজন শাসক, যিনি শৈশব থেকেই নিজেকে এক মহাবিজয়ের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেওয়া এই মহান ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র একটি সাম্রাজ্যের সুলতানই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একাধারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, বীর সেনাপতি ও উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন নেতা।

তাঁর শিক্ষাদীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সম্ভবত এর ভারসাম্য—অর্থাৎ একদিকে তিনি যেমন গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক তারবিয়াত এবং কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ছোটবেলা থেকেই তাঁর এই আদরের সন্তানের জন্য এমন এক শিক্ষা ও তারবিয়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা তাকে শুধু জ্ঞানে-গুণেই অনন্য করে তুলেনি, বরং তাঁর আধ্যাত্মিকতা, নীতি-নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাচেতনা আর ও যুদ্ধকৌশলের মতো বিষয়গুলোকেও শাণিত করেছিল।

ক. ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ছোটবেলায় পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। আর তাঁর ইসলামি শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল উসমানি সাম্রাজ্যেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'এন্দেরুনে'। এন্দেরুনে মোটাদাগে রাজ-ঘরানার শিশুরা পড়াশোনা করত। আর সেখানে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন সাম্রাজ্যেরই সেরা আলিম ও পণ্ডিতরা। এন্দেরুনে সুলতানের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত আলিম মোল্লা গুরানি—যিনি পরবর্তী সময়ে সুলতানের শাসনামলে 'শাইখুল ইসলাম-এর পদও অলংকৃত করেছিলেন। মোল্লা গুরানি ছিলেন অনেক কঠোর ও শৃঙ্খলাপ্রিয় একজন আলিম। যিনি একাধারে সুলতানকে ইসলামি আইন (ফিকহ), আকিদা ও আখলাক (নৈতিকতা) শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ একইসঙ্গে দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, গণিত ও ভূগোলেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উসমানি ইতিহাসবিদদের বরাতে জানা যায়, তিনি এক-দুটি নয়; বরং সাত-সাতটি ভাষা—অর্থাৎ তুর্কি, আরবি, ফারসি, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সার্বীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

খ. সামরিক প্রশিক্ষণ

একজন নেতা হিসেবে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ শুধু জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি ছিলেন এক কৌশলী যোদ্ধাও। তরুণ বয়স থেকেই তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র চালনায় পারদর্শী করে তোলা হয়। সবমিলিয়ে

বলা যায়—তরবারিচালনা, তিরন্দাজি, অশ্বারোহণ ও আশ্চর্যকর সব যুদ্ধকৌশল প্রণয়নের প্রশিক্ষণ তাকে এক অপ্রতিরোধ্য সেনাপতিতে পরিণত করে।

এই প্রসঙ্গে উসমানি ইতিহাসবিদদের খুব চমৎকার একটি উক্তি আছে। সুলতানের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বয়ান করতে গিয়ে তারা বলতেন : 'যদি তুমি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্‌কে একজন আলিম ভাবো, তবে তিনি এক মহান আলিম। আর যদি তুমি তাকে একজন যোদ্ধা ভাবো, তবে তিনি একজন অপ্রতিরোধ্য সেনাপতি।'

সবমিলিয়ে বলা যায়, এই সমন্বিত শিক্ষা, গভীর তারবিয়াত ও কঠোর অনুশীলনের ফলে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্ বাস্তবিক অর্থেই ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন।

২. উসমানি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের শৈশবে উসমানি সাম্রাজ্য ছিল এক সন্ধিক্ষণে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল ঠিক, কিন্তু তৎকালীন ইউরোপীয় শক্তিগুলো সংঘবদ্ধ হচ্ছিল উসমানিদের বিরুদ্ধে। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এই কঠিন সময়ে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ভার্নার যুদ্ধ (Battle of Varna), বলকান-যুদ্ধ (Balkans Campaigns), হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে 'শান্তি যুদ্ধ' ও কসোভার যুদ্ধের (Battle of Kosovo - ১৪৪৮) মতো ইতিহাস-বিখ্যাত একাধিক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি ইউরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে কৌশলগতভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের ভিত শক্তিশালী করেন।

কিন্তু সবকিছুর পরও একটি পচা ক্ষত তখনো থেকে গিয়েছিল—কনস্টান্টিনোপল। পুরো খ্রিষ্টানবিশ্ব এই নগরীকে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আখড়া হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। আর বিশেষ করে বাইজেন্টাইন সম্রাটরা একে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যত কূটচাল ও ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি বানিয়ে তুলেছিল।

কিশোর মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্ তাঁর শৈশবের দিনগুলোতেই বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি উসমানি সাম্রাজ্যকে প্রতাপ ও শক্তি-সামর্থ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যেতে হয়, তবে এই নগরী জয় করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তাই সাম্রাজ্যের মসনদে বসার আগে থেকেই তিনি তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেন—কনস্টান্টিনোপল বিজয় করাকে।

তিন. কনস্টান্টিনোপল : এক দুর্জয় নগরী

১. ভৌগোলিক ও কৌশলগত গুরুত্ব

কনস্টান্টিনোপল—বর্তমানে যা ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত ছিল—এমন একটি নগরী যা

প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংযোগস্থল হিসেবে বিবেচিত হতো। এই নগরী একদিকে ছিল ইউরোপের প্রবেশদ্বার, অন্যদিকে একে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সংযোগ-রুট হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে নগরীটির এই অবস্থান তাকে শত-সহস্র পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য করে রেখেছিল। কনস্টান্টিনোপলের সার্বিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিতে গেলে :

ক. স্বাভাবিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

কনস্টান্টিনোপলের পশ্চিম দিকে ছিল বিশাল ও শক্তিশালী দেয়াল, যা তিন স্তরে নির্মিত হয়েছিল। একেবারে বাইরের দেয়ালটি ছিল খন্দক বা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত; যেকোনো শত্রুবাহিনীর পক্ষে তা পার হয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া শুধু কঠিনই নয়, একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের দেয়ালগুলো ছিল আরও শক্তিশালী, বিভিন্ন বুর্জ বা প্রতিরক্ষা দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত—যা কোনো সেনাবাহিনীর দুর্গে প্রবেশ করাটাকে আরও অসম্ভব করে তুলেছিল।

খ. প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা

নগরীর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ছিল মারমারা সাগর ও বসফরাস প্রণালি। আরও সহজ করে বললে সমুদ্রের অথই জলরাশি। সার্বিকভাবে যা জলপথেও কোনো বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী সহায়ক ও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ছিল। এ ছাড়া, গোল্ডেন হর্নে স্বর্ণশৃঙ্খলের (Golden Chain) ইতিহাস তো সব ইতিহাস গ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায়। এটি একটি বিশাল লোহার শৃঙ্খল ছিল, যার মাধ্যমে প্রবেশপথ বন্ধ করে রাখা হতো। এটাও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করার চিন্তা থেকেই করা হয়েছিল; যাতে শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজই বসফরাস অতিক্রম করতে না পারে।

গ. অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি

কনস্টান্টিনোপল ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং সে যুগের অন্যতম ধনী নগরী। এটি সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, যেখানে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা ও সংস্কৃতির সম্মিলন হতো। সবমিলিয়ে ভৌগোলিক অবস্থান বাইজেন্টাইনদের বিশাল সম্পদ গড়ে তোলার পক্ষে যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার জন্যও আশীর্বাদ হয়েছিল।

কনস্টান্টিনোপলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসবিদ অ্যাডওয়ার্ড গিবন তাঁর *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* গ্রন্থে বলেন : ‘কনস্টান্টিনোপল এমন একটি নগরী—যার প্রতিটি ইঞ্চি প্রতিরক্ষার কথা মাথায় রেখেই বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল। জয় করা অসম্ভব বলেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো হাজার বছর ধরে দুর্গটিকে অক্ষত রেখেছিল।’

২. পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা

ইসলামি শাসনকালে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য বহুবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থতার মাধ্যমেই সেই প্রচেষ্টা সমাপ্তি ঘটেছে। ইসলামি যুগের একেবারে শুরু থেকে দেখলে :

ক. খিলাফতে রাশিদার যুগে : খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রা.-এর শাসনামলে প্রথমবারের মতো মুসলিমদের মুজাহিদবাহিনী কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হয়। তবে তখনো নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, মুজাহিদদের পক্ষে তা জয় করা সম্ভব হয়নি আর।

খ. উমাইয়া খিলাফতের যুগে : আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনকালে ৬৭৪-৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করা হয়। মুসলিম নৌবাহিনী বসফরাস প্রণালিতে প্রবেশ করলেও বাইজেন্টাইনরা 'গ্রেজোয়া আতেশ' বা গ্রিক ফায়ার (Greek Fire) নামে পরিচিত এক ধরনের ভয়ংকর দাহ্যপদার্থ ব্যবহার করে তাদের অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়।

গ. আব্বাসি ও উসমানি খিলাফতের যুগে : আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ আর পরবর্তী সময়ে উসমানি সুলতান প্রথম বাইয়াজিদ কনস্টান্টিনোপল দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাগ্যের লিখন—প্রতিবারই নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কারণে তাদের ব্যর্থ হতে হয়।

৩. কেন আগের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল?

সত্যিকার অর্থে এর কারণ একেবারে কমও ছিল না। উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে প্রভাবক কারণগুলো যদি গুনতে হয় :

ক. দুর্ভেদ্য দেয়াল : নগরীর তিন স্তরবিশিষ্ট বিশাল দেয়াল, যা অজেয় ছিল।

খ. গ্রিক ফায়ার : বাইজেন্টাইনদের এই রহস্যময় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল যেকোনো বাহিনীর জন্য এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ।

গ. ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সহায়তা : প্রতিবারের অবরোধ বা আক্রমণেই বাইজেন্টাইনরা ইউরোপের খ্রিষ্টান শক্তিগুলোর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করত।

ঘ. যুদ্ধকৌশলের অভাব : সামগ্রিকভাবে এমন দুর্ভেদ্য একটি দুর্গের প্রাচীর ধ্বংসের জন্য যুদ্ধকৌশল প্রয়োজন ছিল, সেটাও কোনো বাহিনীরই ছিল না বললেই চলে।

ঙ. সামরিক প্রস্তুতির ঘাটতি : এমনিভাবে পূর্ববর্তী মুসলিম সেনাবাহিনীগুলোর অধিকাংশই নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করার মতো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারেনি। দুঃখজনকভাবে বলতে হয়—এমন অস্ত্রশস্ত্র তাদের ছিলও না।

চার. বিজয়ের প্রস্তুতি : পরিকল্পনা ও নতুন যুদ্ধকৌশল

১. সুলতানের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, এই বিষয়ে ইতিহাসের পাতায় ভুরি ভুরি আলোচনা পাওয়া যায়। এমনিভাবে তিনি যে একজন শক্তিশালী নেতা ও দক্ষ কৌশলী, এটাও আজ ইতিহাস সগর্বে সাক্ষ্য দেয়। আজকের সময়ে সুলতান কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে যতটা সহজে মূল্যায়ন করা যায়, পঞ্চদশ শতকের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে একজন মুসলিম শাসক এমন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করছেন—এটা আসলেই অকল্পনীয় ও শিহরণ-জাগানিয়া। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য তিনি তদানীন্তন যুদ্ধকৌশল থেকে সরে সম্পূর্ণ নতুন কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সমরবিদ্যা কিংবা শাস্ত্রীয় যুদ্ধকৌশলই নয়, বরং আধুনিক প্রযুক্তি ও সৈন্যপ্রশিক্ষণের উন্নতি ঘটানোর মধ্য দিয়ে বিশাল এক পরিকল্পনাও তৈরি করেছিলেন। এখানে আমরা সুলতানের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও যুদ্ধকৌশল—দুটি সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব :

ক. লং-টার্ম পরিকল্পনা : একজন প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী শাসক হিসেবে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ খুব ভালোভাবেই জানতেন, কনস্টান্টিনোপল বিজয় করা অত সহজ হবে না। এ জন্য তিনি তাঁর প্রস্তুতিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার রূপ দিয়েছিলেন। বহু বছর ধরে প্রাচীন এই নগরীর ওপর নজর রেখে এর দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করেন। তারপর নিজের সেই পর্যবেক্ষণের আলোকে বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল তৈরি করেন।

খ. সামরিক শক্তির আধুনিকীকরণ : ক্ষমতার বাগডোর হাতে নেওয়ার পর থেকেই সুলতান সেনাবাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন যুদ্ধকৌশল রপ্ত করানোর মাধ্যমে শক্তিশালী করেছিলেন। তখনো পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল দুর্গে হামলা করতে গিয়ে মুসলিম সেনারা প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছিল, কিন্তু সুলতান এই বিশাল যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যাধুনিক সব অস্ত্র তৈরি করেছিলেন। প্রণয়ন করেছিলেন আধুনিক অনেক যুদ্ধকৌশলও। আর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও সাহায্যের পর নিঃসন্দেহে এসব অত্যাধুনিক অস্ত্র আর যুদ্ধকৌশলই তাকে বিপ্লবীভাবে সফল করে তুলেছিল।

২. বিশাল কামানের ব্যবহার ও সামরিক প্রযুক্তি

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যে বিপ্লবী সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, তা আধুনিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুর্কি ইতিহাসবিদ হালিল ইনালচিক (Halil İnalcık) তাঁর *The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600* গ্রন্থে লিখেছেন : 'মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ছিলেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী সেনাপতি, যিনি শুধু কনস্টান্টিনোপলই নয়; বরং সামরিক প্রযুক্তির ইতিহাসকেও বদলে দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর বিশাল

সেই কামানের ব্যবহার সামরিক শক্তির গতিপথ বদলে দিয়েছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যুদ্ধের প্রচলিত ধারাকে পর্যন্ত উলটপালট করে রেখে দেয়।'

এখানে আমরা সুলতানের সেই ঐতিহাসিক বিশাল কামানের ব্যবহার ও তার নির্মাতা এবং সুলতানের সামরিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পেশ করব :

ক. বিশাল কামান

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অভিযানে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য কৌশল ছিল বিশাল ও শক্তিশালী কামানের ব্যবহার। কনস্টান্টিনোপলের দেয়াল ভেদ করার জন্য সুলতান তার সেনাবাহিনীকে বিশাল কামান তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা কনস্টান্টিনোপল বিস্ময়কর সেই প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে পর্যন্ত নড়বড়ে করে ছেড়েছিল। এ কামানগুলো এত বিশাল ও শক্তিশালী ছিল যে, একবারের আঘাতেই সেগুলোর দেয়ালের কিছু অংশ ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হতো। নিঃসন্দেহে এগুলো ছিল নির্মাণকালে যথেষ্ট গবেষণা এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগেরই ফল ও ফসল। আর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, তদানীন্তন উসমানিরা এসব উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি চর্চার প্রতি অনেক গুরুত্ব দিত।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ ও সামরিক বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত নির্দ্বিধায় এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কামান ছিল আসলেই এক সামরিক বিপ্লব। এর ব্যবহার কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এই প্রযুক্তির আধুনিকতায় তখনকার যুগের প্রতিটি সেনাবাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল।

খ. কামানের বিশিষ্ট রূপকার

কনস্টান্টিনোপলের দুর্গ ভেদ করার জন্য সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী অর্বানের পাশাপাশি অনেক তুর্কি কামাননির্মাতাকেও নিয়োগ দিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে সারুজা উস্তা ও স্থপতি মুসলিহিদ্দিন উস্তার নাম ছিল উল্লেখযোগ্য। যদিও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে আরও বেশ কিছু নাম পাওয়া যায়, তবে এ দুটি নাম বেশ প্রসিদ্ধ। তারা একত্রে বিশাল আকারের সেই ঐতিহাসিক কামানগুলো নির্মাণ করেছিলেন—ইতিহাসের পাতায় যেগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন অর্বান উস্তার বানানো 'বেসিলিকা' নামের কামানটি প্রায় ৫.২৩ মিটার লম্বা আর ১৮ টন ওজনের ছিল বলে জানা যায়। কামানটি প্রায় ৬০০ পাউন্ড ওজনের পাথরের গোলা ছুঁড়তে সক্ষম ছিল।

৩. নৌবাহিনীর নবপ্রবর্তন : গ্যালিয়ন পদ্ধতি

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য সুলতান শুধু স্থলযুদ্ধের কৌশলই নয়, বরং সমুদ্রযুদ্ধের কৌশলও গ্রহণ করেন। তাঁর নৌবাহিনী কাপ্তানরা একেকজন বিপুল

যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সুলতানের নির্দেশনায় তারা নৌবাহিনীতে 'গ্যালিয়ন পদ্ধতি' প্রয়োগ করেছিলেন।

গ্যালিয়ন ছিল এমন এক ধরনের যুদ্ধজাহাজ, যা তৎকালের সবচেয়ে বড়, শক্তিশালী ও বহুমুখী যুদ্ধজাহাজ হতো। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এই জাহাজগুলোতে ভারি কামান স্থাপন করেন, যা শত্রুর দুর্গের দেয়াল ভেদ করার বিশেষ সক্ষমতা রাখত। এগুলোতে প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পরিবহন করা যেত। কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময়, এই জাহাজগুলোকে ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি গোল্ডেন হর্নে বাইজেন্টাইন নৌবহরকে চমকপ্রদ কৌশলে পরাজিত করেন।

শুধু তুর্কি ইতিহাসবিদরাই নয়, ইউরোপ থেকে শুরু করে আরব—সব জায়গার সব যুগের ইতিহাসবিদরাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে : কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যেসব সামরিক প্রয়োগ করেছিলেন, তা সত্যিকার অর্থেই যুদ্ধের ইতিহাসে সামরিক কৌশলের বিপ্লব ছিল, যেখানে তিনি স্থলপথ ও জলপথকে মিলিয়ে এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, যা কনস্টান্টিনোপল জয় করতে মুসলিম বাহিনীকে অসম্ভব কৌশলী ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। কৌশলের দিক থেকে তারা পৌঁছে গিয়েছিল এক অনন্য উচ্চতায়। সুলতানের এই সামরিক কৌশল শুধু একটি শহরকে জয় করার জন্য ছিল না; বরং এটি এক নতুন সামরিক যুগের সূচনা করেছিল।

পাঁচ. চূড়ান্ত আক্রমণ ও বিজয়ের মুহূর্ত

১. অবরোধের প্রথম ধাপ : দু-দিক থেকে চাপ সৃষ্টি

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যখন চূড়ান্ত অবরোধ শুরু করেন, তখন তাঁর পরিকল্পনা ছিল একেবারে সমন্বিত ও সুপরিকল্পিতভাবে একইসময়ে দু-দিক থেকে চাপ তৈরি করা; যা শহরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল করে দেবে।

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে গোল্ডেন হর্নে চেইন দিয়ে সমুদ্রপথ বন্ধ করে দেওয়ার পর সুলতান আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কনস্টান্টিনোপলের মূল দুর্গে প্রবেশ করতে শুধুমাত্র স্থলপথের আক্রমণে সাফল্য পাওয়া যাবে না। বরং একইসময়ে স্থল ও সমুদ্রপথে আক্রমণ করতে হবে। তাঁর সেনাবাহিনী স্থলপথে বিশাল কামান ব্যবহার করে শহরের প্রাচীর ফাটল ধরাতে তো সক্ষম হয়, কিন্তু গোল্ডেন হর্নে চেইন স্থাপনের কারণে নৌবাহিনী সমুদ্রে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না। তারা গ্যালিয়ন জাহাজগুলো দিয়ে অবরোধ কার্যকর করতে পারলেও সুবিধাজনক স্থান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারছিল না।

সেই যুগে আল-ফাতিহের কৌশলগত অবস্থান ও বিস্ময়কর সতর্কতা ছিল সবার মুখে

মুখে। এখন, কনস্টান্টিনোপল একটি দুর্গ, যেখানে শুধুমাত্র একদিকে প্রবেশের পথ ছিল। তবে, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের বিচক্ষণ নেতৃত্বে, সেনারা অবরোধের দ্বিতীয় দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে শহরের বাকি অংশকে একেবারে কার্যকরভাবে বন্ধ করে ফেলেন।

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের বহুমুখী চাপপ্রয়োগের এই কৌশলের প্রশংসা করে *The Byzantine Army* গ্রন্থে ইতিহাসবিদ পিটার হ্যামিলটন বলেন : 'সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ শুধু স্থলপথে অবরোধের জন্য একক কোনো কৌশল ব্যবহার করেননি, তিনি সমুদ্রপথেও একযোগভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপল শহরটির চারপাশে বিশাল প্রাচীর ছিল; কিন্তু তার সমুদ্রপথে অবরোধের মাধ্যমে তিনি শহরের সমুদ্রপথকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটি ছিল এমন এক সমন্বিত কৌশল—যেখানে স্থলপথে তার সেনারা অবিরাম চাপ সৃষ্টি করছিল, আবার সমুদ্রপথেও তার বাহিনী শহরের উপকূল আটকে রেখেছিল। এই ধরনের একাধিক দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করার কৌশলকে সুলতানের বিজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।'

২. বিখ্যাত 'জাহাজ টেনে নেওয়া' কৌশল

কনস্টান্টিনোপলের ইতিহাসে এটি ছিল এমন এক কৌশল—যা পুরো পৃথিবীর ইতিহাসকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং আজও পৃথিবীর ইতিহাস একে স্মরণ রেখেছে। সুলতানের 'জাহাজ টেনে নেওয়া'-র এই কৌশল মূলত গোল্ডেন হর্নে স্থাপন করা সেই চেইনের প্রতিরোধ ছিল। কৌশলটির মাধ্যমে তিনি কনস্টান্টিনোপলের উপকূলে স্থবির হয়ে থাকা তাঁর নৌবাহিনীকে সরাসরি দুর্গের প্রাচীরে কামান দাগানোর মতো অবস্থানে নিয়ে যান। যার ফলে সুলতান দু-দিক থেকে কনস্টান্টিনোপলের ওপর আক্রমণের যে বিপ্লবী নৌ-কৌশল প্রণয়ন করেছিলেন, সেটা পুরোদমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

বাইজেন্টাইনরা গোল্ডেন হর্নে চেইন দিয়ে জলপথ বন্ধ করে দেয়, তখন সুলতান বিখ্যাত 'জাহাজ টেনে নেওয়া'-র এই কৌশল প্রয়োগ করে গ্যালিয়ন জাহাজগুলোকে ভূমি দিয়ে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। গোল্ডেন হর্নের চেইনকে অকার্যকর করতে এবং এই বাধা কাটিয়ে উঠতে রাতের অন্ধকারে তিনি গাছ দিয়ে তৈরি রোলারে চর্বি ব্যবহার করে ৮০টি যুদ্ধজাহাজকে বসফরাস প্রণালি থেকে প্রায় ১০ মাইল স্থলপথ পাড়ি দিয়ে গোল্ডেন হর্নের ভেতরে প্রবেশ করান। এই কৌশল বাইজেন্টাইনবাহিনীর টুটাফাটা বাকি প্রতিরোধব্যবস্থাও ভেঙে দেয়।

সুলতানের এই কৌশলের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে আরব ইতিহাসবিদদের অনেকে মন্তব্য করেছেন : যে সময়ে ইউরোপীয়রা সঠিক সমুদ্র যুদ্ধকৌশল নিয়ে হতাশায় ভুগছিল, তখন মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের এই কৌশল পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

৩. ২৯ মে ১৪৫৩ : বিজয়ের দিন

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মে। মুসলিম ইতিহাসের এক অন্যতম গৌরবের দিন। দিনটি ছিল সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের চূড়ান্ত দিন এবং মুসলিমবিশ্বে এক নতুন যুগের সূচনা।

দীর্ঘ অবরোধের পর পরিস্থিতি যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে গড়াতে থাকে এবং স্থল ও সমুদ্রপথে উসমানি সেনারা সমানভাবে আক্রমণের মতো অবস্থানে পৌঁছায়, তখন সুলতান তাঁর সেনাবাহিনীকে এক চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করেন। নিজের বিশাল কামানের সাহায্যে তিনি শহরের মূল ফটকের প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। এরপর সেনাবাহিনীকে সবদিক থেকে আক্রমণের নির্দেশনা প্রদান করেন। আর এরই মধ্য দিয়ে কনস্টান্টিনোপল শহরটি মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে আসে।

৪. বিজয়ের প্রভাব

এই বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ শুধুমাত্র কনস্টান্টিনোপল দখল করেননি; বরং তিনি মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের শীর্ষে পৌঁছে যান। এই বিজয় প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য—পৃথিবীর সব ভূখণ্ডের ইতিহাসেই সুলতানকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। একে এমন একটি পবিত্র মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিল মুসলিমবিশ্বের আধিপত্য ও সামরিক কৌশলের এক নতুন যুগের।

এই বিজয়ের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্টিভেন রান্সিমান তাঁর The Fall of Constantinople ১৪৫৩ গ্রন্থে বলেছেন : 'কনস্টান্টিনোপলের পতন খ্রিষ্টধর্মের জন্য একটি সর্বোচ্চ মাত্রার বিপর্যয় ছিল এবং এটি ইতিহাসের পুরো গতিপথে পর্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলেছিল।'

ইতিহাসবিদ ডোনাল্ড এম. নিকোল তাঁর The Immortal Emperor গ্রন্থে লিখেছেন : '১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন ছিল বিশ্ব ইতিহাসে একটি বাঁক-পরিবর্তনকারী মুহূর্ত।'

ছয়. বিজয়ের ফলাফল : নতুন যুগের সূচনা

১. ইসলামি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ কেবল একটি শহর দখল করেননি; বরং একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। কুফুরির অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া কনস্টান্টিনোপলকে আলোর পথ দেখান। তিনি সেখানে একটি মহান সভ্যতার বিকাশ ঘটান। বাইজেন্টাইনদের ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করান।

আর প্রবর্তন করে এক নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার।

ক. ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর তিনি এই প্রাচীন নগরীকে ইসলামি সংস্কৃতির এক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। সুলতান এই প্রাগৈতিহাসিক নগরীর পবিত্র স্থাপনাগুলোর পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি একে মসজিদের নগরী বানান। এরমধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি কৃতিত্ব ছিল—আয়া বা হাজিয়া সোফিয়াকে তিনি মসজিদে রূপান্তরিত করেছিলেন। আজও যা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ইসলামি স্থাপত্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সুলতানের হাত ধরে হওয়া এই পরিবর্তন কেবল সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরেই প্রতীক ছিল না, বরং মুসলিমবিশ্বকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর জন্য ইসলামি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতির কেন্দ্রস্থল বানানোরও এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল।

খ. প্রশাসনিক পুনর্গঠন

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার আনে। তিনি কনস্টান্টিনোপলকে মূলত একটি সুসংগঠিত এবং কার্যকরী রাষ্ট্র পরিচালনার মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের পুরনো বাইজেন্টাইন প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে, তিনি একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন, যেখানে শিয়া, সুন্নি এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারত। এছাড়া, তিনি বিচার ব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা, এবং শাসক ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

স্ট্যানফোর্ড শ' (Stanford J. Shaw) তার অনবদ্য গ্রন্থ History of the Ottoman Empire and Modern Turkey-তে লিখেছেন : 'মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ কনস্টান্টিনোপলকে শুধু বিজয়ের প্রতীক হিসেবে স্থাপন করেননি, বরং তাকে একটি নতুন ইসলামি যুগের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার ও বুদ্ধিদীপ্ত নগর-পরিকল্পনা অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছিল।'

এমনিভাবে ইতিহাসবিদ হালিল ইনালচিক তার গবেষণায় উল্লেখ করেন : 'মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ বিজয়ের পর শহরের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে কাজে লাগিয়ে কনস্টান্টিনোপলকে মুসলিমবিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেন এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে। এটি মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশে নতুন গতির সঞ্চার করেছিল।'

২. বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ও ইউরোপে প্রতিক্রিয়া

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাজার বছরের ইতিহাস শেষ

হয়। এটি ইউরোপীয় ইতিহাসে এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করে—যা ইউরোপের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর প্রভাব ফেলে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী হিসেবে ধারণ করেছিল। তবে, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের বিজয়ের মাধ্যমে বাইজেন্টাইনদের এই পতন শুধু একটি সাম্রাজ্যের পতন ছিল না, বরং এটি ইউরোপের মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং রেনেসাঁ-যুগের সূচনার প্রতীক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর ইউরোপীয়রাও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এই বিজয় ইউরোপীয় সভ্যতার জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল। কারণ তারা কনস্টান্টিনোপলকে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিত। এই বিজয়টি ইউরোপের জন্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করে এবং তাদের সামনে মুসলিমবিশ্বের শক্তিকে আরও শক্তিশালী রূপে উপস্থাপন করে। এরই মধ্য দিয়ে মূলত ইউরোপীয়রা তখন নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে যায় আর তা আধুনিক পৃথিবীর গঠন ও রেনেসাঁর সূত্রপাত করে।

৩. উসমানি সাম্রাজ্যের সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠা

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর উসমানি সাম্রাজ্য বিশ্বের অন্যতম সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের নেতৃত্বে উসমানিরা শুধু সামরিক দিক থেকেই নয়—বরং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি বিশাল শক্তি হয়ে ওঠে।

ক. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক স্থিতি

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে উসমানি সাম্রাজ্য আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। শহরটি উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এবং এটি তাদের শাসনের আওতায় সমগ্র পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার এক বৃহৎ অংশকে নিয়ে আসে। উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে সব জায়গায় ইনসাফ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও স্থিতি আসে।

খ. সামরিক শক্তিতে উসমানিদের অবস্থান

এই বিজয়ের পর উসমানি সাম্রাজ্য আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক দক্ষতার কারণে। তারা আধুনিক যুদ্ধকৌশল, কামান ব্যবহার ও নৌবাহিনীতে বিশাল শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, যা তাদের সামরিক শক্তিকে আরও সুসংহত করে।

এক তুর্কি ইতিহাসবিদ বলেন : 'কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর উসমানি সাম্রাজ্য শুধু একটি সামরিক শক্তি হিসেবেই নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়—যা আধুনিক পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়েছিল।'

সাত. রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামরিক কৌশলের বিকাশ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর, মুসলিমবিশ্বের মধ্যে এক নতুন ঐক্য এবং শক্তির উত্থান ঘটে, যা ইউরোপের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে ইউরোপীয়রা মুসলিম শক্তির বিস্তার দেখতে পায়, আবার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করার জন্য নতুন উপায় খোঁজে। অন্যদিকে উসমানি সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর একটি সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়—যা মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এবং ইউরোপের বিস্তৃত অংশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এর বাইরে বিকাশ ঘটে নানান ধরনের সামরিক কৌশলেরও।

১. ইউরোপ ও মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক পরিবর্তন

ইউরোপ ও মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর কথা যদি বলতে হয় :

ক. মুসলিমবিশ্ব নিরাপদ হয়ে উঠেছিল উন্মাদ ক্রুসেডারদের উন্মত্ত আক্রমণ থেকে। তারা আর কখনো সেই উন্মাদনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি প্রাচ্যভূমে; বরং এরপর মুসলমানরাই হানা দিয়েছে তাদের কলিজা পশ্চিম ইউরোপে। ভিয়েনার নগররক্ষাকারী দেয়ালে বেজেছিল মুসলিমদের বিজয়ের তোপধ্বনি।

খ. মুসলিমদের অন্তর থেকে থেকে সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছিল খ্রিষ্টানভীতি। তাদের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—আমরা যদি মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মতো ঈমানি দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে কেউ কখনো আমাদের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারবে না।

গ. এই বিজয় খ্রিষ্টজগতকে ঠেলে দিয়েছিল আগ্রাসী অবস্থান থেকে প্রতিরোধী অবস্থানে। তাই তো দেখা যায়, এই বিপ্লবী বিজয়ের পর প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মুসলিমবিশ্বে হামলে পড়ার কিংবা ক্রুসেড ঘোষণার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি।

ঘ. এই মহাবিজয় মুসলমানদের সামনে খুলে দিয়েছিল ইউরোপ অভিযানের দুয়ার। যে পথে হেঁটে মুসলমানরা পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপের আটশো মাইল ভেতরে—সুদুর ভিয়েনার শহর প্রাচীরের পাদদেশে। ইউরোপ হয়ে উঠেছিল তখন মুসলমানদের রহম-করমের পাত্র।

ঙ. বিশেষ করে সুলতান সালিম খান ও সুলায়মান আলিশানের যুগে ইউরোপ

এতটাই হতাশ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা পুরোদস্তুর অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে শুরু করেছিল। সুলায়মানের যুগে তো মুসলিমরা জলে-স্থলে এতটাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল যে, একদিকে কাছের ইউরোপীয়রা যেমন গাছের পাতা ঝরার শব্দেও শিউরে উঠত—এই বুঝি এসে পড়ল উসমানিদের অশ্বারোহীবাহিনী; তেমনিভাবে সুদূর ইংল্যান্ডের জেলেরা পর্যন্ত এই ভয়ে সাগরে নৌকা ভাসাবার সাহস রাখত না যে, কখন না জানি আবার কোন দিক থেকে এসে হামলে পড়ে খাইরুদ্দিন বারবারুসার কোনো কাপ্তান কিংবা নৌবহর।

চ. উসমানিদের অন্তরের এই আত্মবিশ্বাসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল হিন্দুস্থানি শাসকদের মধ্যেও। উসমানিদের ঈমানের তাপ তাদের হৃদয়েও উত্তাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে এখানেও মুসলমানরা হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। এখানেও তাদের সামনে দাঁড়াবার সাহস পায়নি ভীরু পৌত্তলিকের দল।

ছ. হিংস্র তাতার কর্তৃক মুসলিমবিশ্ব দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার পর মাত্র এক শতাব্দী যেতে না যেতেই মুসিলিমবিশ্বের আবারও এক বিস্ময়কর উত্থান হয়। তারা ফিরে আসে দ্বিগুন শক্তি নিয়ে। এটা সম্ভব হয়েছিল মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের এই মহাবিজয় কিংবা মহাবিপ্লবেরই ফলে।

জ. এই মহাবিজয় এতটাই প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল যে, অনেক ইতিহাসবিদ তো বলেই বসেছেন—ইস্তাম্বুল বিজয়ই ছিল মধ্যযুগের বিদায়ী ঘন্টা এবং আধুনিক ইউরোপীয় রেনেঁসা তথা উত্থানের টার্নিং পয়েন্ট। এই পরাজয় তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল মান্দাত্তার আমলের সামরিক উপকরণ নিয়ে উসমানিদের মোকাবিলা করা আসলে সম্ভব নয় আর। উসমানিদের মোকাবিলা করতে হলে তাদেরকেও আনতে হবে শিল্পবিপ্লব। সংগ্রহ করতে হবে বিপুল বিত্ত-বৈভব। এগিয়ে যেতে হবে শিক্ষায়। আত্মস্ত করতে হবে প্রযুক্তবিদ্যা।

ঝ. তারা অনুধাবন করেছিল, শুধু শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আর অস্ত্রশস্ত্রই নয়, যুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে মুসলিমদের মধ্যে ধরাতে হবে ভাঙ্গন। আর এর জন্য দরকার মুসলিম সমাজব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে নাশকতা চালানোর মতো সুগঠিত গোয়েন্দা বিভাগ।

ঞ. এই বিজয় খ্রিষ্টানদের সাহসের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তারা ইস্তাম্বুলের পতনের ব্যাপারটি কল্পনাও করতে পারছিল না। কারণ দুই হাজার বছর ধরে দুর্ভেদ্য নগরীটি প্রতিরোধ করে আসছিল যুগ পরম্পরায় অসংখ্য দিগ্‌বিজয়ীদের আক্রমণ। কেউ এর দেয়াল থেকে খুলে নিতে পারেনি একটি ইটও। মুসলমানরাও বার কয়েক চালিয়েছিল ইস্তাম্বুলমুখে বিজয়ের অভিযান, কিন্তু তারা উতরে গেছে প্রতিবার।

অবশ্য একবার তারা ইস্তাম্বুলের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়েও পড়েছিল। সেটি ছিল সুলতান মুহাম্মাদের প্রপিতামহ সুলতান বায়েজিদ ইয়িলদিরমের আক্রমণের সময়। তবে সে

যাত্রায়ও তারা মুসলিমবিশ্বের চেঙ্গিসখ্যাত আমির তৈমুরলংকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে বাঁচিয়ে নিয়েছিল ইস্তাম্বুলের অস্তিত্ব। শুধু বাঁচানোই নয়, তৈমুরের মাধ্যমে উসমানি সালতানাতকে এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছিল—মনে হচ্ছিল আর বুঝি উঠে দাঁড়াতে পারবে না উসমানিরা। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদের দাদা প্রথম মুহাম্মাদ অস্বাভাবিক যোগ্যতায় দাঁড় করিয়ে নেন উসমানি সালতানাতকে। ফিরিয়ে দেন আবারও তার হারানো মর্যাদা ও ভাবমূর্তি। এরপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ২২ বছরের এক তরুণ সুলতানের হাতে যে ভেঙে পড়বে তাদের দুই হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য; সেটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি কখনো। ফলে তারা হয়ে পড়েছিল হতাশায় কাতর। বিস্ময়ে বিমূঢ়। কারণ তখন তারা নিজেদের সব অহমিকার পতন ঘটিয়ে ক্যাথলিকদের সহায়তা নিয়েও পতন ঠেকাতে পারেনি ইস্তাম্বুলের। তারা সর্বস্ব দিয়ে লড়েছিল। খ্রিষ্টজগতের ইতিহাসে এমন প্রতিরোধ যুদ্ধের দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। সেই যে ভেঙে পড়েছিল, আজ পর্যন্ত আর তারা দাঁড় করাতে পারেনি একক কোনো বাদশাহি শাসনব্যবস্থা।

২. আধুনিক সামরিক কৌশলের বিকাশ

কনস্টান্টিনোপল বিজয় শুধু একটি সামরিক অভিযানই ছিল না, বরং এটি আধুনিক যুদ্ধের নতুন ধারণা, কৌশল আর প্রযুক্তির উন্নতির সূচনারেখা টেনেছিল। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের নেতৃত্বে উসমানি সেনারা বিপ্লবী কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে যুদ্ধের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। ঘটিয়েছিল আধুনিক সামরিক কৌশলের বিকাশ। সংক্ষিপ্তভাবে ধারণা দিতে গেলে বলতে হয় :

ক. বিশাল কামান ও যুদ্ধপ্রযুক্তি : কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সুবিশাল কামানের ব্যবহার, যা যুদ্ধের পদ্ধতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। সুলতান আল-ফাতিহ্ কৌশলগতভাবে এই কামান ব্যবহার করেন শহরের দুর্গের দেয়াল ভাঙতে। বাইজেন্টাইনরা ইতিপূর্বে এত বিশাল কামান আর কোনো অবরোধে কখনো দেখেনি। এই কামানপ্রযুক্তি পরবর্তীকালে আধুনিক সেনাবাহিনীর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আজ এত শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও শক্তিশালী সেই কামানব্যবস্থা যুদ্ধকৌশলের পরতে পরতে জায়গা দখল করে আছে হাওইটজার, মর্টার, রকেট আর্টিলারিসহ আরও বহু নামে।

খ. নৌবাহিনীর কৌশল : সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ্ উসমানিদের নৌবাহিনীতেও ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবেই তিনি নতুন কৌশলী নৌযান যেমন যুক্ত করেন, তেমনি আরও যুক্ত করেন বিস্ময়কর কিছু পদ্ধতি ও যুদ্ধকৌশলও। এর মাধ্যমে উসমানিরা এমন এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়—যা পরবর্তী শতাব্দীজুড়ে সমুদ্রযুদ্ধের কৌশলে বিপ্লব সাধন করে।

প্রায় সব যুগের সব ইতিহাসবিদই এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার মধ্যযুগের আগে-পরের সামরিক ইতিহাসে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সূচনা করেছে এক নতুন যুগেরও—যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে সামরিক পরিকল্পনা ও যুদ্ধের পদ্ধতিগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

মোদ্দাকথা, কনস্টান্টিনোপল বিজয় শুধু একটি সামরিক অভিযান ছিল না, বরং এটি একটি সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এটি শুধু মুসলিমবিশ্বের জন্যই নয়, বরং ইউরোপের জন্যও এক নতুন যুগের সূচনা ছিল। এরপরই মূলত ইউরোপ তার অজ্ঞতা ও পশ্চাদ্‌মুখিতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কৌশল, প্রযুক্তি এবং সাহসিকতার কারণে নিঃসন্দেহে কনস্টান্টিনোপল বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত হয়।

আট. সুলতানের উত্তরাধিকার ও আমাদের শিক্ষা

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের উত্তরাধিকার শুধু উসমানি সালতানাতের বিজয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি পৃথিবীজুড়ে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। তাঁর কৌশল, নেতৃত্ব এবং দুর্বোধ্য সাহসিকতা আজও মানব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বিজয়ের ফলে সৃষ্ট নতুন যুগটি শুধু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়—বরং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও বৈপ্লবিক ছিল। সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের বিজয়ের প্রতিটি দিক আজও আমাদের সামনে এক অসীম শিক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ তাঁর নিজের সময়ের শ্রেষ্ঠ একজন শাসক ছিলেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। নিজেকে তিনি এমন একজন নেতা হিসেবে তৈরি করেছিলেন, সত্যিকার অর্থেই যিনি ছিলেন নিজের দেশ ও দশের কল্যাণে আগ্রহী, তাদের শাসক হিসেবে বিশেষ সচেতন এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুলতানের এই পুরো কর্ম ও কৃতিত্বের মধ্যে মোটাদাগে আমাদের জন্য যে দুটি বিষয় শিক্ষার ও উপলব্ধি করার রয়েছে :

ক. জ্ঞান ও নৈতিকতা : সুলতানের শিক্ষাদীক্ষা শুধু সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর পাশাপাশি তিনি গভীরভাবে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং চর্চা করেছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শাস্ত্রও। ইসলামি আদর্শ ও শরিয়তের বিধানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অটুট। তাঁর শাসনকাল ছিল এমন একটা সময়—যে সময়টাতে তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা ও প্রসারের পাশাপাশি সামরিক

কৌশল ও প্রশাসনিক দক্ষতার মাধ্যমেও নিজের সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করেছিলেন।

খ. প্রত্যয় ও দৃঢ়তা : তিনি সব সময় কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিজয়ের পথে এগিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটাই আমরা লাভ করি যে, জীবনে বড় লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিজয়ের জন্য একাগ্রতা আর পরিকল্পনার গুরুত্ব যে কতটা অপরিসীম, সেটার বাস্তব প্রমাণও তিনি দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধ ও রচনা সূত্র :

১. আবরাজু সিফাতি মুহাম্মাদ আল ফাতিহ; লেখিকা : আমানি আল মাশাকাবা (প্রবন্ধ)। ২. মুহাম্মাদ আল ফাতিহ : ফাতিহুল কুসতুনতুনিয়াহ, লেখক : নাদির নাইফ মুহাম্মাদ (প্রবন্ধ)। ৩. কাইফা ফাতাহা মুহাম্মাদ আল ফাতিহ আল কুসতুনতুনিয়াহ, লেখক : সুলতান মাকনাসাহ (প্রবন্ধ)। ৪. আস-সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, লেখক : ড. মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি (গ্রন্থ)। ৫. ফাতহুল কুসতুনতুনিয়াহ বাইনা জুহুদিল মুসলিমিনাল উলা ওয়াল হাসাদিল উসমানি, লেখক: মুহাম্মাদ জাহিদ গুল (প্রবন্ধ)। ৬. ফাতহুল কুসতুনতুনিয়াহ ওয়াস সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, লেখক : তারিক সুওয়াইদান (প্রবন্ধ)।

শিল্পবিপ্লবে বিশ্ব যেভাবে বদলে গেল

আরিফ খান সাদ

❝ শিল্পবিপ্লব মানবেতিহাসের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন, যা মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়ে প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতার নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছিল। ❞

— টমাস অ্যাসটন, (*The Industrial Revolution: 1760–1830*)

❝ শিল্পবিপ্লব ছিল মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি, যা বিশ্বের প্রতিটি কোণে নিজের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। ❞

— জোয়েল মোখির, (*The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*)

মানুষের জীবন একসময় আবর্তিত হতো 'পানি' ঘিরে। পৃথিবীর যেখানে মিলত পানির উৎস, সেখানেই গড়ে উঠত মানব-বসতি এবং মানবসভ্যতা। সুপ্রাচীনকালে এমন অনেক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ইরাকের দজলা ও ফোরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, মধ্যএশিয়ার সাইহুন ও জাইহুন নদীর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা-মাওয়ারাউন্নাহার) তীরবর্তী অঞ্চলে, মিসরের নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলে, ইয়েমেনের আদন বন্দর ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে, লোহিত সাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে, সিন্ধু ও গঙ্গা-যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। পৃথিবীর যেখানেই ছিল বহতা নদী, সেখানেই মানবজাতি গড়ে তুলেছিল বর্ণাঢ্য সভ্যতা। আরবের মরু-অঞ্চলেও পানির উৎস ঘিরে চলত যাযাবর মানুষের জীবনযাত্রা। এভাবে 'পানি' ঘিরে চলা মানবসভ্যতার সুদীর্ঘকালের সফরের শেষ প্রহরে আমাদের নিকট অতীতে হঠাৎ বদলে যায় আবহমানকালের এই জীবনধারা। 'পানি'র জায়গা দখল করে নেয় 'পণ্য'। এখন মানুষের জীবন আবর্তিত হয় শিল্পপণ্য ঘিরে। যেখানেই শিল্পপণ্যের উৎপাদন হয়, সেখানেই জেগে ওঠে প্রাণচাঞ্চল্য। কোনো বিজন ভূমিতেও যদি শিল্পপণ্য উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তবে সেখানেও ঢল নামে মানুষের; গড়ে ওঠে শিল্পনগরী এবং জমজমাট মানববসতি।

আবহমানকাল থেকে চলে আসা বংশানুক্রমিক জীবনধারা ভেঙে এখন মানুষ ছুটে

চলেছে শিল্পনগরীর কোলে ও কোলাহলে। এই অভাবিত পরিবর্তনকেই একশব্দে বলা হয় 'শিল্পবিপ্লব', যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Industrial Revolution। মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ এখন Industry বা শিল্প। মানুষের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যবহার্য প্রতিটি বিষয় এখন 'ইন্ডাস্ট্রি'র অধীনে। প্রতিটি বস্তুই এখন শিল্পপণ্য, প্রতিটি জিনিসের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থমূল্য। এমনকি প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া আগুন-পানি-আলো-বাতাস ভোগ করার জন্যও গুণতে হয় অর্থমূল্য। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন বা শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় পৃথিবীর প্রান্তবর্তী একটি সাগরের বুকে জেগে থাকা ছোট একটি দ্বীপদেশ ব্রিটেন; ইউরোপের মূল ভূমি থেকেও বিচ্ছিন্ন একটি দারিদ্রজর্জর দ্বীপদেশ। ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধে ভারতবর্ষের একটি অংশ দখলের মাধ্যমে তৎকালীন দরিদ্র ব্রিটেনের হাতে যায় বিপুল অর্থ। দ্বীপদেশটিতে বন্যার ঢলের মতো ঢোকা সেই বিপুল কালো ও কাঁচা টাকায় ১৭৬০ সালের সময়টিতে হঠাৎ অন্ধকার ইউরোপে জ্বলে ওঠে শিল্পবিপ্লবের চোখ-ধাঁধানো আলো।

পৃথিবীর মানবসভ্যতার সুদীর্ঘকালের বর্ণাঢ্য ইতিহাসে ইউরোপ অনুপস্থিত। মানবসভ্যতার সুদীর্ঘকালের অভিযাত্রার একেবারে শেষ প্রহরে এসে তারা নাম লেখায় সভ্যতার তালিকায়। পৃথিবীর বুকে প্রথম মানবসভ্যতা স্থাপন করেন আদম-হাওয়া দম্পতি। আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিকাশ ঘটে মানবসভ্যতার। তাদের হাত ধরেই মানবজাতির যাপিত জীবনের যাবতীয় কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয় পৃথিবীতে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল এসে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন, কীভাবে গাছের কাঠ কেটে চাকা তৈরি করতে হয় এবং গরুর গাড়ি বানিয়ে কৃষিকাজ করতে হয়। তার সন্তানেরা বংশানুক্রমে গাড়ি-শিল্পে বিকাশ সাধন করে এবং নিকট অতীতে তৈরি করে আধুনিক মডেলের গাড়ি। তারপর হজরত নুহকে শিখিয়ে দেন, কীভাবে কাঠ কেটে জাহাজ তৈরি করতে হয়। পরবর্তী সময়ে তার সন্তানেরা জাহাজ শিল্পে অভূতপূর্ব বিকাশ সাধন করে। তারপর হজরত ইদরিসকে শিখিয়ে দেন কীভাবে বাঁশের কঞ্চি কেটে কলম তৈরি করতে হয়, কয়লা থেকে কালি তৈরি করতে হয় এবং গাছের বাকল কেটে কাজগ তৈরি করতে হয়। পরবর্তী সময়ে তার উত্তরসূরি ও অনুসারীরা লিপিশাস্ত্রে নব নব সংযোজন ঘটিয়ে তৈরি করে আজকের লেখালেখির রমরমা বাজার।

তাফসিরেশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ মতে, হজরত বাবা আদম বসবাস করতেন হিন্দ মুলকে, অর্থাৎ আমাদের এই ভারতবর্ষে। হজরত নুহ বসবাস করতেন ইরাকে, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার জন্মভূমিতে। হজরত ইদরিস বসবাস করতেন মিশরে, যেখানে প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাদপীঠ। মিশর ও ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী এলাকায় হজরত ইদরিসের উত্তরসূরি ও অনুসারীদের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ও সভ্যতার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। পরবর্তী সময়ে সেখানে যে সভ্য জাতির বিকাশ ঘটে, গ্রিক ইতিহাসে তাদের

বলা হয় 'ফিনিশীয় জাতি' এবং আরব ইতিহাস অনুযায়ী বলা হয় 'আরামায়িক জাতি'। কুরআনে তাদের বলা হয়েছে 'ইরম', যা 'আরামায়িক' শব্দের মূল। আরামায়িক বলি বা ফিনিশীয়—অদম্য সেই জাতি গড়ে তোলে গ্রিক সভ্যতা। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠা সেই সভ্যতায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য নবি-রাসুলের ঐশীজ্ঞানধারা, সেসব অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠীর ক্ষীয়মান জ্ঞানধারা এবং মধ্যযুগের বিজয়ী মুসলমানদের নব ঐশীয় তরতাজা জ্ঞানধারার মিথস্ক্রিয়ায় নবতর জ্ঞানবিপ্লবের বিকাশ ঘটে, যার সর্বশেষ ফলাফল আজকের আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা।

প্রায় সব ধারার সূত্রমতে, আধুনিক ইউরোপের আদি সিলসিলা গ্রিক ও রোমান সভ্যতা। রোমান ভাষায় বলা হয় 'গ্রিক', আরবি ভাষায় বলা হয় 'ইউনান'। আর বাংলায় 'গ্রিক' এবং 'ইউনান' দুটো শব্দই ব্যবহার হয়। প্রাসঙ্গিগ আলোচনার মধ্যেই এ রহস্যের জট উন্মোচিত হবে।

প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগর এবং এজিয়ান উপসাগরের তিন দিকের তীরবর্তী ভূমি—মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুরস্ক (এশিয়া মাইনর), এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, গ্রিস, ইটালি, সিসিলি (সিকিল্লিয়া) প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল গ্রিক সাম্রাজ্য ও সভ্যতা। তখন সে সাম্রাজ্যকে বলা হতো হেলেনীয় সাম্রাজ্য। কালক্রমে সে সাম্রাজ্য আরও অনেক বিস্তৃত হয় এবং তাদের রাজ্যসীমা স্পেন, সার্দিনিয়া, কর্সিকা, যুগোশ্লাভিয়া, দক্ষিণ ফ্রান্স, ম্যাগনা গ্রেসিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া ছাড়িয়ে যায়। এমনকি তুরস্ক-ইরান হয়ে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল।

গ্রিক ও রোমান জাতির বংশধারা সম্পর্কে গ্রিক লিটারেচারে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারে তাদের মূল উৎসের নাগাল পাওয়া যায়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী—হজরত আদম আ.-এর দশম অধস্তন পুরুষ হজরত নুহ আ.-এর তিন সন্তান থেকে পৃথিবীতে মানবজাতির বিকাশ ঘটে। তারাই বর্তমান পৃথিবীতে বংশবিস্তার করে বহু জাতি-ধর্মে বিস্তৃত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'নুহ আমাকে ডাকল। আর কী চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম এক মহাসংকট থেকে এবং তার বংশধরদেরকেই আমি টিকিয়ে রাখলাম (পৃথিবীতে)।'[২]

হজরত নুহ আ.-এর সঙ্গে ছিলেন তার তিন পুত্র—সাম, হাম, ইয়াফেস। প্রথম পুত্র সাম থেকে শাম বা সেমেটিক সভ্যতার উদ্ভব হয়। সামের অধস্তন পুরুষ ইবরাহিম আ.-এর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক থেকে বিকাশ ঘটে মক্কায় শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের এবং ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদি-খ্রিস্টান

---

[২] সুরা সফফাত, আয়াত : ৭৫-৭৭

(বনি ইসরাইল) ধর্মের নবি-রাসুল, যেমন—ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সুলাইমান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা (আ.) প্রমুখের অনুসারীদের। নুহ আ.-এর দ্বিতীয় পুত্র হাম থেকে বিকাশ ঘটে আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর। তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস থেকে বিকাশ ঘটে গ্রিক (ইউনান), রোমান, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং আর্য জাতির।

হজরত সামুরা রাজি. বলেন, আল্লাহর রাসুল বলেছেন, 'সাম হলেন আরব জাতির পূর্বপুরুষ, হাম হলেন হাবশি জাতির পূর্বপুরুষ আর ইয়াফেস হলেন রোমান জাতির পূর্বপুরুষ।'[৩]

আরেক বর্ণনায় জানা যায়, সাঈদ ইবন মুসাইয়িব রহ. বলেন, 'নুহ আ.-এর ঔরসে তিনজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন—সাম, হাম ও ইয়াফেস। তাদের প্রত্যেকের ঔরসে আবার তিনজন করে পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সামের তিন পুত্র হলো আরব, ফারিস (পারস্য) ও রোম। হামের তিন পুত্র হলো কিবত, সুদান ও বার্বার। ইয়াফেসের তিন পুত্র হলো তুর্ক, সাকালিবা ও ইয়াজুজ-মাজুজ।'[৪]

হাদিসে উল্লেখিত 'রোম' বলে 'প্রথম রোম' উদ্দেশ্য; আর প্রথম রোম হলো ইউনান (গ্রিক)। তার বংশধারা হচ্ছে—রুমি ইবনে লিবতি (লানতি) ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফেস ইবনে নুহ।[৫] গবেষক আলেমদের মতে, রোমানদের বংশধারা গ্রিক ও লাতিন ভাষাভাষী ইউনানিদের (গ্রিক) বংশের সাথে মিলিত হয়। তাওরাতে ইউনানের নাম ছিল ইয়াফান। আরবরা নামটিকে আরবিতে আত্মীকরণ করলে হয়ে যায় ইউনান। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ইউনান কীভাবে গ্রিক হলো? ইউরোপে সাধারণত ইউনানকে 'গ্রিস' এবং সেখানকার অধিবাসী ও বিষয়াদিকে 'গ্রিক' বলা হয়। পরিবর্তনটি এভাবে হয়—প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী রোমান জাতি ইউনান জাতির যে গোত্রের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ করেছিল, তার নাম ছিল গ্রিসিয়ান। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বর্তমান গ্রিস অঞ্চলে ছিল সে গোত্রের শক্তিশালী অবস্থান। পরবর্তী সময়ে রোমানরা ইউনানের সকল গোত্রকেই এক শব্দে 'গ্রিসিয়ান' নামে সম্বোধন করতে থাকে। এভাবে ইউনানি সকল গোত্রই 'গ্রিক' হিসেবে পরিচিতি পায়। এদিকে রোমানদের থেকে ইংরেজি ভাষায় 'গ্রিক' শব্দটি ব্যবহার হতে থাকে আর আরবি ভাষায় ইউনান শব্দটি অবিকৃত থাকে।[৬]

ইউরোপীয় অঞ্চলে গ্রিক জাতি গড়ে তুলেছিল বিশাল সাম্রাজ্য, সভ্যতা ও জ্ঞানভাণ্ডার। সেখানে যেমন জন্ম হয়েছিল দিগ্বিজয়ী গ্রিক সম্রাট আলেক্সান্ডারের, তেমনি সেখানে

[৩] জামিউত তিরমিজি, হাদিস : ৩২৩১

[৪] ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ১, পৃ. ১১৫

[৫] ইবনে আসির, আল-কামিল ফিত-তারিখ, খণ্ড ১, পৃ. ৭৪

[৬] সায়্যিদ হাশেমি ফরিদাবাদি, ইউনানে কদিম : ৩

জন্মেছিলেন হিরোডেটাস, সক্রেটিস (সুকরাত), প্লেটো (আফলাতুন), এরিস্টটল (আরিস্ত), পীথাগোরাসের মতো জ্ঞানী ও পণ্ডিত। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে গ্রিক সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। বিশাল সাম্রাজের এথেন্স (আসিনা), আলেক্সান্দ্রিয়া (ইসকান্দারিয়া), কনস্টান্টিনোপল (কুস্তুন্তিনিয়া) প্রভৃতি শহরে গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক কেন্দ্র এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার। তবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও গোত্রীয় কলহের কারণে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। বিশেষ করে আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেডের মৃত্যুর পর (৩২৩ খ্রিস্টপূর্ব) গ্রিকদের ক্ষমতা তলানিতে নেমে আসে এবং খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ সালে গ্রিস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নতুন উদিত শক্তি তথা রোমান সাম্রোজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তালা লেগে যায় এথেন্স, আলেক্সান্দ্রিয়া ও কনস্টান্টিনোপলের বিশাল বিশাল লাইব্রেরি। ছয়শো বছর সেসব লাইব্রেরি তালাবদ্ধ পড়ে থাকে এবং মুসলমানরা সেসব লাইব্রেরির তালা খুলে প্রাচীন গ্রিক রচনাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ শুরু করে।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগেই শুরু হয় গ্রিক রচনাবলি আরবিতে অনুবাদের বিপুল কার্যক্রম। বাগদাদে আব্বাসি আমলে আলাদা অনুবাদ মন্ত্রণালয় খোলা হয় এবং রাজকীয় বেতনে অনুবাদক নিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ গ্রিক রচনা আরবিতে অনুবাদ করা হয়। আরবি অনুবাদের মাধ্যমেই বর্তমানে জীবিত রয়েছে গ্রিক পণ্ডিতদের জ্ঞানভাণ্ডার।

গ্রিক সভ্যতার পতন ঘটিয়ে উত্থান ঘটে রোমান সাম্রাজ্যের। ইউরোপের বিশাল এলাকা জুড়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে রোমানরা। রোমান রাজপরিবারের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩ সালে রোম শহরের গোড়াপত্তনের মাধ্যমে এবং সমাপ্তি হয় খ্রিস্টীয় ১৪৫৩ সালে তুর্কি উসমানি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে। রোমান সাম্রাজ্যের এই দুই হাজার বছরের ইতিহাস অনেক ঘটনাবহুল। তৎকালীন ক্রমবর্ধমান রোমান সাম্রাজ্যের মানচিত্রে ২৪২ খ্রিস্টপূর্ব সালে যুক্ত হয় সিসিলি, ২০২ খ্রিস্টপূর্ব সালে যুক্ত হয় স্পেন, ১৪৬ খ্রিস্টপূর্ব সালে যুক্ত হয় আফ্রিকা, ১১৮ খ্রিস্টপূর্ব সালে যুক্ত হয় তুরস্ক (এশিয়া মাইনর) ও শাম (অবিভক্ত সিরিয়া), ৬৬-৭০ খ্রিস্টপূর্ব সালে যুক্ত হয় আর্মেনিয়া, ৫৮-৪৮ খ্রিস্টপূর্ব সালে যুক্ত হয় ফ্রান্স, ৪৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্ত হয় ব্রিটেন দ্বীপপুঞ্জ (ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস) এবং ৯৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্ত হয় ইরাকের উচ্চভূমি পর্যন্ত। এভাবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য পৃথিবীর বুকে বিশাল এক পরাশক্তিতে পরিণত হয়।

অপরাজেয় রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় আরবের বুকে জেগে ওঠা ইসলামি শক্তির হাতে। কুরআনে সুরা রুমে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সংবাদ জানিয়ে আয়াতও অবতীর্ণ হয়। রোমানরা মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবিষ্কার করে মুতা (৬২৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ৮ম হিজরিতে বর্তমান জর্দানের মুতা প্রান্তর) এবং তাবুক

(একই বছর এবং কাছাকাছি আরেকটি জায়গায়) যুদ্ধের মাধ্যমে। এসব অভিযানে নেতৃত্বে দেন স্বয়ং নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। খোলাফায়ে রাশিদিনের শাসনামলেও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে অব্যহতভাবে। তারপর খলিফা আবু বকর ও ওমর রা.-এর শাসনামলে রোমানদের শাসনাধীন আরব অঞ্চলগুলো বিজিত হয়। উসমান রা.-এর শাসনামলে 'বাহরে রুম' তথা ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অঞ্চল রোমানদের হাতছাড়া হয়। মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে সিসিলি হাতছাড়া হয় এবং সেনাপতি উকবা ইবনে নাফে রা. রোমান সাম্রাজ্যের আফ্রিকান প্রদেশসমূহ বিজয় করেন। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনালে ৭১১ হিজরিতে সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ জয় করেন আন্দালুস (স্পেন-পর্তুগাল); এভাবে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের অর্ধেক অংশ মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

তারপর ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেলজুক সুলতান আল্প আরসালান অভিযান পরিচালনা করেন আর্মেনিয়ায় এবং মানজিকার্টের [মালাযগিরদ] যুদ্ধে তার হাতে গ্রেফতার হন রোমান শাসক চতুর্থ রোমানুস। এভাবে একসময়ের অপারাজেয় গ্রিক সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে যে রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটেছিল, সে রোমান সাম্রাজ্যের পুরোটাই ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মানচিত্রের ভেতর ঢুকে পড়তে থাকে। সাম্রাজ্যের বাইর থেকে যেমন মুসলমানরা তাদের মানচিত্র ছিড়ে ফেলছিল, তেমনি সাম্রাজ্যেরর ভেতরও ধরেছিলো ঘুণ ও ভাঙন। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই দেখা দেয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সিংহাসনের দখল নিয়ে গৃহযুদ্ধ। তারপর ২৮৪ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট নির্বাচিত হন ডিওক্লেতিয়ান। তিনি প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্তে রোমান সাম্রাজ্যকে দুটি প্রশাসনিক অংশে ভাগ করেন—পূর্ব রোমান এম্পায়ার (তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল) এবং পশ্চিম রোমান এম্পায়ার (ইটালির রোম)। তিনি নিজের হাতে রাখেন পূর্বাঞ্চলের ক্ষমতা এবং পশ্চিাঞ্চল পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেন নিজের সমমর্যাদায় (সহ-সম্রাট) ম্যাক্সিমিয়ানকে। এছাড়াও তিনি দুইজন সম্রাটের জন্য দুইজন সহকারী নির্বাচন করেন। তাদের বলা হতো সিজার (Caesar; আরবি উচ্চারণে কাইসার)। তারা শুধু নিজ অঞ্চলের সম্রাটের সহকারী হতেন তা-ই নয়, বরং সম্রাটের উত্তরাধিকারীও হতেন। এভাবে রোমান সাম্রাজ্য কার্যত দুই ভাগ হয়ে পড়ে। রোমানদের শাসন করতে থাকেন অগাস্টাস উপাধিধারী দুইজন বড় সম্রাট এবং সিজার (কাইসার) উপাধিধারী দুইজন ছোট সম্রাট।

৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ডিওক্লেতিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করলে কয়েকজন অগাস্টাস (বড় সম্রাট) এবং সিজার (ছোট সম্রাট) সিংহাসনের বসতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। ৩০৬ খ্রিস্টাব্দে সাতজন ব্যক্তি অগাস্টাস হওয়ার দাবি করেন। কঠিন গৃহযুদ্ধের পর ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্য থেকে অগাস্টাস (বড় সম্রাট) নির্বাচিত হন কনস্টান্টাইন

এবং সিজার (ছোট সম্রাট) নির্বাচিত হন লিসিনিয়াস। তারপর ৩২৪ মতান্তরে ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টাইন বসফরাস প্রণালির তীরবর্তী শহরকে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন এবং তার নাম হয় কনস্টান্টিনোপল (কনস্টান্টাইনের শহর; পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা শহরটা জয় করে কনস্টান্টিনোপল নাম বদলে রাখে 'ইসলামপল'>ইস্তাম্বুল বা ইসলামের শহর)।

রোম থেকে কন্সস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থানান্তরের বিষয়টি ছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ভাগ হওয়ার পূর্বাভাস। এই শহর বিজয়ের জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর শাসনামলে, ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে, ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে। সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন হিজরতের সময় নবিজিকে মদিনায় নিজ ঘর প্রদানকারী সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাজি.। তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন এবং কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের কাছে তাকে কবর দেওয়া হয়। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি উসমানি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এই দুর্ভেদ্য দুর্গবেষ্টিত শহর জয় করেন স্থলপথে জাহাজ চালিয়ে বিস্ময়কর অভিযানের মাধ্যমে। এভাবে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের দুই বাহুর এক বাহু চিরতরে ভেঙে পড়ে। একইসঙ্গে অপর বাহু পশ্চিম রোমান রাজধানীও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আশপাশের রাজাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কয়েক টুকরো হয়ে যায়।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে ইউরোপে ছয়টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায় : ইটালির অস্ট্রোগথ, আফ্রিকান ভ্যান্ডাল, আইবেরিয়ান উপদ্বীপের স্পেন-ভিসি গথিক, প্রাউন্সের বারগুন্ডিয়ান, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক এবং ব্রিটেনের এ্যাংলো-স্যাক্সন রাজ্য। এসব রাজ্য ছিল জার্মানিক সাম্রাজ্যের অংশ। উপরন্তু ছিন্নভিন্ন রোমান সাম্রাজ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং আশপাশের ছোট ছোট রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি করে ফেলে। ইতিহাসের এমন অন্ধকার এক সময়ে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জার্মান থেকে Angle নামের একদল মৎসজীবী জেলে সম্প্রদায় সাগর পাড়ি দিয়ে ভাগ্যের আশায় বসতি স্থাপন করে বর্তমান ইংল্যান্ডে।

ইংল্যান্ড শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষার Angus বা Agkos থেকে। শব্দটি লাতিন ভাষায় গিয়ে হয় Angulus এবং এটি জার্মান ভাষায় গিয়ে হয় Anglis এবং ইংরেজি ভাষায় গিয়ে হয় English। গ্রিক ভাষার মূল শব্দটির অর্থ বাঁকা করা, যা পরিবর্তিত হয়ে মাছ ধরার বরশি অর্থ দেয়। যেহেতু ভাগ্যান্বেষী সম্প্রদায়টির পেশা ছিল মাছ শিকার করা, তাই তাদের নাম হয়ে যায় English। সম্প্রদায়টি সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, দ্বীপটির নাম হয়ে যায় তাদের নামানুসারে England। আর English শব্দটির পর্তুগিজ উচ্চারণ হচ্ছে ইংরেজি। মজার বিষয় হচ্ছে, English শব্দটির উৎসশব্দ গ্রিক Angus বা Agkos শব্দটির

মূল উৎস আরবি ভাষার শব্দ Al-kaus, যার অর্থ তির-ধনুক। মাছ ধরার বরশি যেহেতু বাঁকানো হয়, তির ছোড়ার ধনুকও বাঁকানো হয়, তাই বলা যায় ইংরেজ জাতির পরিচয়জ্ঞাপক শব্দটিও আরবি ভাষা থেকে উৎসারিত।[৭]

ভূমধ্যসাগর ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রিক-রোমান সাম্রাজ্যে কিছুটা হলেও সভ্যতার আলো ছিল। কিন্তু ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ইংল্যান্ড ছিল একেবারে অসভ্য, বর্বর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইউরোপের অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। ড. ড্রিপার বলেন, 'মধ্যযুগে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল বিজন ও দুর্গম ভূমি। কোনো কোনো অঞ্চলে পাদরিদের খানকাহ ও জীর্ণশীর্ণ বসতি ছিল। পয়ঃপ্রণালি ও নদীর দুধারে শত শত মাইল জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ময়লা-আবর্জনা। সেখান থেকে উত্থিত দুর্গন্ধময় বাষ্প অনক দূর পর্যন্ত পরিবেশকে দূষিত করত। রোগ-জীবাণু ছড়াত। লন্ডন ও প্যারিস্যের মতো শহরে ছিল খড়ের ছাউনি দিয়ে বানানো ঘর। লাইট, আলোকদানি ও জানালা কী, তারা জানতও না। গালিচা ও কার্পেট নামক সৌখিন ফরাশের সাথে তারা পরিচিতই ছিল না। এসবের পরিবর্তে তারা ব্যবহার করতো খড়। তাদের বিছানাগুলোও ছিল খড়ের। বালিশ হিসেবে ব্যবহার করত কাঠের টুকরা। মদ পান করত মহিষের শিংয়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য কোনো নালা বা ড্রেনের প্রচলন ছিল না তাদের মাঝে। অলিতে-গলিতে ছিল ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। রাস্তা-ঘাট ছিল কাদায় পূর্ণ। আবার কোনো আলোর ব্যবস্থাও ছিল না। এসব কারণে রাতের বেলা রাস্তায় বের হলে কাদায় মাখামাখি হয়ে যেত। আবাসন সংকীর্ণ হওয়ায় গরু ও মহিষের সাথে তারা একই ঘরে ঘুমাত। সাধারণ জনগণ গায়ে দিত পশুর চামড়া। বছরের পর বছর একটি কাপড় পরে দিন কাটাত। এমনকি এসব ধোয়ার কথাও জানত না তারা। ফলে ময়লা জমে জমে জামা-কাপড় হয়ে যেত উৎকট গন্ধযুক্ত। নোংরা শরীর ও ময়লা পোশাকের কারণে উকুনের প্রাদুর্ভাব লেগে থাকত। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, এমনকি ক্যান্টারবেরির লর্ড পাদরি এত নোংরা ছিলেন যে, তিনি বাইরে বের হলে তার আলখেল্লায় হাজারো উকুন ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মানুষেরা শাক-সবজি এমনকি গাছের সবুজ পাতা ও ছাল সিদ্ধ করে খেত। মধ্যবিত্ত ঘরগুলোতে সপ্তাহে একদিন মাংস খাওয়াকে বিলাসিতা মনে করা হতো। অনেক অঞ্চলের মানুষ তো রুটির নাম পর্যন্ত জানত না। ওই যুগে পুরো ইউরোপে সম্পদশালী মানুষ ছিল মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। তাদেরও কাজ ছিল অবাধ যৌনসম্ভোগ, মদপান ও জুয়া খেলা। জমিদারদের ঘরগুলো ছিল ডাকাত-মাস্তানের আখড়া। তারা পথিকদের ওপর চড়াও হয়ে মালামাল লুট করার জন্য আটক করত। ধনসম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করত। পায়ের আঙুলে

---

[৭] ড. আলি ফাহমি খুশাইম, রিহলাতুল কালিমাত, খণ্ড ১, পৃ. ১২-১৪

রশি বেধে ঝুলিয়ে রাখত। কখনো লোহা গরম করে শরীরে ছেকা দিত। মাথায় রশির ফাঁস লাগিয়ে সর্বশক্তিতে মারধর করত। এভাবে তারা জনসাধারণের ওপর নির্যাতন চালাত। ওই যুগে ইউরোপে কোনো সড়ক ছিল না। যাতায়াতের মাধ্যম ছিল গাধা-খচ্চর ও গরুর গাড়ি। আর মহামারি ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ছিল ব্যাপক। শুধু দশম শতাব্দীতেই দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ ১০টি দুর্ভিক্ষ এবং ১৩টি মহামারি। ফলে মানুষেরা পোকার মতো মারা পড়ছিল। ওদিকে বন-জঙ্গলে বসবাস করত মানুষখেকো এক ডাকাতদল। তুর্নুস নামক অঞ্চলে প্রকাশ্যে বিক্রি হতো মানুষের মাংস। শহরের অবস্থা ছিল শৌচাগারের চেয়েও নিকৃষ্ট। শহরে শহরে সিফিলিস-গনেরিয়া রোগের ছড়াছড়ি ছিল। এমনকি প্যারিসের রাস্তাগুলোও ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধের কারণে শৌচাগারের রূপ নিয়েছিল। পরে সরকার বাধ্য হয়ে রাস্তা পরিষ্কার করিয়ে তাতে কংকর বিছানোর ব্যবস্থা করেন। তারপর প্যারিসের রাস্তাগুলো ধীরে ধীরে সেভাবে গড়ে উঠতে থাকে, যা ইসলামি স্পেনের শহরগুলোতে দেখা যেত।'[৮]

সত্যিকার অর্থেই ব্রিটেন ছিল এক আদিম জংলি জাতির বসবাস। পাহাড়-পর্বতের গুহায় বানর-হনুমানদের সাথে কাটত তাদের জীবন। ফলে তারা ভাবতে থাকে, মানুষ বুঝি বানরের বংশধর। এখনো তারা নিজেদের বানরের বংশধর মনে করে। কোমরে ও স্তনে লতাপাতা দিয়ে লেঙটি বেঁধে রাখত। এখনো তারা নেংটি পড়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে আগে নেংটি বাঁধত লতাপাতা দিয়ে, এখন বাঁধে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত কাপড় দিয়ে; যেটা তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন বা শিল্পবিপ্লবের একটি সুফল।

ইংল্যান্ডের ইতিহাসবিদ জেমস মিলার লিখেছেন, 'মধ্যযুগে ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল। এতটাই যে, বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষার জন্য পুঁজিই ছিল না তাদের। ওলন্দাজদের সাথে চলত এক অসম প্রতিযোগিতা।'[৯] ভাগ্য বদলের আশায় ঘুরতে থাকা মসৎজীবী জেলে সম্প্রদায়টির ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায় ভারতবর্ষের প্রাকৃতির সম্পদ হাতে পাওয়ার পর। ১৭৫৭ সালে বৃহৎ বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ জাতি শুরু করে ব্যাপক লুটপাট। এত পরিমাণ লুটপাট করে যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই অন্ধকার ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূর্যোদয় ঘটে যায়। বাংলা থেকে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যায় স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা। পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই ভূখণ্ডে সম্পদের এতটাই ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয় যে, সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলায় শুরু হয় টানা দুর্ভিক্ষ আর ইংল্যান্ডে শুরু হয় শিল্পবিপ্লব।

---

[৮] ড. রবার্ট উইলিয়াম ড্রিপার, হিস্ট্রি অব দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন রিলিজিয়ন এন্ড সাইন্স, মারেকা মাজহাব ওয়া সাইন্স, পৃ. ৩৭৯-৪২৯

[৯] jemes mill, unhappy india, lala lajpat rai, 1928 paje : 322

ইতিহাসবিদদের চিহ্নিত করা সময় অনুযায়ী ১৭৬০ সালে শুরু হয় শিল্পবিপ্লব। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডিগবি লিখেছেন, 'পলাশি যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।'[১০] লর্ড মেকলে লিখেছেন, 'ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যতটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতবর্ষের সম্পদের প্রবেশ। ... শিল্পবিপ্লব, যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবল ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা কোনো লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া (লুট করা) হয়েছিল। তা না হলে স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান—এমনই লোকসান, যা ভারতবর্ষের শিল্পকে ফোকলা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যেকোনো দেশ থেকে যদি এইভাবে সম্পদ পাচার করা হয়, তাহলে সে দেশ সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।'[১১]

ভারতবর্ষ, বিশেষেত বৃহৎ বাংলা থেকে কী পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল, তা অনুমান করার জন্য ব্রিটিশ লেখকের এই খতিয়ান যথেষ্ট।

পি. স্পেয়ার লিখেছেন, 'রাজধানী মুর্শিবাদাদের সরকারি কোষাগার থেকে পাচার করা হয় ১৫ লক্ষ, যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায় করা হয় ৪ লক্ষ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি লুট করে ৯ লক্ষ, কোম্পানির কাউন্সিল মেম্বাররা প্রত্যেকে লুট করে ৫০-৮০ হাজার করে, ক্লাইভ নিজে লুট করে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার। সাথে বছরে ৩০ হাজার করে বেতন। জামাই মির কাসেম নিজ থেকে দেয় ২ লক্ষ। নজম-উদ-দৌলা দেন ১ লক্ষ ৪৯ হাজার। আর সাধারণ ব্রিটিশ সেনারা বেহিসাব লুটপাট করে। পলাশি যুদ্ধের পর এভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ইংল্যান্ডে প্রবেশ করে।'[১২]

ইংল্যান্ডের সকল যুদ্ধের খরচ (১৭৫৭ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড), সব ধরনের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ফাউন্ডিং, সব ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকরণের পুঁজি সরবরাহ করেছে ভারতবর্ষ; বিশেষত বাংলাদেশ। ভারতবর্ষের মানচিত্র কেটে-ছিঁড়ে এদেশের মাটি ও মানুষের রক্ত-ঘাম নিংড়ে-চিপে ইংল্যান্ড আজ উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। হয়েছে ঝকঝকে-তকতকে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শীর্ষে আরোহণ করেছে। মোটকথা, শিল্পবিপ্লবের পুরোটা পুঁজি যোগান

---

[১০] Sir Willim Digby, Prosperous' British India, 1901

[১১] Malcom, Life of Clive

[১২] The Indian Nabobs

দিয়েছে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের মানুষ। মোমবাতির আলোর নিচে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি আধুনিক ইউরোপের উন্নতি ও শিল্পবের আড়ালে নীরবে-নিভৃতে আছে বাংলা-মাটির কান্না ও হাহাকার। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ স্যার উইলিয়াম ডিগবি লিখেছেন, '১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে আইনগতভাবে (আইন তৈরি করে) আমরা নিয়েছি ৬,০৮০ মিলিয়ন পাউন্ড (৬০৮০,০০০,০০০ পাউন্ড)।[১৩]

মিস্টার এ.জে. উইলসন ১৮৮৪ সালে Fortnightly Review ম্যাগাজিনের মার্চ সংখ্যায় লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের মানুষের বছরে মাথাপিছু আয়ই সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড। সেখানে প্রতিবছর আমরা কোনো না কোনোভাবে ৩ কোটি পাউন্ড নিয়ে যাচ্ছি।'

পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সমুদ্রের মধ্যখানে অবস্থিত ছোট একটি দ্বীপদেশের মৎসজীবী জেলে সম্প্রদায় যখন হঠাৎ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তরতর করে উঠে যাচ্ছিল, তখন হাজার বছরের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বঙ্গদেশের মানুষেরা বরণ করছিল দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। যে বাংলার মানুষের গোলাভরা ধান ও নদীভরা মাছ ছিল, তারা ইংরেজ নীলকরদের কর শেধ করতে না পেরে মরে যেতে লাগল। ১৭৭০-১৮৫০ সালে মাত্র ৮০ বছরের মধ্যে ১২ বার দুর্ভিক্ষ হয়ে যায়, না খেয়ে মারা যায় ৬০ লাখ মানুষ। ১৮০১-১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১টা মন্বন্তরে (মহাদুর্ভিক্ষ) মরে যায় ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ। পৃথিবীর একটি উর্বর মাটির দেশের মানুষ এভাবে না খেয়ে মরে যায়।[১৪]

বাংলার ঐতিহ্যবাহী মসলিনশিল্প ধ্বংস করে ইংল্যান্ড জন্ম দেয় শিল্পবিপ্লবের। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী উইলিয়াম বোল্ট Considerations on India Affairs তার পত্র সংকলনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ লুটপাটের খাতিয়ান তুলে ধরে লিখেছেন, 'পুরো দেশজুড়ে শিল্পশ্রমিকদের ওপর হেন অত্যাচার নেই, যা করা হয়নি। অত্যাচারের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। বিশেষ করে তাঁতিদের ওপর। তাঁতি, দালাল ও পাইকারদের উৎপাদন-সংগ্রহের কোটা পূরণ না হবার জন্য গ্রেপ্তার, জেল, মোটা জরিমানা, চাবুকপেটা এবং নিজ ভূমি থেকে বহিষ্কার করা হয়। কম উৎপাদন করলে তাঁতিদের পণ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এমন ঘটনাও জানা যায়, এসব বাধ্যশ্রম থেকে বাঁচতে তাঁতিরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলেছে।'[১৫] এমনকি চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি সোমবার ইংল্যান্ডের Oxfam International প্রকাশিত প্রতিবেদনে তারা খোলা ভাষায় স্বীকার করেছে, 'দক্ষিণের সম্পদ লুটে ধনী

---

[১৩] Sir Willim Digby, Prosperous' British India, 1901

[১৪] প্রাগুক্ত।

[১৫] William Bolts, Merchant and Alderman, Or Judge Of The Hon. The Mayor's Court Of Calcutta, Considerations on India Affairs, 1772

হয়েছে পশ্চিমারা'। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'পশ্চিমা বিশ্বের ধনী দেশগুলোর বিশেষ করে ইউরোপের ধনীদের একটি বড় অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাদের সে সম্পদের একটি বড় অংশ এসেছে ঔপনিবেশিক আমলে। উপনিবেশ আমলে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও দক্ষিণের দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পশ্চিমা দেশগুলোর ধনীদের হতে চলে গেছে। একইভাবে আজও এভাবে সম্পদের শোষণ চলছে।' অক্সফাম একে আধুনিক সময়ের 'উপনিবেশবাদ' বলে বর্ণনা করেছে। আধুনিক উপনিবেশবাদে এ শোষণ চলে নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। যুক্তরাজ্যের ১০ শতাংশ ধনকুবের ঔপনিবেশিক আমলে তাদের সম্পদের অর্ধেক পেয়েছেন ভারতবর্ষ থেকে। সেই সময়ে ব্রিটিশরা ৬৪ লাখ ৮২ হাজার কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ ভারতবর্ষ থেকে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। ওই সম্পদের মধ্যে ৩৩ লাখ ৮ হাজার কোটি ডলার অর্থ গেছে যুক্তরাজ্যের ওই ১০ শতাংশ ধনীর হাতে। এই অর্থ যদি ৫০ পাউন্ডে ভাঙানো হয়, তবে সেই নোট দিয়ে পুরো লন্ডন প্রায় চারবার ঢেকে ফেলা যাবে।'

ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মোটামুটি ১৭৫০-১৮৫০ সাল এই সময়কালে কৃষি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা থেকে আধুনিক শিল্পায়নের দিকে চলতে শুরু করলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। এটাই একশব্দে শিল্পবিপ্লব। দ্বীপদেশ ব্রিটেনে প্রথমে 'সুতা কাটার যন্ত্র' আবিষ্কৃত হলে বস্ত্রশিল্পে এক অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁত বুনন-যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে প্রচলিত বুনন পদ্ধতির পরিবর্তে এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয় এবং ফলাফল হিসেবে বস্ত্র-শিল্পে এক পরিবর্তনের জোয়ার তৈরি হয়। বস্ত্র শিল্পের পাশাপাশি লৌহ শিল্পের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। কয়লা থেকে ইঞ্জিন চালানোর কৌশল আবিষ্কৃত হলে পুরো ব্রিটেনের শিল্প-কলকারখানা চালানোর জন্য এক 'অনন্ত জ্বালানি উৎস' উন্মোচিত হয়।

শিল্পক্ষেত্রে স্টিম ইঞ্জিনের আগমন ঘটলে ফার্নেস চুলা আরও দ্রুত এবং দক্ষভাবে জ্বালানোর একটি কার্যকরী পদ্ধতি পাওয়া যায়। কয়লাপ্রধান অঞ্চলগুলোতে দ্রুত থেকে দ্রুততম সময়ে আকরিক লোহা থেকে লৌহজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। ব্রিটেনের চারিদিকে তখন শুধুই পরিবর্তনের জোয়ার—কারখানায় মেশিনের ঝনঝনানি, ব্রিটেনের আকাশে-বাতাসে কয়লাভিত্তিক ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। নতুন শিল্পাঞ্চলগুলোতে গ্রাম থেকে দল বেঁধে মানুষ কাজের খোঁজে আসতে শুরু করে। পরবর্তী কয়েক বছরে অনেক গ্রামের চেহারা আমূলে বদলে যায়, গ্রামাঞ্চল ক্রমশ শিল্পভিত্তিক শহরে পরিণত হতে শুরু করে। হাজার হাজার মানুষ তাদের আবাসন হিসেবে শহরভিত্তিক ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস শুরু করে। শ্রমিকেরা ব্যস্তসমস্ত যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কয়লাখনি এবং টেক্সটাইল শিল্পে নারী

শ্রমিকরাও পুরুষদের সমান তালে পরিশ্রম করতে শুরু করে।

আধুনিক ইস্পাত শিল্প যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। নতুন নতুন রেল লাইন স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় রেল সংযোগ প্রথমে পুরো ব্রিটেনকে এবং পরবর্তী সময়ে পুরো ইউরোপকে একীভূত করে তোলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে আধুনিক পরিবহণব্যবস্থার বদৌলতে শিল্প-কলকারখানা এবং পণ্যের উৎপাদন আগুনের মতো পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

এই অভাবিত শিল্পবিপ্লবের বিকাশে নিত্যনতুন শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় অতিরিক্ত কাচামাল এবং অতিরিক্ত শ্রমিকের জোগান। আর এই প্রয়োজনবোধ থেকেই শিল্প কোম্পানি এবং শাসকগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে উপনিবেশবাদ। পৃথিবীর পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির প্রাচুর্য—পশ্চিমা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো সেদিকেই পা বাড়ায় শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় এবং সামনে বেড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ দখলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগমন করে এ উদ্দেশ্যেই। এখানে আগমন করে তারা পরিচয় দেয় 'ব্যবসায়ী', কিন্তু ব্যবসার ছদ্মাবরণে ছিল উপনিবেশের মাধ্যমে তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও শ্রমিক জোগাড় করা। এ উদ্দেশ্যেই কোম্পানি এই দেশকে দুর্বল করার যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের তারা এমন শক্তিশালী ও স্বাধীন করে তোলে যে, স্থানীয় শাসকশ্রেণি তাদের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে স্থানীয় শাসকদের ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে, তারপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং ক্ষমতা থেকে উৎখাতের চেষ্টাও শুরু করে। তারপর স্থানীয় কৃষকদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয় এবং তাদের দিয়ে ইচ্ছেমতো চাষ করানো শুরু করে। একইভাবে এ অঞ্চলের মানুষের জ্ঞান-বিদ্যা, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিজেদের মতো সাজিয়ে নিতে থাকে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ধর্মপরিচয়কে নতুন রূপে উপস্থাপনের আয়োজন করে। ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজদের এই স্বার্থান্বেষী মনোভাব ও নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলন ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের জন্য জীবনবাজি রেখে লড়াই শুরু করে।

যেহেতু ইংরেজ শাসনের সূচনা হয় বাংলা অঞ্চল থেকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম পদক্ষেপও গ্রহণ করে বাঙালি জাতি। স্বাধীনতার আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-নারী সর্বস্তরের মানুষ। তবে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই ১৯০ বছরে ভারতবর্ষের স্থায়ী ক্ষতির সবরকম বন্দেবস্ত সম্পন্ন করে ফেলে তারা। ইংল্যান্ডের শিক্ষকদের

দিয়ে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করে পুরো ভারতবর্ষে মাছ ধরার জালের মতো ছড়িয়ে দেয় শিল্পবিপ্লবের শিকার। এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের মন-মগজ গড়ে উঠতে থাকে ব্রিটিশদের মতোই। মানচিত্র ভাগ করে কয়েক টুকরো করা হয়। অর্থনীতির ঘুড়ি উড়িয়ে নাটাই নিয়ে যাওয়া হয় তাদের দেশে। আর ব্রিটিশদের উপনিবেশায়ন শুধু ভারতবর্ষেই সীমিত থাকেনি, আরব-আফ্রিকাসহ বলতে গেলে পুরো বিশ্বই ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে তাদের প্রভাব বলয়ে। মানুষের জীবন-যাত্রা এখন আবর্তিত হয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শিল্পনগরী কেন্দ্র করে।

একটি পরিবারের কেউ গ্রামে, কেউ মফসসলে, কেউ শহরে, কেউ ভিনদেশে—এভাবে বিক্ষিপ্ত অচেনা কিছু মানুষ মিলে গড়ে উঠছে নিউক্লিয়াস শহুরে জীবন ও কালচার। আলো-ঝলমলে শিল্পনগরীতে এখন মানুষ রাত জেগে শপিং করে এবং দিনের আলোয় ঘুমিয়ে থাকে। পুরো পৃথিবীর মানুষ এখন একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর বাসিন্দা। প্রথম শিল্পবিপ্লব, দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব, তৃতীয় শিল্পবিপ্লব শেষ করে এখন মানুষ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। এই বিপ্লবকালের প্রাণভোমরা 'জেনারেশন-Z' বা 'জেন-জি'। এই প্রজন্মের হাত ধরেই বাংলাদেশে ঘটেছে বর্তমান বিশ্বের দৃষ্টান্তমূলক আরেক বিপ্লব।

আমেরিকান বিপ্লব (১৭৬৫-১৭৮৩ খ্রি.)

মাসউদ আহমাদ

❝ আমেরিকান বিপ্লব কেবল একটি যুদ্ধ ছিল না; এটি ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা—যা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। ❞

— জন এফ. কেনেডি, বক্তৃতা : ৪ জুলাই ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ

❝ এই বিপ্লব প্রমাণ করেছিল, জনগণের ইচ্ছাশক্তি ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা একটি সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার এবং একটি নতুন রাজনৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা রাখে। ❞

— হাওয়ার্ড জিন, (*A People's History of the United States*)

আমেরিকান বিপ্লবের চূড়ান্ত সময়টি হলো : এপ্রিল ১৯, ১৭৭৫ থেকে সেপ্টেম্বর ৩, ১৭৮৩।[১৬] এই সময়টি যুদ্ধের সময়। তৎকালীন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল আমেরিকানরা। এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তী সময়ের পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

প্রেক্ষাপট : আমেরিকান বিপ্লবের প্রধান প্রেক্ষাপট ছিল তিনটি। কর, বাণিজ্য ও সরকারব্যবস্থাপনা। এই তিন বিষয়ে ব্রিটিশ নীতিগুলো আমেরিকান উপনিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। এই উত্তপ্ত আমেরিকান উপনিবেশকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় স্ট্যাম্প আইন (১৭৬৫), কোয়ার্টারিং আইন (১৭৬৫), বোস্টন ম্যাসাকার (১৭৭০), বোস্টন টি পার্টির (১৭৭৩) মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বিপ্লবের অনুষঙ্গ

একই জাতি বিশাল আটলান্টিকের এপার-ওপার দুই অঞ্চলে বিভক্ত হলো। তাদের উভয়ের স্বার্থ বদলে গেল। জীবনের লক্ষ্য বদলে গেল। একদল নিজেদের গড়েপিটে উন্নততর করে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে লাগল, অন্য দল—ব্রিটিশরা চাইল সাম্রাজ্যের শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য উপনিবেশিত অঞ্চলের ঐশ্বর্য আহরণ করতে।

---

[১৬] আমেরিকান রেভোলুশনারি ওয়ার, হিস্ট্রি ম্যাপস

১. করব্যবস্থা

ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক ব্যয় হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের। এই যুদ্ধ আমেরিকায় হয়েছে, ইউরোপেও হয়েছে। আমেরিকায় করারোপ হলো সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যের পেছনে যে বিশাল খরচা হয়েছে সেজন্য। কিন্তু আমেরিকানরা বিবেচনা করল যে, এই যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ব্রিটিশ-ইংরেজরাই অধিক লাভবান হয়েছে। যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে আমেরিকানরাও অংশ নিয়েছে। এই আমেরিকার সৈন্যদের পেছনে খরচা করেছে আমেরিকানরাই। যে সৈন্য ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের ব্যয়খরচাও আমেরিকানরাই বহন করেছে। এজন্য এই করারোপের কোনো মানে হয় না।[১৭]

২. পরোক্ষ কর ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়

ব্রিটিশরা আমেরিকান ব্যবসায়ীদের ওপরে এই নীতি আরোপ করে যে, তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো বাধ্যতামূলকভাবে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করতে হবে। ইংল্যান্ডে যে পণ্যগুলো উৎপাদিত হয়, একই পণ্য আমেরিকানদের জন্য নিজ অঞ্চলে উৎপাদনের অনুমতি নেই। এজন্য সেই পণ্যগুলো আমেরিকানদের প্রয়োজন হলে তা বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ড থেকেই আমদানি করে নিতে হবে। আবার আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো থাকবে ইংল্যান্ডের। আমেরিকানদের জন্য নিজেদের জাহাজে করে আমদানি-রপ্তানি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।[১৮]

তবে মার্কিন ব্যবসায়ীরা অত নিয়ম মানার জন্য লোক ছিল না। ওরকম কোনো সাধুচিন্তা তাদের ছিল না। তারা বরাবরই যেখানে বেশি লাভ সেখানে রপ্তানিবাণিজ্য পরিচালনা করত। ব্রিটিশ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যেত। সেজন্য 'উৎকোচ-গ্রহণশীল ব্রিটিশ কাস্টমস অফিসাররাও' উপকার করত অনেক।[১৯]

ইংল্যান্ডে যে পণ্যগুলো রপ্তানি করা হতো, সেগুলোতে মূল্য কম পেত আমেরিকানরা। অথচ ইংল্যান্ড বাদে অন্য কোনো দেশে সে পণ্যগুলো রপ্তানি করা গেলে বেশি মূল্য পেতে পারত তারা। এর ওপর আছে শুল্কারোপ। ইংল্যান্ডকে চড়া শুল্কও দিতে হতো ব্যবসায়ীরা সেখানে পণ্য রপ্তানি করতে গেলে। আবার যেসব পণ্য আমেরিকানরা নিজেরাই উৎপাদন করে ভোগ করতে পারত, সে পণ্যগুলোও অর্থখরচা করে ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করতে হতো। এ ছিল আমেরিকানদের জন্য অনেক কষ্টদায়ক। অনেক পণ্য হয়তো তারা নিজেরা উৎপাদন করতে পারত না, সুযোগমতো যেকোনো দেশ থেকে সুলভমূল্যে আমদানি করে নিতে পারত, কিন্তু সেই সুযোগটিও

---

[১৭] আমেরিকা, পৃ. ৬১-৬২

[১৮] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ১৫; আমেরিকা, পৃ. ৬৩। শুধু উৎপাদিত পণ্যই না, আমেরিকার অনেক অপরাধের বিচারের জন্য অপরাধীদেরও ইংল্যান্ডে পাঠানোর আইন হয়। স্পষ্টত এটা আমেরিকানদের জন্য বিশেষ অপমানজনক।

[১৯] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ১৫

রাখেনি ইংল্যান্ড। আমদানি করতে হতো ইংল্যান্ড থেকেই, আর তাও চড়া মূল্যে।

এই সিস্টেমটাকে ইংল্যান্ড এক পরোক্ষ কর হিসাবে বহাল করেছিল। এর মাধ্যমে ইংল্যান্ড বিপুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হতে পারত। তাদের কাছে বিক্রয় করতে যাওয়া যেত কম, তবে তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে নিতে হতো অনেক অনেক বেশি। ব্রিটেনের সাথে আমেরিকানদের রপ্তানি-আয়ের তুলনায় আমদানি-ব্যয় ছিল—

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ৫০,৬৮০ পাউন্ড বেশি

১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ৭৩,৪৫৭ পাউন্ড বেশি

১৭০০ থেকে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তা ২ কোটি পাউন্ডেরও বেশি।

১৭৬১ সালের আগ পর্যন্ত আমেরিকার তামাক ব্যবসায়ীরা আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি করতে পারলেও এই সময় থেকে তারাও বছরে ২৩০০ পাউন্ড ঘাটতিবাণিজ্যের শিকার হতে থাকে।[২০]

৩. আমেরিকার বুকে ব্রিটিশ সৈন্য

আমেরিকায় ব্রিটিশ সৈন্যদের উপস্থিতি আমেরিকানদের পীড়া দিয়ে যাচ্ছিল। আগে এই উপস্থিতির অন্যতম কারণ ছিল ফরাসি ও রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় বছরব্যাপী এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু এই অপরিহার্যতার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। তারপরও স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এই সৈন্যদের হেডকোয়ার্টার বসানো হয় নিউইয়র্কে। আর এ সঙ্গিনধারী সৈন্যদের ভরণপোষণের ভার পড়ে অসামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর।[২১] এই কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে। রাগে সৈন্যরা নিউ ইয়র্কের স্বাধীনতাস্তম্ভ ভেঙে ফেলে। নাগরিকরা এটা মেনে নিতে পারে না। বাধে সংঘর্ষ। কিন্তু শেষ অবধি অসামরিক কর্তৃপক্ষ হার স্বীকার করে নেয়।

মতের অনৈক্য চলতে থাকে। জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত হয় না। ফ্রাংকলিন ঘোষণা করেন যে, এভাবে আমেরিকায় সৈন্য মোতায়েন রাখা সংবিধানসম্মত নয়। স্থানীয়

[২০] এতে তারা বড়রকম ঋণের মুখে পড়ে যায়। তবে বলা হয় যে, এই ঋণ থেকে বেঁচে যাওয়ার চিন্তা তাদের জন্য এই বিপ্লবে অংশ নেওয়ার অনুঘটক হিসাবে কাজ করেনি। বিপ্লবের হাঙ্গামায় পাওনাদার থেকে বাঁচতে চায়নি তারা। দ্র. আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ১৬

[২১] সৈন্যদের বাসস্থানসংক্রান্ত আইন বা কোয়ার্টারিং অ্যাক্টের তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম আইনটি পাশ হয় ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে। আরেকবার ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ও শেষবার ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আইনটি নতুনভাবে পাশ হয়। প্রথম আইনে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সৈন্যদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী যেসব পান্থশালা, পানশালা, ঘরসমূহ জনহীন ছিল তা সৈন্যদের আবাস হিসাবে ধার্য করা হয়। তৃতীয় আইনে এমনকি যেসব ঘরে সাধারণ মানুষ বসবাস করে সেগুলোতেও সৈন্যদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। স্পষ্টতই এইসব আইনের ফাঁকফোকর ছিল অনেক। আর সাধারণ জনগণের নিগৃহীত হওয়ার সুযোগও ছিল তেমনই। দ্র. আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৩০, ৫৫; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৮০

কর্তৃপক্ষের মাথা নোয়ানো মেনে নিতে পারে না 'সনস অব লিবার্টির' জনসাধারণ।[২২]

আবার দাঙ্গা বাধে। সৈন্যরা জনসাধারণের ওপরে গুলি ছোড়ে। লাঠি, রামদা দিয়ে জনতা জবাব দিতে চায়। কিন্তু শহিদ হয় আমেরিকা বিপ্লবের প্রথম নিগ্রো ক্রিসপাস আতুকস ও অন্যান্য।[২৩]

নিহতদের শবযাত্রায় অংশ নেয় বোস্টনের উন্মত্ত জনসাধারণ। শহরে বাইরে সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য-কাজকারবার বন্ধ করে দেয়। গির্জায় গির্জায় শোকের ঘণ্টা বাজতে থাকে। এই শবযাত্রার দৃশ্য দেখে কমবেশি বিশ হাজার জনসাধারণ। সংগীতজ্ঞ উইলিয়াম বিলিংস গান রচনা করেন।[২৪]

৪. স্ট্যাম্প আইনে বিদ্রোহের চাপ

আমেরিকার সমস্তপ্রকার দলিলপত্র নির্ধারিত স্ট্যাম্পে লেখার বিধান জারি করা হয়। এই স্ট্যাম্প-কাগজগুলো ছিল ইংল্যান্ডের। এগুলোর আমদানিতে কাগজমূল্য তো ছিলই, 'স্ট্যাম্প' হিসাবেও এগুলোর একটা মূল্য ছিল। এগুলো বিক্রির টাকায় ইংল্যান্ড লাভবান হতো।[২৫]

ব্রিটিশ স্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছিল। কানেকটিকাট ও নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে সমস্ত বড় শহরে সনস অব লিবার্টির লোকেরা স্ট্যাম্প এজেন্টদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। কারেন্সি কম্পট্রোলারের[২৬] বাড়ি লুঠ করা হয়, প্রধান বিচারপতি টমাস হাচিনসনের বাড়ি ও গ্রন্থাগার লন্ডভন্ড করা হয়। বোস্টনের ভাইস-অ্যাডমিরালটি কোর্টের[২৭] নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীরা কঠোরভাবে পণ্যবর্জন শুরু করে।

ব্রিটিশ উপনিবেশের ব্যবসায়িক বিদ্রোহের চাপ পড়ে খোদ ইংল্যান্ডে। সে সময় ব্রিটিশ

---

[২২] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৩১

[২৩] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৩৩। তবে অ্যালান নেভিনস ও হেনরি স্টিল কমাগার তাদের ইতিহাসগ্রন্থে ব্রিটিশদের নিয়ে অভিযোগগুলো পরোক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের ভাষায়, 'কিন্তু অনেকের কাছে "বোস্টন হত্যাকাণ্ড" ব্রিটিশ অত্যাচারের চরম নিদর্শন।' ব্রিটিশ সৈন্যদের মেজাজ বিগড়ে দেওয়ার জন্য আমেরিকান জনগণের উচ্ছৃঙ্খল ও অপমানজনক আচরণকেও দায়ী করেছেন তারা। হাজার হোক তারা একই জাতির লোক। বিস্তারিত দেখে নিন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৮৪-৮৫

[২৪] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৩৩। William Billings (১৭৪৬-১৮০০)। আমেরিকার প্রথম যুগের অন্যতম সেরা সুরকার। জন্ম বোস্টনে অক্টোবর ৭, ১৭৪৬-এ। মৃত্যুও বোস্টনে সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮০০-তে। ব্রিটানিকা

[২৫] স্ট্যাম্প আইনটি চালু হয় ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে। দ্র. আমেরিকা, পৃ. ৬৩; আমেরিকান রেভোলুশনারি ওয়ার, হিস্ট্রি ম্যাপস

[২৬] Office of the Comptroller of the Currency (OCC)-এর নির্বাহী। সরকারি এ সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যাংক ও ফেডারেল সেভিংস অ্যাসোসিয়েশনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটার প্রধান কাজ হলো জাতীয় ব্যাংকিং সিস্টেমের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখা। ব্রিটানিকা

[২৭] সামরিক আদালত। দ্র. আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৩৭

লর্ড সভায় লর্ড ডার্টমাউথ ঘোষণা করেন যে, 'এখন এই রাজ্যে কাজের অভাবে বেকার হয়ে যাওয়ার দরুন অন্যূন ৫০ হাজার লোক বিদ্রোহ করার পর্যায়ে এসে গেছে এবং তার একমাত্র কারণ হচ্ছে উপনিবেশগুলোতে অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব।'[২৮]

লর্ড ডার্টমাউথের বক্তব্যের পর এবং আরও নানামুখী চাপের প্রভাবে পার্লামেন্টে স্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহারের বিল পাশ হয়ে যায়।[২৯] এতে আমেরিকার জনগণ উল্লসিত হয়। ব্যবসায়ীগণ ব্রিটেনের পণ্যের প্রতি আগ্রহ দেখায়।[৩০]

৫. শুল্কের চাপ

স্ট্যাম্প আইন রদ হলো। কিন্তু রাজা এবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসালেন। এই দ্রব্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল চা। মানুষ পুনরায় অতিষ্ঠ হলো। এবার জর্জ ওয়াশিংটন শুল্কযুক্ত পণ্য বর্জনে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করলেন, যাতে বড় বড় প্রসিদ্ধ মানুষদের স্বাক্ষর ছিল। এর প্রভাব পড়ল সরাসরি। ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরাই বিরক্ত হয়ে পড়ল। তারা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপরে চাপ সৃষ্টি করল এই শুল্ক রদ করার ব্যাপারে। পার্লামেন্ট বাধ্য হয়ে তা করল বটে, কিন্তু চায়ের ওপরে শুল্কটা জারি রাখল। পার্লামেন্ট তার মান বাঁচানোর চেষ্টা করল।

উল্লেখ্য, আমেরিকা অঞ্চলটি আমাদের দেশের মতো নাতিশীতোষ্ণ নয় অবশ্যই। সেটি শীতপ্রধান। কাজেই তাতে চায়ের যে চাহিদা তা আমাদের ভাতের চাহিদার চেয়ে কিছুটা কম নয়। আমেরিকায় চায়ের ব্যবসা তখনও ব্যাপক ছিল। কেবল এটার শুল্কও ব্রিটিশ অর্থনীতির পালে হাওয়া দিতে পারত।

এই অবস্থায় আমেরিকাবাসী চা-পান ত্যাগ করল। ইংল্যান্ড থেকে আসা চা-বোঝাই জাহাজ ফেরত যেতে লাগল। এরমধ্যেই এক রাতে বোস্টন বন্দরে চা-বোঝাই জাহাজ থেকে সমস্ত চায়ের পেটি সাগরে ফেলে দিলো একদল মানুষ।[৩১] মোট ৩৪২টি পেটি এভাবে ফেলে নষ্ট করা হলো।[৩২] অথচ জাহাজের আর কোনোকিছুই তারা নষ্ট করেনি।[৩৩] তারপর এই লোকদেরকে ধরার জন্য, বিচার করার জন্য অনেক চেষ্টা-

---

[২৮] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ২৬-২৮

[২৯] এজন্য বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনেরও অবদান রয়েছে। তাকে এই সময় আমেরিকাবাসীরা ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিল, আর তিনি এখানে আন্দোলন চালিয়েছেন। দ্র. আমেরিকা, পৃ. ৬৪-৬৫

[৩০] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ২৮

[৩১] তারা সবাই মোহক উপজাতীয় রেড ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে ছিল। ডার্টমাউথ নামক জাহাজটি থেকে তারা রাতভরে একটি একটি করে পেটি হাতে হাতে পানিতে ফেলে। দ্র. আমেরিকা, পৃ. ৬৬

[৩২] অন্য মতে ৩৪৩টি। আর তাতে পেটিগুলো খুলে খুলে সমুদ্রে চা ফেলার কথা রয়েছে। দ্র. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৮৫। আবার হিস্ট্রি ম্যাপসেরও একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে চায়ের একেকটি বাক্স খুলে তা থেকে চা ঢালা হচ্ছে সাগরের পানিতে।

[৩৩] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৫০। ঘটনাটি ১৭৭৩-এর ১৬ ডিসেম্বরের।

তদবির করে ব্যর্থ হয় রাজপ্রশাসন। স্থানীয় জনগণের কেউ এ ব্যাপারে মুখ খোলে না। বোস্টনের জনগণকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। বোস্টন বন্দরের সঙ্গে অন্যান্য শহর-বন্দরের বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। জেনারেল গেজ রাজা তৃতীয় জর্জকে পরামর্শ দেন, চার রেজিমেন্ট সৈন্য দিয়েই ম্যাসাচুসেটসকে বশে আনা সম্ভব।[৩৪] রাজা জর্জের কঠোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংল্যান্ড থেকে সৈন্যবাহী জাহাজ এসে বোস্টন বন্দরকে রুদ্ধ করে ফেলে।

৬. যুদ্ধ-বিবাদ

ক্রমে বাড়ল ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা। বোস্টনবাসীর ওপর শাস্তিস্বরূপ গোলাবর্ষণ হলো। ১৭৭৫-এর ১৯ এপ্রিল আমেরিকান ও ব্রিটিশ উভয় পক্ষেরই সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলো। সর্বসম্মতিক্রমে আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রধান হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। তার জন্য বরাদ্দ বেতন তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। শুরু করলেন বোস্টন রক্ষার সাহসিক লড়াই।[৩৫]

বিপ্লবে অংশগ্রহণ, বিপ্লবের ফলাফল

ঘটনাপরম্পরা বিপ্লবের দিকে নিয়ে গিয়েছিল এই জাতিকে। এই বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছেন তারা আমজনতা, বেকার ও শ্রেণিভিত্তিক লোকই ছিলেন না। এই বিপ্লবে অংশ নিয়েছেন সর্বোচ্চ মহল থেকে নিয়ে নিম্নতর মহল পর্যন্ত সবাই : ১. অভিজাত জমিদারশ্রেণি, ২. আটলান্টিক ও ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে বিদেশের সাথে বাণিজ্যরত ব্যবসায়ীশ্রেণি, ৩. স্থানীয় পণ্যবিক্রেতার দল, ৪. বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মীর দল, ৫. কারিগর ও শ্রমিক শ্রেণি সবাই মিলে এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। নিতান্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা এই বিপ্লবের কারণ ছিল না। বেকারত্বের ফলে, অভাবের ফলে এই বিপ্লব সংঘটন করা হয়নি। এটা কোনো 'শ্রেণিসংগ্রাম'[৩৬] নয়, কোনো আদর্শগত বিপ্লবও নয়। চীন বা রাশিয়ার বিপ্লবের সাথে এর তুলনা হয় না।

যে রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব ঘটেছে, বিপ্লবে অংশ নেওয়া অনেক লোক তাদের সমর্থকও ছিল। আর এজন্য বিপ্লবের ফলে এ রাজতন্ত্রের কোনো গভর্নরের মৃত্যু ঘটেনি। মানুষ কারও ওপর শুধু এ সাম্রাজ্যের বড় উপকারভোগী হওয়ার কারণে চড়াও হয়ে পড়েনি। এজন্য এর সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবেরও কোনো তুলনা হয় না। এ বিপ্লবের মাধ্যমে কোনো একনায়কতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকারও প্রতিষ্ঠা পায়নি।

---

[৩৪] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৫১। উল্লেখ্য, বোস্টন হলো ম্যাসাচুসেটসের রাজধানী।

[৩৫] আমেরিকা, পৃ. ৬৬-৬৯

[৩৬] class-struggle. মার্কসীয় তত্ত্বমতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধিকার বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিরোধ বা লড়াই। আধুনিক বাংলা অভিধান, ভুক্তি : শ্রেণিসংগ্রাম, বাংলা একাডেমি ২০১৬

সবার ঐক্যবদ্ধ এই আন্দোলনটি মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর প্রধান কাজ ও শুরুর কাজটা করেছেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মানুষগণ। তারা বই লিখে, পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে এই আন্দোলনের গতি সৃষ্টি করেছেন। তারা মানুষকে আলোড়িত করেছেন, নিজেকের প্রাপ্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। যারা ব্রিটিশদের অন্যায়ের শিকার ছিল কিন্তু সেটা তাদের উপলব্ধিতে ছিল না যে, এই অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া সম্ভব, তাই এর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন, এতে তারাও জেগে উঠেছেন। ব্যবসায়ী মহল ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনে অংশ নিয়েছেন। আন্দোলনে এর পরের ধাপেই রয়েছেন আপামর জনসাধারণ। এই তিন পর্যায়ের মানুষদের ত্রিবিধ ভূমিকা এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। জ্ঞানীদের সাংবিধানিক বুদ্ধিবৃত্তিক তর্কবিতর্ক, ব্যবসায়ীদের জোরদার আর্থনীতিক চাপ ও আমজনতার প্রবল বলপ্রয়োগে এ আন্দোলন সামনে এগিয়েছে।

সাংবিধানিক আলোচনা ছিল এই আন্দোলনের সূচনাপর্ব। ব্রিটিশ সংবিধানের আলোকেই ব্রিটিশবিরোধী এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সর্বসম্মত ব্রিটিশ মতের বিপরীতে তাদেরই ক্রটিবিচ্যুতি তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপরে সব সংবিধান ছুড়ে দিয়ে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক নীতির ওপর বুদ্ধিবাদী জাগরণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ক্রমে প্রবল ঘূর্ণির রূপে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। বিপ্লবগুলো এভাবেই হয়ে থাকে, বিপ্লব কখনোই সংবিধান মেনে হতে পারে না।[৩৭]

এই বিপ্লবের ফলাফল ছিল ব্যাপক। এই সফল বিপ্লব ইউরোপের চিন্তাদর্শন পালটে দেয়, ফরাসি বিপ্লবে তা ইন্ধন জোগায়। এর ফলে এমন এক স্বাধীন আমেরিকার জন্মলাভ হয় যে ক্ষমতায়, আধুনিকতায় বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। তার ব্যবসাবাণিজ্যে ও সকল ক্ষেত্রে অভ্যুত্থান ঘটে যায়। আমেরিকার অভ্যুদয় ঘটে এক পরাশক্তি হিসাবে। আমেরিকান দাপট বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিতে শুরু করে।

আবছা ভাবনা : 'উপনিবেশিত আমেরিকা' বনাম 'ব্রিটিশ ভারত'

এই বিষয়টা নিয়ে পড়তে গিয়ে আবছাভাবে একটা প্রশ্ন মাথায় আসে। তা হলো এই, ব্রিটিশরা পৃথিবীর নানা অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ গড়েছিল। এর মধ্যে আমেরিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশ অন্যতম। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশের নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষেত্রে এই উপমহাদেশ কেন আমেরিকার তুলনায় এত বেশি এগিয়ে গেল। ব্রিটিশদের তাড়ানোর পর আমেরিকা পৃথিবীতে এত উঁচু মাথা করে দাঁড়িয়েছিল যে, সকল দেশ তার সামনে ঝুঁকে পড়েছে। কেন এমন হলো। আমেরিকায় যে ব্রিটিশবিরোধী

[৩৭] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ১৯-২০

সংগ্রাম হয়েছিল তার তুলনায় ভারতে হওয়া ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম কতটুকু আলাদা। আমেরিকানদের সংগ্রাম ও ভারতীয়দের সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল।

দুই সংগ্রামের মধ্যে হালকা তুলনা :

এক.

আমেরিকানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিল। যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশদের তাড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

অন্যদিকে ভারতীয়রা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অনেক অনেক যুদ্ধ করলেও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। এককথায় যুদ্ধ করে ব্রিটিশদের তাড়াতে সক্ষম হয়নি। ভারতজুড়ে নানামুখী আন্দোলন হতে থেকেছে, ইংল্যান্ডের ওপরে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। পরে তারা সম্মানের সঙ্গে ভারত থেকে বিদায় নিয়েছে ভারতকে অন্যায্যভাবে বিভাজিত করে। আমেরিকার ক্ষেত্রে তেমনটা সম্ভব হয়নি।

ব্রিটিশবিরোধী আমেরিকান যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা নানামুখী সমর্থন পেয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, হল্যান্ড সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে এই যুদ্ধে অংশ না নিলেও রাশিয়া, প্রুশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন তাদের নিজস্ব বলয় থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব তুলে ফেলার জন্য লড়াই চালিয়েছে। বিশেষ করে মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে ব্রিটিশ প্রভাব ছিল তা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে তারা।

আমাদের ভারতীয় আন্দোলনও আমেরিকাকে শক্তি জুগিয়েছি। আমেরিকা বনাম ব্রিটিশ যুদ্ধের সময় আমাদের অঞ্চলে খুবই শক্তিশালী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। মহীশূরের বাঘ বলে খ্যাত হায়দার আলী ও তার পুত্র টিপু সুলতান এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এসব কারণে ইংল্যান্ড তার মনোযোগ পুরোপুরিভাবে আমেরিকার ওপর ধরে রাখতে পারেনি, এজন্যই ভারতফেরত প্রখ্যাত লর্ড কর্নওয়ালিসকে ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। পৃথিবীর কোনো শক্তিশালী দেশ ইংল্যান্ডের মিত্র হতেও আসেনি, অথচ আমেরিকার সরাসরি মিত্র দেশও ছিল, পরোক্ষভাবেও বিভিন্ন দেশ তাদের মৈত্রীর কাজ করেছিল।

দুই.

আমেরিকান আন্দোলন কোনো বিভক্ত স্বার্থে পরিচালিত হয়নি, যেটা ভারতে হয়েছে। এতে তার শক্তিমত্তা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ভারতজুড়ে ইংরেজরা হিন্দু আর মুসলমানদের মুখোমুখি করে দিয়েছে। যে হিন্দুধর্মীরা হাজারো বছর মুসলমানদের ন্যায়শাসনে জীবন পার করেছে, ইংরেজরা এসে যেন চোখের পলকে মুসলমানদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতাবোধের ধারণাকে ক্রোধে পরিণত

করেছে। তারা মুসলমানদেরকে দূর দূর করতে শুরু করে দিয়েছে এবং মুসলমানদের সকলপ্রকার আন্দোলনে তারা না-শরিক থেকেছে। তাদের পত্রপত্রিকা ও তাদের সাহিত্যিকের কলম ব্রিটিশতোষণ চালিয়ে গেছে। মুসলমানরা ইংরেজের শিক্ষা বর্জন করেছে, আর তারা ভারতের হাজারো বছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাসংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজের শিক্ষা আপন করে নিয়েছে।

ওদিকে উপনিবেশিত আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমে ব্রিটিশমুখিতা পরিহার করেছিল, আমেরিকান পত্রপত্রিকা ও কবিসাহিত্যিকের কলম একযোগে ইংরেজবিরোধী চেতনা প্রচার করে গিয়েছিল। এভাবেই আমেরিকায় ইংল্যান্ডের পতন ঘনিয়েছিল।[৩৮]

তিন.

উভয়টি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, অথচ বিপ্লব বলতে যা বোঝায় তার সবকিছু ভারতে ঘটলেও তা আমেরিকার মতো ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম করতে পারেনি। অথচ ভারতের বিপ্লবাদির তুলনায় আমেরিকার বিপ্লব ছিল ঠুনকো। এর কারণ কী। আমেরিকানরা কীভাবে ব্রিটেনকে এত প্রভাবিত করতে পেরেছে। এর কারণ কি এটাও যে, যে আমেরিকানরা ব্রিটিশ-ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, বিপ্লব ঘটিয়েছে, তারা নিজেরা তো ইংরেজই ছিল এবং ইংরেজ ইংরেজের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতা লাভ করেছে।[৩৯]

তথ্যসূত্র :

১. আমেরিকার বিপ্লব, রিচার্ড ডি. মরিস, অনুবাদ, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, কমলা বুক ডিপো, কলকাতা ১৯৫৬

২. আমেরিকা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ, শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ১৯৪১

৩. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অ্যালান নেভিনস ও হেনরি স্টিল কমাগার, অনুবাদ, আশু চট্টোপাধ্যায়, প্রথম বাংলা সংস্করণ, পার্ল পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১, ১৯৬০

৪. হিস্ট্রি ম্যাপস : history-maps.com/story/American-Revolutionary-War

৫. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, বাংলা একাডেমি অভিধান ও অন্যান্য

---

[৩৮] আমেরিকার বিপ্লব, পৃ. ৮৭

[৩৯] আমেরিকা, পৃ. ৬১

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯)

রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ এবং গণতন্ত্রের সূচনা

মাহদি হাসান

❝ ফরাসি বিপ্লব কেবল একটি দেশকে বদলে দেয়নি, এটি মানুষের স্বাধীনতার ধারণাকে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ❞

— টমাস কার্লাইল, (*The French Revolution: A History*)

❝ ফরাসি বিপ্লব ছিল মানব-ইতিহাসের এমন এক মুহূর্ত—যেখানে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন বিশ্বজুড়ে এক নতুন আলো জ্বালিয়েছিল। ❞

— এরিক হবসবাউম, (*The Age of Revolution : 1789–1848*)

ফরাসি বিপ্লব (Révolution Française) বলা হয় ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত টানা ১০ বছর ধরে ফ্রান্সে চলা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবকে। বর্তমান সময়ে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন আমরা দেখতে পাই, তা ছিল এই বিপ্লবের প্রধান ফসল। এই বিপ্লবের ওপর ভিত্তি করেই ১৭৯২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘোষণা দেওয়া হয়। ফরাসি বিপ্লবকে ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কারণ এই বিপ্লবের উত্তাপেই ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা ঘটে। একইসাথে দেশটির রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিজেদের সকল গোঁড়ামি ত্যাগ করে নিজেকে পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। পশ্চিমা গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বিপ্লবকে একটি জটিল সন্ধিক্ষণ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র থেকে নাগরিকত্বের যুগে পদার্পণ করে। ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লবকে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন।

সেসময়ে তিন শ্রেণির লোকের মাধ্যমে ফ্রান্সের সমাজকাঠামো গঠিত ছিল। এরা ছিল অভিজাত শ্রেণি, ধর্মযাজক, সাধারণ প্রজা ও শ্রমিকগোষ্ঠী। অভিজাত শ্রেণি ও

ধর্মযাজকদের হাতেই ছিল ক্ষমতার সকল বাগডোর। এদিকে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় শ্রেণি তথা সাধারণ প্রজা ও শ্রমিকরা ছিল সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং নানারকম অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, সমাজে দুটি শ্রেণি থাকে। একটি শ্রেণি সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, অপর শ্রেণিটি শোষিত হয়। শোষিত শ্রেণিটি শেষ পর্যন্ত অধিকারভোগী শ্রেণির প্রথাগত রাজনৈতিক ও আর্থিক সকল অধিকার বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস করে।

শ্রেণিসংগ্রামই বিপ্লবের বাহন। যেমনটি দেখা যায় ফরাসি বিপ্লবে, যেখানে অধিকারভোগী অভিজাত শ্রেণিকে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতাচ্যুত করে। এই বিপ্লব কোনো আকস্মিক কারণে ঘটেনি। দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যবস্থাপনা চলে আসছিল, তার সঙ্গে ফ্রান্সের বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থ যুক্ত ছিল না। শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থা গঠনে তৎপর হয় সাধারণ জনগণ।

এবার এই বিপ্লব কেন হয়েছিল? এর প্রধানতম কারণগুলো অনুসন্ধান করা যাক—

১. প্রকট শ্রেণিবৈষম্য : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত ছিল। যাজকরা ছিলেন তার মধ্যে প্রথম শ্রেণি। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে যাজকদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩০ হাজার। যাজক শ্রেণিতেও ছিল ভেদাভেদ। ফ্রান্সের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল তৃতীয় শ্রেণি তথা Third state-এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন যুগে যেমন হিন্দু তথা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথা ছিল, তেমনই সেই সময় ফ্রান্সে নানা ধরনের প্রথা উদ্ভূত হয়েছিল। কৃষকদের ওপর সামন্ত প্রথার ফলে নির্যাতন ছিল অবর্ণনীয়। যাজকদের মধ্যেও ছিল না মিল। উচ্চ যাজক ও নিম্ন যাজক এই দুই ভাগে সুবিন্যস্ত ছিলেন। এ ছাড়া যাজকদের দিতে হতো টাইদ বা ধর্ম কর বা গির্জা কর, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল অমানবিক। ফরাসি মন্ত্রী নেকারের মতে, ফ্রান্সের গির্জার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি লিভর। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে গির্জার জমির ফসল চড়া মূল্যে বিক্রয় করে অনেক লাভ হতো। গির্জার এই বিপুল অর্থ উচ্চ যাজক বা বিশপ শ্রেণিই ভোগ করত।

সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল অভিজাত শ্রেণি। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার। দেশের জনসংখ্যার এক থেকে দেড়ভাগই ছিল অভিজাতরা (Court Nobility)। এরা ছিলেন বংশ মর্যাদার দাবিদার। স্বয়ং রাজা ছিলেন অভিজাত। সেই দোহাই দিয়ে অভিজাতরাই সবসময় অনৈতিক সুবিধা ভোগ করতেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ছাড়া ফ্রান্সের বাকি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর প্রভৃতি সবাই ছিল তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্গত।

তৃতীয় শ্রেণিকে তাই Unprivileged বা অধিকারহীন শ্রেণি বলা হয়। ফ্রান্সের মোট লোকসংখ্যা ছিল আড়াই কোটি। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণি তথা Third state-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৯৩ শতাংশ।

বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সমাজ অধিকারভোগী ও অধিকারহীন এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। দেশের ভূ-সম্পত্তির ৪০ শতাংশ সুবিধাভোগী দুই শ্রেণির বহাল নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাদেরকে ন্যায়সংগত কর দিতে হতো না। যাজকরা খুব কমই কর দিতেন। ফলে করের বোঝা গিয়ে পড়ে অধিকারহীন শ্রেণি অর্থাৎ কৃষক, কারিগর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর। রাজার কর আদায়ের একমাত্র উৎস ছিল তৃতীয় শ্রেণি। ফলে তৃতীয় শ্রেণি করের জোগান দিতে গিয়ে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া যাজকদের ফসলের এক দশমাংশ জমির ওপর দিতে হতো টাইদ (Tithe) বা ধর্ম কর। সামন্ত প্রভুদের জন্য কর্ভি বা বিনা মজুরিতে কাজ করে দেওয়া, বানালিতে (Banalites) প্রভৃতি বাধ্যতামূলকভাবে কর দিতে হতো। এভাবে তৃতীয় শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে ফরাসি বুরবোঁ রাজবংশ। কর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা যেন প্রকট হয়ে ওঠে। একে তো কর দিতে দিতে নাজেহাল, তার ওপর বাজারের পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি যেন জনজীবনের নাভিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তোলে।

২. অর্থনৈতিক দুরবস্থা : সেসময় ফ্রান্স ছিল ইউরোপের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। ১৭৮৯ সালের দিকে সেখানে ছিল প্রায় ২৬ মিলিয়ন লোকের বসবাস। রাজা ষোড়শ লুইয়ের শাসনামলে (১৭৭৪-১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ) ফ্রান্স ছিল প্রায় দেউলিয়া হওয়ার পর্যায়ে। মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণ হয়ে পড়েছিল চরম অতিষ্ঠ। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স-জার্মানির সঙ্গে সেডানের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ফ্রান্সের জাতীয় অর্থনীতিতে ধস নামার এটাও একটা কারণ হতে পারে। শুধু আমেরিকা তথা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অর্থমন্ত্রী নেকার ঋণ নেন ১০০ কোটি লিভর। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজাকে ঋণের সুদের কারণে ৩১ কোটি ৮০ লাখ লিভর ব্যয় করতে হতো। এর সঙ্গে সরকারের অন্যান্য খরচ যুক্ত হলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩ কোটি লিভর।

৩. রাজন্যবর্গের দুর্বলতা : অর্থনৈতিক এই দুরবস্থার পর এই বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ধরা যায় রাজন্যবর্গের দুর্বলতাকে। ফ্রান্সের সর্বশেষ রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন দুর্বলচিত্তের শাসক। তার সময়ে রাজতন্ত্রে অবক্ষয়ের মাত্রা বেড়ে যায়। তিনি ছিলেন ভোজনবিলাসী ও স্ত্রৈণ। চারিত্রিক দৃঢ়তা তার মধ্যে কোনোভাবেই ছিল না। ছিলেন প্রথম রাণী মাদাম-দ্য-তুসোর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং দ্বিতীয় রাণী মেরি এন্টোয়নেটের প্রভাবাধীন। সেই কারণে তিনি পত্নী, অভিজাত, সভাসদ ও মন্ত্রী কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

ফরাসি বিপ্লবের গতি যেমন ছিল বৈচিত্র্যময়, তেমনই ছিল ব্যাপক। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে

পঞ্চদশ লুইয়ের পর ষোড়শ লুই ফ্রান্সের রাজা হলে তার পিতা ও পিতামহের মতো তিনিও স্বেচ্ছাচারী পথ অবলম্বন করেন। ক্রীড়নক ছিলেন মেরি এন্টোয়নেট ও মাদাম-দ্য-তুসোর। ক্রমাগত বহিঃশত্রুর মোকাবিলা ও নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ অচিরেই শূন্য হয়ে পড়ে। এ সময় জনসাধারণের ওপর করবৃদ্ধি করে ফ্রান্সের অচলাবস্থা মোচন করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ফলে টুর্গোকে আর্থিক সংস্কারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন দক্ষ ও সাহসী অর্থমন্ত্রী। ফ্রান্সে তিনি অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন, গিল্ড উচ্ছেদ ও কৃষকদের ওপর থেকে বিশেষ কর উচ্ছেদের ঘোষণা দিলে অভিজাতবর্গ নাখোশ হন। বিদ্রোহ করতে থাকে অভিজাতরা। তাদের চাপে রাজা টুর্গোকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন। পরে ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাংকার নেকারকে টুর্গোর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তিনি ফ্রান্সের অর্থনীতি ব্যয়-সংকোচন নীতি প্রবর্তন এবং ভূমি সংস্কারের চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিজাতদের চাপের মুখে তিনিও ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে পদত্যাগে বাধ্য হন।

এখন আলোচনা করা যাক ফরাসি বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে।

স্টেটস জেনারেল অধিবেশন : বিপ্লবের সূচনা

সুদীর্ঘ ১৭৫ বছর পর ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ মে ভার্সাইয়ের রাজসভায় স্টেটস জেনারেল নামক জাতীয় সভার আয়োজন হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে এ জাতীয় সভার আহ্বান অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কারণ, এদিন থেকেই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এই রাজসভায় তখন মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২১৪ জন। এর মধ্যে যাজকদের সংখ্যা ছিল ৩০৮ জন, অভিজাতদের সংখ্যা ছিল ২৮৫ জন ও তৃতীয় শ্রেণির সংখ্যা ছিল ৬২১ জন। তৃতীয় শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে ৩৬০ জন ছিলেন আইনজীবী। কিন্তু এসব সদস্যের একটি করে ভোট ছিল না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কোনো লাভ হতো না। কেননা অভিজাত ও যাজক শ্রেণির বিরোধিতার জন্য রাজা তৃতীয় শ্রেণির দাবি-দাওয়া মানতে রাজি হতেন না।

কয়েকদিন অপেক্ষার পরও রাজার কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর না আসায় ১৭ জুন স্টেটস জেনারেলের তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে ফ্রান্সের জাতীয় সভা ঘোষণা করে এবং কর ধার্যের অধিকার নিজেদের হাতে তুলে নেন। এমতাবস্থায় অভিজাত ও যাজক শ্রেণির চাপের মুখে রাজা ষোড়শ লুই তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিদের দমন করতে মনস্থির করেন। তিনি আবারও স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজার এই সিদ্ধান্তের কথা তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিরা জানতেন না। ফলে ২০ জুন তারা এসে দেখেন সভাগৃহ বন্ধ রয়েছে এবং প্রবেশপথে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। তখন তারা বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী টেনিস খেলার মাঠে উপস্থিত হন এবং সেখানে অবস্থান নেন। সেখানেই তারা ঐতিহাসিক শপথ নিয়েছিল, যত দিন

তারা ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে না পারবেন, তত দিন পর্যন্ত তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন।

এমতাবস্থায় রাজা ষোড়শ লুই ২৩ জুন স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করে জাতীয় সভার কর্মকাণ্ডকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন এবং প্রতিনিধি সভার তিনটি শ্রেণিকে পৃথক পৃথক কক্ষে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। রাজার এ ঘোষণার ফলে সদস্যদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রাজার বক্তৃতা শেষ হলে অভিজাত ও যাজক শ্রেণির সদস্যরা পরিষদকক্ষ ত্যাগ করলেও তৃতীয় শ্রেণির সদস্যরা কক্ষ ত্যাগ করেননি। সভাগৃহে রাজার পরিচালক তাদের সভাকক্ষ ছাড়তে বললে জননায়ক মিরাবো (Mirabeau) দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেন, আমরা জনগণের প্রতিনিধি, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে হলে একমাত্র বলপ্রয়োগ ভিন্ন অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়।

বাস্তিল দুর্গ পতন : বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ মোড়

১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুলাই উন্মত্ত জনতা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে ধূলিসাৎ করে দেয়। তারা বন্দিদের মুক্ত করে কারাগারের অধিকর্তাকে হত্যা করে। বাস্তিল দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সমাধি প্রতিষ্ঠা হয়। এই দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের শাসনভার বিপ্লবীরা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তারা নিজেদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে 'প্যারিস কমিউন' নামে অস্থায়ী পৌর পরিষদ গঠন করে। প্যারিস নগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিপ্লবীরা ন্যাশনাল গার্ড নামে এক জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করে। প্যারিসের মতো ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের কমিউন গঠিত হয়। এই দুর্গ পতনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভেঙে ফেলতে থাকে শোষণের যন্ত্রপাতি। এ সময় গুজব রটে, শহর থেকে অভিজাতরা গ্রামগুলোতে ভাড়াটে লুটেরাদের পাঠিয়ে শস্যক্ষেত পুড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে কৃষকরা নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং তাদের সামন্ত প্রভুদের হত্যা করতে থাকে। কৃষকদের এই অপ্রত্যাশিত অভ্যুত্থানে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ আগস্ট জাতীয় সভার অধিবেশন বসে এবং ১১ আগস্ট একাধিক আইন পাশ করে ফ্রান্সে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি তাদের পূর্বতন সব সুবিধা প্রত্যাহার করেন। এর ফলে পূর্বতন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। প্যারিস তখন রাজা লুইয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে জনগণের হাতে চলে আসে। আজও এ দিনটিকে ফ্রান্সের জনগণ বাস্তিল দিবস হিসাবে পালন করে।

রাজতন্ত্রের অন্তিমযাত্রা

এরপর ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের জুনে রাজার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বিপ্লবীরা বিজয়ী হয়। কারণ, ২৭ জুন ৩ শ্রেণির প্রতিনিধিদের একত্রে যোগদান করে মাথাপিছু ভোটদানের অধিকার

মঞ্জুর করেন ষোড়শ লুই। এ সময় থেকেই ফ্রান্সের জন্য নতুন সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়। এজন্য তখন জাতীয় সভা পরিণত হয় সংবিধান সভায়। সংবিধান সভার সদস্যবর্গ বুদ্ধিমান থাকলেও ছিল না তাদের কোনো রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪-১১ আগস্ট সংবিধান সভা কতক বিধিবিধান সংযোজন করে সামন্ত প্রথা বিলুপ্ত করে।

ফরাসি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

নতুন সংবিধান কীভাবে কাজ করবে তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পর বিপ্লবীরা রাজাকে গ্রেফতার করে। এর মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব তুমুল রূপ নেয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ সালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং ফরাসি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে রাজা ষোড়শ লুইকে বিচারের আওতায় নেওয়া হয় এবং ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

জননিরাপত্তা সমিতি এবং সন্ত্রাসের রাজত্বের (লা টেরর) সূচনা

রাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর ১৭৯৩ সালের জুন মাস থেকে ফ্রান্স বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া শুরু করে। এটি ছিল ফরাসি বিপ্লবের সবচেয়ে সহিংস পর্যায়। সংকটকালীন সময়ে জাতীয় সম্মেলনের নেতারা উপস্থিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপ্লব রক্ষার্থে সন্ত্রাসের রাজত্ব (লা টেরর) প্রতিষ্ঠা করে। ঘোষণা করা হয় জরুরি অবস্থা। রদ করা হয় সংবিধান। আইনসভার সদস্যদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি সমিতি গঠন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের হাতে সন্ত্রাসের রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসব কমিটির মধ্যে প্রথমটির নাম জননিরাপত্তা সমিতি এবং দ্বিতীয় কমিটির নাম সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি।

প্রথম সমিতির ৯ জন সদস্য জাতীয় সম্মেলন দ্বারা নির্বাচিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করত। দ্বিতীয় সমিতি দেখত পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলার কাজ। প্রতিবিপ্লবী সন্দেহে বহু লোককে এই দুই সমিতি গিলোটিনে হত্যার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লব দমন করা হয়। সন্ত্রাসের রাজত্বের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুটি সমিতির নিয়ন্ত্রণ ক্রমে রোবসপিয়ের (Robespierre) ও তার সহযোগী সাঁ জ্যুস্ত (Saint Just)-এর হাতে চলে যায়। এই দুই প্রধানের তৃতীয় সহকারী ছিলেন ক্যুথন (Cuthon)। এই ত্রিমূর্তির স্বেচ্ছাচারী শাসনের চাপে বহু লোক সন্ত্রাসে প্রাণ হারায়।

ঐতিহাসিক ডোনাল্ড গ্রিজারের মতে, সন্ত্রাসের বলি হয় ৩৫-৪০ হাজার লোক। এই রাজত্বের শেষ দিককে বলা হয় মহাসন্ত্রাস। ১৭৯৩ সালের আগস্ট থেকে ১৭৯৪ সালের জুলাই পর্যন্ত এই মহাসন্ত্রাস চালু ছিল। এর ফলে একদিকে যেমন প্রতিবিপ্লব দমন করা হয়, অন্যদিকে বহু নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। এই সময় বৈদেশিক যুদ্ধে ফ্রান্স সাফল্য লাভ করে। মহাসন্ত্রাসের ফলে বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের

হাত থেকে বিপ্লব রক্ষা পায়। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে।

জাতীয় সম্মেলনের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার

রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে পুরোনো রাজকাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাসের শাসন ন্যাশনাল কনভেনশনের জ্যাকবিন দলের সদস্যরা মূল্যবান সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। লেফেভারের মতে, এই পর্যায়ে ফরাসি বিপ্লবের মহত্তম অধ্যায় সৃষ্টি হয়। গণহত্যার পাশাপাশি স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠার কাজে কনভেনশন কাজ করে। কোব্বানের মতে, সন্ত্রাসের ফলে গোটা ফ্রান্সে বিপ্লবের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেডারেলিস্টদের দমনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর এক আইন দ্বারা কনভেনশন আদেশ দেয়, পুলিশ বিভাগ ভিন্ন সকল শ্রেণির কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির নির্দেশ মেনে চলবে। অবাধ্য কর্মচারীদের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান রাখা হয়। এই আইন কার্যকরের ফলে আপাতত ন্যাশনাল কনভেনশন সফলতা পায় এবং এই আইন কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতীয় সম্মেলন ফ্রান্সে 'দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব' সম্পূর্ণ হয়।

জাতীয় সম্মেলনের পতন

সন্ত্রাসের রাজত্বের মাত্রাহীন নিষ্ঠুরতা জাতীয় সম্মেলন ও জ্যাকোবিন দলের জনপ্রিয়তা বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাদাম রোল্যান্ড, ড্যান্ডনসহ অন্যান্য বিপ্লবীর গিলোটিনে হত্যার ফলে জাতীয় জীবনে হতাশা সৃষ্টি হয়। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই জাতীয় সম্মেলনের সদস্যরা রোবসপিয়েরে ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়। রোবসপীয়েরকে আত্মপক্ষ সমর্থনে সভাকক্ষে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। প্যারিস ক্যামিউন রোবসপীয়েরের সমর্থক জড় করতে ব্যর্থ হয়। পরবরতী সময়ে রোবসপীয়ের, সাঁ জ্যুস্ত, ক্যুথন ও ১৮ জন শীর্ষস্থানীয় জ্যাকোবিন দলের নেতাদের গিলোটিনে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। এর একদিনের ব্যবধানে আরও ৭০ জন প্যারিস ক্যামিউনের নেতার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়।

রোবসপীয়েরের পতনের ফলে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে। জাতীয় সম্মেলন সন্ত্রাস রদের জন্য বিপ্লবী পরিষদ, জননিরাপত্তা সমিতি ভেঙে দেয়। ফ্রান্সের জনমত সন্ত্রাসের বিপক্ষে গেলে, কনভেনশনের আদেশে সন্ত্রাস সম্পর্কিত সব ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হয়। তখন জাতীয় সম্মেলনে প্রধান্য বিস্তার করতে থাকে মধ্যপন্থি জিরোন্ডিস্ট দল। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় সম্মেলন বৈপ্লবিক চরিত্র হারিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। থার্মিডরীয় প্রতিবিপ্লবের ফলে জ্যাকোবিন দলকে দমনের জন্য পালটা সন্ত্রাস শুরু হয়। যদি জ্যাকোবিন দলের সন্ত্রাসকে 'লাল সন্ত্রাস' বলা হয়, তবে এই প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাস ছিল 'শ্বেত সন্ত্রাস'। এই সন্ত্রাসের ফলে জ্যাকোবিন ও সাঁকুলেৎ শ্রেণি নিহত হয়।

দোকানের কর্মচারী ও বেকার যুবকদের সাহায্যে এক প্রতিবিপ্লবী বাহিনী গঠন করা হয়। যার প্রচলিত নাম ছিল মাস্কাদিন (Masscadin)। মাস্কাদিনদের মধ্যে এক ধর্মান্ধ গোষ্ঠী গ্রামাঞ্চলে জ্যাকোবিনদের হত্যা করে। কিছুকাল পরে শ্বেত সন্ত্রাস থেমে যায়।

ডাইরেক্টরি শাসন (১৭৯৫-১৭৯৯)

রোবসপীয়েরের পতনের পর জাতীয় সম্মেলন ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এক নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংবিধান অনুযায়ী যে নতুন সরকার গঠিত হয়, তা ইতিহাসে ডাইরেক্টরীর শাসন নামে সমধিক পরিচিত। সেসময়ের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল থাকলেও মুখ ফুটে কেউ প্রতিবাদ করলেই সেনাবাহিনী তাকে নীরব করে দিতো। তখন সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন একজন তরুণ জেনারেল, যার নাম ছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ফ্রান্স তখন যুদ্ধে সাফল্যের পর সাফল্য পেতে থাকে। বর্তমান বেলজিয়াম তখন ফ্রান্সের আওতায় আসে, ডাচ প্রজাতন্ত্র আত্মসমর্পণ করে তাদের কাছে এবং প্রুশিয়ান ও স্প্যানিশদের সাথে শান্তি সম্পর্ক স্থাপন করে ফরাসি সেনাবাহিনী।

৯ নভেম্বর ১৭৯৯ : নেপোলিয়ন যুগ শুরু

চার বছর ক্ষমতায় থাকা ডাইরেক্টরি শাসন ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ডাইরেক্টরি প্রশাসন সেনাবাহিনীকে অনেক ক্ষমতা প্রদান করে, যা তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ৯ নভেম্বর ১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ডাইরেক্টরি শাসন বাতিল করে এবং নিজেকে ফ্রান্সের প্রথম কনসাল (রক্ষাকর্তা) হিসেবে নিযুক্ত করে। এর মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সমাপ্তি হয় এবং নেপোলিয়ন যুগের সূচনা হয়। প্রথম কনসাল হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তিনি ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অথচ বুরবোঁ রাজবংশের বিরুদ্ধে ফরাসি বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল। এজন্য অনেকে নেপোলিয়নকে ফরাসি বিপ্লবের মৃত্যুবাণ বলে মনে করেন। এ কথা সত্য যে, তিনি প্রথম কনসাল হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের আদর্শ ও লক্ষ্য ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে ছিল না।

নেপোলিয়ন ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ স্বাধিকারবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক স্বাধিকারবাদ শক্তিশালী সরকার গঠনের পথে অন্তরায়। এই কারণে তিনি নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন প্রথা চালু করেছিলেন। আইনসভাকে সার্বভৌমিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি মূলত জ্যাকোবিন যুগের প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছেড়েছিলেন। এদিক থেকে বিচার করলে তাকে বিপ্লবের বিনাশক বলা যেতে পারে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের মৈত্রী ও সাম্যবাদে তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই আদর্শ

প্রতিফলিত করেছিলেন। তার বিখ্যাত আইনবিধি (Code Nepoleon) সাম্যবাদের জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি বিশ্বাস করতেন—আইনের চোখে সবাই সমান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। চাকরি লাভের ক্ষেত্রে বংশগত পদমর্যাদার চেয়ে ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে তিনি বড় করে দেখেছেন। পিতার সম্পত্তিতে সব সন্তানের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে রক্ষা করা হয়। ইউরোপে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এজন্য অনেকে তাকে বিপ্লবের উত্তরাধিকারী বলেও অভিহিত করে থাকেন।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল

এক. রাজনৈতিক ফল : এই বিপ্লবের রাজনৈতিক ফল ছিল রাজতন্ত্রের পতন এবং গণতান্ত্রিক ধ্যাণধারণার উত্থান, যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বরাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়াও ফরাসি বিপ্লবের ফলে মানবতাবাদী ও উপযোগবাদী সংস্কার প্রবর্তন করা হয়।

দুই. অর্থনৈতিক ফল : ফরাসি বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ঘটে। ফরাসি বিপ্লবকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটি ছিল মূলত বুর্জোয়াদের জন্য বিপ্লব। ফলে উপেক্ষিত থাকে নিম্নস্তরের সাঁকুলেৎ শ্রেণির স্বার্থ। একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে থাকে বুর্জোয়া শ্রেণি। ফরাসি বিপ্লব সাঁকুলেৎ শ্রেণির কোনো উপকারে আসেনি। 'ল অব ম্যাক্সিমাম' ও 'ল অব মিনিমাম' দ্বারা কিছুদিনের জন্য তাদের উন্নতির চেষ্টা করা হলেও থার্মিডিরীয় শাসনামলে এই আইনগুলো রহিত করার ফলে সাঁকুলেৎ শ্রেণির দুরবস্থা বিদ্যমান থেকে যায়। লেফেভারের মতে, সাঁকুলেৎ শ্রেণি জীবিকার অধিকার ও কাজের অধিকার প্রভৃতি যেসব দাবি জানায়, ফরাসি বিপ্লবের সময়কার বুর্জোয়া নেতারা এসব দাবি পূরণ করতে অনিচ্ছুক থাকায় সাঁকুলেৎ শ্রেণির স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

তিন. সামাজিক ফল : মধ্যযুগ থেকে ফ্রান্সে অভিজাত ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিজাতরা প্রায়ই ফ্রাঙ্কিশ বিজেতাদের বংশধর দাবি করত এবং তারা বিশেষ অধিকার ভোগ করত বলে জমিদারি, সামন্ত কর, সরকারি চাকরির একাধিপত্য ভোগ করত। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট ফরাসি বিধানসভা সব ধরনের সামন্ত কর, সামন্ত স্বত্ব বিলোপ করে। দেশত্যাগী সামন্ত বা এমিগ্রিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সামন্ত প্রথা বিলোপের ফলে ফ্রান্সে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্বাধীন কৃষক শ্রেণি বাজেয়াপ্ত করা ভূমি ক্রয় করে সম্পদশালী হয়ে ওঠে। তারাই গ্রামাঞ্চলের প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের ওপর আরোপিত শোষণমূলক টাইদ বা ধর্ম কর, কর্ভি বা বেগার প্রভৃতি কর প্রথা থেকে তারা মুক্ত হয়। ভূমিদাস শ্রেণি মুক্ত হয় ভূমি দাস প্রথা থেকে। ব্যানালিতে বা সামন্ত কর, ম্যানর প্রথা লুপ্ত হয়। ফলে বহুলাংশ স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করে।

বিশ্বরাজনীতিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব

ফরাসি বিপ্লব ইউরোপ এবং নিউ ওয়ার্ল্ডে বেশ বড়োসড়ো প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লবকে ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করেন। অল্প সময়ের মাঝেই ফ্রান্স তার হাজার হাজার নাগরিককে émigrés বা অভিবাসী হিসেবে হারিয়েছে; যারা রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল এবং তাদের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিল। তাদের কিছু লোক প্রতিবেশী দেশগুলোতে (প্রধানত গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া) চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ গিয়েছিল রাশিয়ায় এবং অনেকে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিল। এসব ফরাসিদের বাস্তুচ্যুতির ফল হিসেবে ফরাসি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, অভিবাসন নিয়ন্ত্রণকারী নীতির প্রবর্তন হয় এবং ফরাসি বিপ্লবের সহিংসতাকে নিঃশেষ করার জন্য রয়্যালিস্ট ও অন্যান্য প্রতিবিপ্লবীরা একটি নিরাপদ আশ্রয়ের কথা চিন্তা করে।

অপরদিকে ফ্রান্সের ওপর এই বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ছিল বেশ গভীর। এর ফলশ্রুতিতে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফ্রান্সের রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও ধারণা ইত্যাদির পুনর্গঠন হতে থাকে। অন্যান্য যত কাছাকাছি রাষ্ট্র ছিল, সেগুলোতে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব তত বেশি এবং গভীরতর ছিল। এর প্রভাবে সেখানে লিবারেলিজম বা উদার গণতন্ত্রের উত্থান ঘটে। এমনিভাবে অনেক সামন্তবাদী বা প্রথাগত আইন ও অনুশীলনের অবসানের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের চর্চাও সেখানে শুরু হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষণশীল পালটা প্রতিক্রিয়াও ঘটে, যার ফলে নেপোলিয়ন পরাজিত হয় এবং বুরবোঁ রাজবংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছু ক্ষেত্রে তারা নতুন সংস্কারগুলোকেও হটিয়ে দেয়।

উসমানি সাম্রাজ্যে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব

উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য এই বিপ্লব মোটেও ইতিবাচক ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের উসমানি সাম্রাজ্যে এই বিপ্লবের প্রভাব দেখা দেয় মিশর ও সিরিয়ায় নেপোলিয়নের আক্রমণ পরিচালনার মধ্য দিয়ে। এর পাশাপাশি এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ছড়ানো অনেক বৈপ্লবিক ও লিবারেল ধ্যানধারণার প্রাদুর্ভাবও সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নের আক্রমণকে উসমানি প্রশাসন খুবই নেতিবাচক হিসেবে গণ্য করে এবং এর ফলে ফ্রান্সের সাথে উসমানি সাম্রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি মিত্রতারও অবসান ঘটে। উসমানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ ফরাসি বিপ্লবের মূল্যবোধের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং এটিকে সমস্ত ধর্মের প্রতি বৈরী এবং নাস্তিকতার প্রচারকারী বস্তুবাদী আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করেন। সুলতান সেলিম তৃতীয় অবিলম্বে বুঝতে পারেন যে, তার সাম্রাজ্য কতটা পিছিয়ে আছে। ফলে তিনি তার সেনাবাহিনী এবং সরকারব্যবস্থা উভয়েরই আধুনিকীকরণ শুরু করেন।

মোটকথা, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ফরাসি বিপ্লবের শুরুটা জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে হলেও, পরবর্তী সময়ে এই বিপ্লবের রক্ষার চ্যালেঞ্জ আরও অনেক অত্যাচার ও নিপীড়নের দুয়ার উন্মোচন করে দিয়েছিল। এই বিপ্লব বিশ্বকে যুগান্তকারী কিছু ধারণার সঙ্গে পরিচিত করালেও খোদ এই বিপ্লবের মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর থেকে এই শিক্ষা নেওয়া যায় যে, বিপ্লব যদি জনমানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়ে তাদের নিপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহলে সেই বিপ্লবের মর্মান্তিক অবসান অনিবার্য। ফরাসি বিপ্লবকে সবাই বিশ্বের জন্য যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করলেও অন্তর্নিহিত এই বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা হয়ে থাকে খুবই কম।

তথ্যসূত্র :

১. ‘আস-সাওরাতুল ফারানসিয়াহ’ – আব্দুর রহমান আর-রাফিয়ি (আরবি বই)। ২. ‘দিরাসাত ফিস-সাওরাতিল ফারানসিয়াহ’ – লুইস আওয়াদ (আরবি প্রবন্ধ)। ৩. ‘আস-সাওরাতুল ফারানসিয়াহ ওয়া মাবাদিউহা’ – মুহাম্মদ ইমারা (বই)। ৪. ‘দ্য ফ্রেঞ্চ রেভুলেশন : আ হিস্ট্রি’ – টমাস কার্লাইল (বই)। ৫. ফ্রান্স রেভুলেশন : ব্রিটেনিকা।

হাইতিয়ান বিপ্লব : দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রথম সফল দাসবিদ্রোহ

শেখ মুজাহিদুল ইসলাম

❝ হাইতিয়ান বিপ্লব ইতিহাসের একমাত্র দাসবিদ্রোহ, যা সফল হয়েছিল এবং দাসপ্রথা চিরতরে বিলুপ্ত করেছিল। এটি স্বাধীনতার প্রকৃত সংজ্ঞা পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছিল! ❞

—সি. এল. আর. জেমস, (*The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution*)

❝ হাইতিয়ান বিপ্লব একটি বৈপ্লবিক বার্তা পাঠিয়েছিল যে শোষিত মানুষগুলো শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ❞

—মাইকেল ক্লেইনার, (*Haiti: The Tumultuous History - From Pearl of the Caribbean to Broken Nation*)

ঘটনার সূচনা যেখানে

হাইতি বিপ্লবকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সফল দাস-বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে হাইতির মানুষ নিজেদের ভূমি থেকে ফরাসি উপনিবেশকে বিতাড়িত করে গড়ে তুলেছিল 'দাস-রাষ্ট্র' নয়; বরং একটি 'নাগরিক রাষ্ট্র'। প্রতিষ্ঠা করে রিপাবলিক অব হাইতি।[৪০]

আমরা রোমের স্পার্টাকাসের দুঃসাহসের কথা জানি—যিনি ইতিহাসে দাস-বিপ্লবের একজন প্রসিদ্ধ নায়ক, রোমান সাম্রাজ্যের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। কিন্তু না তার দাস-বিদ্রোহ সফল হয়েছিল, আর না তিনি গড়তে পেরেছিলেন একটি 'দাসমুক্ত নাগরিক রাষ্ট্র'।[৪১] তবে হাইতির বিপ্লব ছিল ভিন্ন কিছু, যা দাসমুক্ত নাগরিক রাষ্ট্র গড়ার সেই ঐতিহাসিক স্বপ্নকে রূপদান করেছিল বাস্তবতার।

---

[৪০] হিস্টোরি অব হাইতির বরাতে উইকিপিডিয়া ও ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকা।

[৪১] দ্য স্পার্টাকাস রেবেলিয়ন : মোর দেন আ স্ল্যাভ রেভল্ট, গেটিসবার্গ হিস্টোরিকাল জার্নাল—আগস্ট ২০২২।

হাইতিয়ান বিপ্লব : ১৩ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট, রবিবার রাত। দুশোজন আফ্রিকান দাস একত্রিত হয়েছে হাইতি দ্বীপের বোয়া কাইমান নামের এক পাহাড়ি এলাকায়। এই জমায়েতে অংশগ্রহণ করেছে, হিস্পানিওলা দ্বীপের ফরাসি উপনিবেশ সেন্টডোমিঙ্গুর একশোটি শস্যভূমির প্রতিনিধিত্বকারী দাস। জমায়েতের উদ্দেশ্য—বিপ্লবের পথ ও কর্মপন্থা নিয়ে শলাপরামর্শ করা।[৪২]

পালিয়ে আসা দাস কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে ছিলো অত্যাচার আর বঞ্চনার আগুন। আগুন নেভানোর জন্য পূর্বপুরুষের নিয়ে আসা অন্ধকারকে জাগ্রত করে চলছিল শক্তি সঞ্চয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। ডুডু পুরোহিত ডটু বুকম্যান অদৃশ্য আত্মার আবাহন[৪৩] করে তাদের কাছে অপার শক্তি কামনা করেন। মুহূর্তেই উপস্থিত সবার মধ্যে যেন তৈরি হয় অপার উন্মাদনা। বাদ্যের তালে তালে নিবিড় অশরীরী স্পর্শ শীতল স্রোতের মতো বয়ে যায়। উপস্থিত ব্যক্তিদের বাইরের কারও জন্য এটা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো দৃশ্য।

প্রায় দুই বছর আগে ঘটে গেছে ফরাসি বিপ্লব। বিপ্লবের গতিপথ, কর্মপন্থা, বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা এবং অর্জিত সফলতা—এ সবকিছুর ব্যাপারেই উপস্থিত ব্যক্তিরা বেশ ভালোভাবেই অবগত। তারা মূলত এই বিপ্লব থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই একত্রিত হয়েছে, একটা মোক্ষম সময় দেখে নতুন বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে। স্বাধীন করতে নিজেদের ভূমিকে এবং ভেঙে দিতে সমাজের এই দাসপ্রথা ও দাসত্বের শৃঙ্খল।

হাইতি বিপ্লবের প্রথম সারির নেতা জামাইকার আফ্রিকান দাস ডটু বোকম্যান। উপস্থিত দাসদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'প্রিয় বন্ধুরা আমার, নিজেদের হৃদয়ের কান দিয়ে শোনো—স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজছে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে!'[৪৪] এরপর মাত্র দু-মাস পর নভেম্বরের দিকে ফরাসিদের হাতে বোকম্যান ধরা পড়েন। ফরাসিরা তাকে হত্যা করে তার মস্তক জনসম্মুখে প্রদর্শন করায়; যাতে করে তার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতার মোহে একত্রিত হয়েছিল যে মানুষজন, তাদের সবার সেই মোহাচ্ছন্নতা কেটে যায়।[৪৫] এই ঘটনার ঠিক আট দিন পর—২২ তারিখ রাতে সেন্টডোমিঙ্গুতে শুরু হয় বিদ্রোহ। খেত-খামারে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন, উপনিবেশবাদের অনেক হর্তাকর্তাকে হত্যা করা হয়। আশপাশের অঞ্চল থেকে দাসরা দলে দলে এই বিদ্রোহে শামিল হতে থাকে। যে যা দিয়ে পেরেছে অস্ত্রশস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করে নিয়েছে।

---

[৪২] আ হিস্ট্রি অব মর্ডান ল্যাটিন আমেরিকা ১৮০০ টু দ্য প্রেজেন্ট, তেরেসা এ. মিড : ১৪৮।

[৪৩] বিশেষ মন্ত্রের সাহায্যে দেবতাদের ডাকা।

[৪৪] এডভেঞ্চারস অফ দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড, লরেন্ট ডুবাইস : ৯৯-১০২।

[৪৫] হাইতিয়ান হিস্ট্রিক্যাল এন্ড কালচারাল ল্যাগেসসি, দ্য নিউয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট : ৩৭।

এভাবে এক মাসের মধ্যেই ১ লাখেরও বেশি আফ্রিকান বিপ্লবী দাসের উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয় উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বকালের বৃহত্তম জমায়েতে।[৪৬]

হাজারো খেত-খামারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হত্যা করা হয় সহস্রাধিক ইউরোপীয়দের। কিন্তু বিপ্লবের তো এখন কেবলই সূচনা। এই যাত্রার বাকি আরও ১৩ বছরের সুদীর্ঘ পথ ...

হিস্পানিওলা দ্বীপের দাসপ্রথা

১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর। আটলান্টিক মহাসাগরের এক দ্বীপে এসে নোঙ্গর করে একটি স্প্যানিশ জাহাজ। মাটিতে পা রাখে একজন উৎসুক অভিযাত্রী ও ভবিষ্যতের সব সাম্রাজ্যবাদীদের পথপ্রদর্শক। জায়গাটা বেশ পছন্দ হয় তার। ইতিহাস এই সাম্রাজ্যবাদের পথপ্রদর্শককে ক্রিস্টোফার কলম্বাস। আর সেই দ্বীপটির পরবর্তী নাম—হিস্পানিওলা।[৪৭] ক্যারিবিয়ান দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত সেন্টডোমিঙ্গু। প্রথমে এখানেই স্প্যানের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সাম্রাজ্যিবাদীরাও আসতে শুরু করে এখানে। বিশেষ করে ফরাসিদের আগমন হয় খুব ধুমধাম করে। এরপর দীর্ঘকাল এসব উপনিবেশ নিয়েও বহু লড়াই ও চুক্তি-সমঝোতা চলতে থাকে। সবশেষে ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সেন্টডোমিঙ্গু স্পেনের উপনিবেশ থেকে বের হয়ে চলে যায় ফ্রান্সের উপনিবেশে। আঠারো শতকের শুরুতে এই উপনিবেশ পরিচিত হয়ে উঠে এন্টিলিস দীপপুঞ্জের শিরোমণি নামে। আরও সহজ করে বললে, সেন্টডোমিঙ্গু ততদিনে ক্যারিবিয়ান সাগরের সবচেয়ে ধনী উপনিবেশে পরিণত হয়। কারণ পৃথিবীর চিনি-দুধের চাহিদার প্রায় অর্ধেকই তখন এখান থেকেই সরবরাহ করা হতো। চিনি, কফি, কোকো, তুলা এবং বিশেষ করে কাপড়ে ব্যবহৃত নীল—এসবের উৎপাদনকে অর্ধ শতাব্দির মধ্যেই ফ্রান্স এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যায় যে, সেন্টডোমিঙ্গু ক্যারিবিয়ান দ্বীপের সবচেয়ে ধনী ও উর্বর ভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খোদ ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪০ শতাংশই পূরণ হতো এখান থেকে।

শুরুর দিকে স্প্যানিশরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে দাসব্যবসার সূচনা করে। তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাস নিয়ে আসতে থাকে। তবে এর ফলে দ্বীপের স্থানীয় আদিবাসীরা ক্রমাগত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। এই সংকট মোকাবিলায় ফরাসিরা একটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা আফ্রিকা থেকে দাস আনার দিকে মনোযোগ দেয়। আনিত দাসদের মধ্যে অনেকেই ছিল অল্প বয়সী—গড়ে ৭ থেকে ১০ বছর। প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার আফ্রিকান দাস ফরাসি উপনিবেশগুলোতে আনা হতে থাকে, যা দ্বীপের দাসদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে। ফলে অবস্থা একপর্যায়ে এমন হয়ে দাঁড়ায়

---

[৪৬] ডমিনিকান রিপালিক এন্ড হাইতি কান্ট্রি স্টাডিস, হেলেন চ্যাপিন : ২০। ওয়াশিংটন ২০০১।

[৪৭] কলম্বাস দ্য ডিস্কভারার, ফ্রেডেরিক অ্যালবিয়ন ওবার : ৯৬।

যে, দেখা গেল দাসদের প্রায় ৭০ ভাগই হয়ে গেছে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৫ লাখ কৃষ্ণাঙ্গ দাস মাত্র ৩২ হাজার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল।[৪৮]

৬০ ভাগ আফ্রিকান দাস আসত এংলো ও কংগো থেকে। কিছু আসত নাইজেরিয়া ও তুগো থেকে। দ্বীপের যেকোনো শষ্যক্ষেতে হাজির হলেই সেখানে পাওয়া যেত আফ্রিকান ভাষার কমপক্ষে বিশটি একসেন্ট বা ধরন; তা-ও খুব সহজেই। এখানে আসলে আফ্রিকানদের সংখ্যা কতটা বেড়ে গিয়েছিল, সেটা বোঝানো উদ্দেশ্য। সামগ্রিকভাবে তখন মনে হতে শুরু করেছিল, এই দ্বীপগুলো যেন ছিল আফ্রিকানদেরই আদি-নিবাস।

এই আফ্রিকানরা তাদের পারিবারিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ক্যাথলিক বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক এবং ডাকিনীবিদ্যার চর্চা। মূলত অদৃশ্য আত্মা 'লোয়া'-র উদ্দেশ্যে আরাধনা বলিদান আর বৈচিত্র্যময় সব আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করাই ছিল ভুডু রিচুয়ালের মূলকথা। ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্দশ লুইয়ের আইনে কৃষ্ণাঙ্গদের ধর্মচর্চায় নিষেধাজ্ঞা[৪৯] থাকলেও গোপনে তাদের রিচুয়াল অব্যাহত ছিল। আর ঐতিহাসিক বাস্তবতা তো এটাই যে, নতুন ভূখণ্ডে এই ধর্মচর্চা অভিনব রূপ নিয়ে নিপীড়িত দাসদের জাগ্রত করে তুলছিল শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তবে দ্বীপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সেন্টডোমিঙ্গু ছিল বেশখানেক আলাদা। এখানে শুধু বড় সংখ্যক আফ্রিকানই ছিল না, বরং বিশাল সংখ্যক নানান জাতি ও ভূখণ্ডের অধিবাসীও ছিল। যেমন সেন্টডোমিঙ্গুতে বসবাস করত প্রায় ৩০ হাজারের মতো ইউরোপীয়। ইউরোপীয়দের অনেকেই উপনিবেশের ওপর ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্ষোভ রাখত। তারা ফ্রান্সের দখলদারত্ব থেকে মুক্তি কামনা করত। তা ছাড়া সেই দ্বীপগুলোতে ধনী ঔপনিবেশিক ও গরিব ঔপনিবেশিকদের মধ্যেও ছিল নানান বিভাজন।

এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, উপনিবেশের একটা বিরাট অংশজুড়ে ছিল এমন সব বিদ্রোহীদের দখল, যাদের বলা হত 'ফ্রি কালারড' বা 'মুক্তরঙা'—ফ্রি কালারড বলে মূলত এমন একটি গোষ্ঠীকে বোঝানো হতো, যারা রক্ত-মাংসে ইউরোপীয়ও না, আবার আফ্রিকান দাসও না। সংখ্যায় এরা ৩০ হাজারের মতো ছিল। উপনিবেশের তিন অঞ্চলের দুটিতেই তারা সংখ্যায় ছিল ইউরোপীয়দের চেয়ে বেশি। আবার এদের মধ্যে প্রাক্তন ক্রীতদাসরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনিভাবে সেখানকার ধনী ইউরোপীয়দের সন্তানরাও অধিকাংশ হয়ে থাকত দাসীদের গর্ভজাত বা ফ্রি কালারড নারীদের গর্ভজাত।[৫০] এসব ভূমির চার ভাগ

---

[৪৮] দ্য হাইতিয়ান ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেনস ইন অ্যাটলান্টিক কন্টেক্সট, ডেভিড আর্মিটেজ : ২-৩।

[৪৯] ফরাসি ন্যাশনাল আর্কাইভস, কোড নোয়ার (১৬৮৫), জন গ্যারিগাস অনূদিত।

[৫০] আ হিস্টোরি অফ মর্ডান ল্যাটিন আমেরিকা ১৮০০ টু দ্য প্রেজেন্ট, তেরেসা এ. মিড : ১৩৩-১৩৪।

আর দাসদের তিন ভাগের মালিকও এই ফ্রি কালারডরাই ছিল। উপরন্তু এদের মধ্যে অনেকে ছিল এমন, যারা আমেরিকান উপনিবেশগুলোর মুক্তির জন্য চালিয়ে যাচ্ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। তারাও ছিল ফরাসিদের বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্যের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, সরকারি পদ ও পেশাগত কাজেও দেওয়া হচ্ছিল বিধিনিষেধ। নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান আর গাড়ি-আরোহণেও ফরাসি প্রশাসন কড়াকড়ি করত।

দাসপ্রথা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের কলঙ্কজনক একটি অধ্যায়। কিন্তু তৎকালীন সেন্টডোমিঙ্গু (আজকের হাইতি) অঞ্চলের সুগার প্ল্যান্টেশনগুলোর দাসপ্রথা ছিল খুবই ভয়াবহ। এতটা ভয়াবহ যে, তা কোনো কঠোর বর্ণবাদীর পক্ষেও সহ্য করা কষ্টকর হবে। সামান্য ভুলত্রুটির জন্য মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করা ছিল এর সাধারণ শাস্তি। আর চাবুকের প্রহার, জিভ কেটে নেওয়া, খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করা, ফাঁসিতে চড়িয়ে হত্যা—এসব ছিল অনিবার্য পরিণতি।[৫১] কথিত আছে : 'প্রতি দশ মিনিটে কোনো না কোনো ভুলের জন্য প্রতিটি হাইতিয়ান দাসের পিঠে পঞ্চাশটি করে বেত্রাঘাতের দাগ পাওয়া যেত।'[৫২] ইতিহাসের গ্রন্থগুলো ঘেঁটে দেখলে বোঝা যায়, সেসব সেন্টডোমিঙ্গু ও তার আশেপাশের দ্বীপগুলোতে এসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল নিজেদের আফ্রিকান পরিচয় দেওয়াও।[৫৩] তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'ফরাসি মায়ের কয়েদি দাস' পরিচয়। দাসদের আধিক্যের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উদ্ভব হয়েছিল মুক্ত ধনবান কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের।

উপনিবেশ দ্বীপের অর্থনৈতিক আইনকানুন ছিল—

১. উপনিবেশের উৎপাদিত সমস্ত সম্পদ বা পণ্য মার্তৃদেশে রপ্তানি করতে হবে এবং এই উৎপাদিত পণ্য থেকে উপনিবেশ কোনো স্বাধীন বাণিজ্য করতে পারবে না।

২. উপনিবেশ মাতৃদেশ ছাড়া আর কারও থেকে পণ্য ক্রয় করতে পারবে না।

৩. উপনিবেশে সবধরনের শিল্প-বাণিজ্য নিষিদ্ধ থাকবে।

৪. উৎপাদিত সবকিছু কেবল মাতৃদেশের কাছেই বিক্রি করতে হবে।

৫. উপনিবেশের সমস্ত বাণিজ্যে মাতৃদেশের একচেটিয়ে অধিকার থাকবে।[৫৪]

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো—তখন ফ্রান্সে উদীয়মান 'ফাঁসির আইন বিলুপ্তবাদী আন্দোলন'-এর সাথেও ফ্রি কালারডদের ছিল ভালো যোগসাজশ।

---

[৫১] হাইতি : হার হিস্টোরি এন্ড হার ডিট্রেক্টর্স—১৯০৭, জ্যাক নিকোলা লিগার : ৩৪-৩৯

[৫২] হাইতিস স্টর্ম অফ রেভ্যুলেশনারি টারবুলেন্স, ফ্রেডেরিক ডগলাস : ২

[৫৩] দ্য ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল কোয়েশ্চান এন্ড ডিসইন্টিগ্রেশন অফ হোয়াইট, মলি হারম্যান : ৩০

[৫৪] দ্য ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলেশন ইন সেন্টডোমিঙ্গু, থিওডর লুথরপ স্টোডার্ড : ১৬

আবার এই বিলুপ্তবাদীরা কিন্তু ফাঁসির আইন বিলুপ্তির পাশাপাশি দাসপ্রথা নিয়েও তুলেছিল নিন্দার আওয়াজ। ফ্রি কালারডরা প্রগতি, স্বাধীনতা, সমতা ইত্যাদি ... চিন্তার সঙ্গে নিজেদের জুড়ে রেখেছিল। তারা উপনিবেশবাদীদের কাছে থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সরব থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের পতনের ফলে বৃহত্তর উপনিবেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়। স্বাধীনতার দাবি ও মুক্তির আওয়াজ উঁচু হতে থাকে নানাদিকে। ফ্রি কালারডরাও তাদের সমতার দাবিদাবা উত্থাপন করতে থাকে। ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স সরকার উপনিবেশের শেষ দাবিকেও প্রত্যাখ্যান করে বসে। এরই প্রেক্ষিতে তখন একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় আর বরাবরের মতোই সেই বিদ্রোহকে ফরাসিরা শক্তভাবে দমন করে।[৫৫] এই বিদ্রোহের অগ্রনায়ক ছিলেন ভিন্সেন্ট ওঁজি। তাকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। সামগ্রিকভাবে এসব ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও বেশি উত্তপ্ত ও বিশৃঙ্খল করে তোলে। অন্যদিকে এসব বিশৃঙ্খলার মধ্যেই চলে আসে নতুন বছর। ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের ২২ আগস্ট নাগাদ আফ্রিকান দাসরাও বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। ইতিহাস যাকে হাইতি বিপ্লব নামে ঠাঁই দিয়েছে তার পাতায়। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় আগে থেকে চলে আসা ফ্রি কালারডদের আন্দোলন। নিজেদের যাবতীয় অধিকার আদায় করে নিতে তারাও জোর আওয়াজ তোলে। আর শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে জুড়ে দেয় এক তীব্র বিদ্রোহ!

দাস-মনিবের যুদ্ধ

বিদ্রোহের আগুণ ছড়িয়ে পড়ে, দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করে বিদ্রোহে যোগ দিতে। ভালো ব্যাপার হচ্ছে, অনেক আফ্রিকান ও বেশিরভাগ ফ্রি কালারডদেরই আছে ভালোরকম সামরিক অভিজ্ঞতার অর্জন। দাসবা ক্ষেতখামার নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, উপনিবেশ-মনিবদের তারা আর সেবা দিতে পারবে না বলে অস্বীকৃতি জানায়। চাষবাসের সেবাও না, কোনো কিছুরই না।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর। ফ্রান্স তার ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য লিগার ফেলিসি সোনথিনাক্স-এর নেতৃত্বে ৬ হাজার সৈন্য সেন্টডোমিঙ্গুতে পাঠায়। প্রাথমিকভাবে ফরাসি জেনারেল চাচ্ছিল ফ্রি কালারডদের মধ্যে যারা সুবিধাবাদী তাদের সাথে আঁতাত করে বিদ্রোহের কোমর ভেঙে দিতে; কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে কিছু ফরাসি-আশ্রিত শক্তি ভেতর থেকে বিদ্রোহ করে বসেছে। এরই মধ্য দিয়ে সবকিছু হয়ে যায় এলোমেলো এবং বড়ই জটিল।[৫৬]

---

[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩

[৫৬] লুইজিয়ানা আইডেন্টিটি ট্রায়াল, এরিকা রবিন জনসন : ১০-১১

ঠিক একই সময়ে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড আর স্প্যান করে বসে ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা। সেন্টডোমিঙ্গুতে আক্রমণ করতে পাঠিয়ে দেয় বিপুল সেনাশক্তি। উপনিবেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে অর্থাৎ বিপ্লবের মাত্র দুই বছরের মাথায় উপনিবেশগুলোতে দাসপ্রথা বিলুপ্তির একটি ডিক্রি জারি করতে বাধ্য হয় ফরাসি কমান্ডার লিগার ফেলিসি।[৫৭] এই পরিবেশে, উপনিবেশের সমস্ত স্টেকহোল্ডার (স্প্যানিশ, ব্রিটিশ ও কিছু মুক্ত রঙের মানুষ) সবাই তৎপর হয়ে ওঠে বিদ্রোহী দাসদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দিতে।

এমন অশান্ত সময়ে তুঁসো লুভারচার হাইতি বিপ্লবের প্রধান নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। সেন্টডোমিঙ্গুতে এক ক্রীতদাস হিসেবেই লুভারচারের জন্ম। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দাসদের ছোটখাটো মনিব। মনে করা হয়, তিনিও হাইতি বিপ্লবের প্রাথমিক পরিকল্পনার জমায়েতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি স্প্যানিশদের পক্ষ হয়ে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, ফরাসিদের ওপর অর্জন করেন বেশ কিছু বিজয়ও। তাকে কৃষ্ণাঙ্গদের জর্জ ওয়াশিংটন নামেও ডাকা শুরু হয়।[৫৮] কিন্তু তার অনেক বিজয় ও নামডাক হওয়ার পরই তিনি ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে যোগ দিয়ে বসেন নিউ রিপাবলিক অফ ফ্রান্সের সাথে। তারা তাকে ডেপুটি গভর্নর এবং সেন্টডোমিঙ্গুর ফরাসি সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ নিযুক্ত করে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এখানে লুভারচারের সচেতন লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ছিল—সে চাচ্ছিল ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্যও ঘোষণা করে যাবে, একইসাথে ক্রীতদাসদের স্বার্থও রক্ষা করে যাবে।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই লুভারচার অনেক বিজয় অর্জন করেন। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনকে সেন্টডোমিঙ্গু থেকে বিতাড়িত করেন, তারপর ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনকেও বাধ্য করেন এই ভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে লুভারচার তার দক্ষ কূটনৈতিক চাল ও সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে সেন্টডোমিঙ্গু উপনিবেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন পুরোপুরি নিজের হাতে।[৫৯]

১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে লুভারচার সাবেক স্প্যানিশ উপনিবেশও দখলে নেন। প্রথমবারের মতো হাইতি নিজেকে দেখতে পায় দখলদারমুক্ত! কিন্তু দুঃখজনকভাবে এরপর লুভারচার এমন এক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাকে প্রদান করে স্বৈরাচারী ক্ষমতা। তবে সেইসাথে নতুন আইনি ও শিক্ষাব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থনীতিকে চাঙা করতে এবং ব্রিটেন- যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের আলাপে যুক্ত হতে

---

[৫৭] পেপার থিন : ফ্রিডম অ্যান্ড রি-এনসলেভমেন্ট ইন দ্য ডায়াসপোরা অফ দ্য হাইতিয়ান রেভ্যুলেশন (ল অ্যান্ড হিস্টরি রিভিউ), রেবেকা জারভিস স্কট : ভলিউম ২৯, নম্বর ৪, নভেম্বর ২০১১, পৃ : ১০৬৫

[৫৮] তুসাঁ লুচারচার : আ বায়োগ্রাফি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি, জেমস রেডপাথ : ৩৭

[৫৯] হিস্টোরি অফ হাইতি (হাইতি সাপোর্ট গ্রুপ)

লুভারচার সেন্টডোমিঙ্গুতে ফিরিয়ে আনেন পলায়িত কিছু ফরাসি কৃষককে। তার এসব আইনকানুন ও কাজকারবার লোকদের একদমই পছন্দ হচ্ছিল না। সাবেক কিছু দাস অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাচ্ছিল। তাদের কথা ছিল : 'চাষাবাস করব, তো নিজেদের জমিতেই করব এবং নিজেদের জন্যই করব; কোন সরকার-টরকারের জন্য কাজ করতে পারব না!' এদের পাশাপাশি আবার লুভারচারের পালক ভাই জেনারেল মুইসের নেতৃত্বেও মাথাচাড়া দেয় এক বিদ্রোহ। লুভারচার সেটা অত্যন্ত শক্ত হাতে দমনও করেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হাতে লুভারচারের পতন

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের ক্ষমতায় আসেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। লুভারচারের শক্তিশালী অবস্থান আর অবাধ স্বাধীনতা তার একদমই পছন্দ হয়নি। শুরু হলো কূটচাল। নেপোলিয়ন সেন্টডোমিঙ্গুতে নতুন করে যুদ্ধের ফন্দি আঁটেন—যার মধ্য দিয়ে রচিত হয় হাইতি বিপ্লবের সহিংসতম অধ্যায়।

ফরাসিদের ছিল ২০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। কিন্তু তারা চেষ্টা করছিল, বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে কোনো বড় ধরনের সংঘাত ছাড়াই সেন্টডোমিঙ্গুর নিয়ন্ত্রণ হাতিয়ে নিতে। এই মোতাবেক তারা লুভারচারের সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সিনিয়র জেনারেলকে নিজেদের বশে আনতে সক্ষম হয়; একইসাথে আত্মসমর্পণের জন্যও রাজি করায় তাদের।

৭ জুন ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে। ফরাসি জেনারেল ব্রুনেটের তরফ থেকে লুভারচারের প্রতি দাওয়াত এসেছে সাক্ষাতের।[৬০] কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না মর্মে তাকে পূর্ণ আশ্বস্ত করা হয়। গোনাইভস নামক স্থানে লুভারচার আর ব্রুনেটের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ফরাসিদের কাছে আত্মা বিক্রি করে দেওয়া ব্রুনেট তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয়। লুভারচারকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফ্রান্সে। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্জন কারাগারে একাকিত্ব যাপনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মারা যান হাইতির এই বিপ্লবী মহান নেতা তুঁসো লুভারচার।[৬১]

বিশ্বাসঘাতক ফরাসিরা যখন লুভারচারকে গ্রেপ্তার করছিল, তখন লুভারচার বলেছিলেন : 'আমাকে উৎখাত করে তোমরা স্বাধীনতা নামক বৃক্ষের কাণ্ড কেটে দিলে। কিন্তু এই কাণ্ড এই গাছ-শিকড় থেকে আবারও উত্থিত হবে। জেনে রেখো, স্বাধীনতার শিকড় সুপ্রাচীন; স্বাধীনতার শিকড় প্রোথিত অনেক গভীরে!'[৬২]

---

[৬০] দ্য ব্ল্যাক ম্যান অফ হাইতিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স, বার্ড মার্ক বেকার : ৫৭

[৬১] সেন্টডোমিঙ্গু : পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট উইথ আ গ্লান্স ইন হাইতি, স্যামুয়েল হ্যাজার্ড : ১৪৫

[৬২] হাইতিয়ান হিস্টরিকাল এন্ড কালচারাল ল্যাগেসি : ৩৭

ফরাসি সেনাবাহিনী যুদ্ধে আর রোগে আক্রান্ত হয়ে এই পুরো সময়টাতে ৮ হাজার সেনা হারালেও নেপোলিয়নের নেতৃত্বে তারা ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে আবারও নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধেও স্বাধীনতাকামীদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। নেপোলিয়নের সরকার তখন নতুন নতুন আইন করে আরও বড় পরিসরে উস্কে দিতে থাকে সেসব প্রতিরোধ। গর্ত থেকে মাথা বের করে আনার এই নীতি প্রয়োগ করে নেপোলিয়ন ঔপনিবেশকি অঞ্চলগুলোতে ফরাসিদের ত্রাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। সব জায়গায় আবারও চালু হয় দাসপ্রথা। ফ্রি কালারডদের ফ্রান্সে প্রবেশে জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। হতাশার এই ঘনঘোর থেকে আবারও প্রতিরোধের আগুন জ্বেলে ওঠে। লুভারচারের ভুল বুঝতে পারা জেনারেলরা (যারা আগে ফ্রান্সের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল) এবং তাদের সাবেক দাসবাহিনী সম্মিলিতভাবে সেন্টডোমিঙ্গুর এই নব-প্রতিরোধের প্রদীপশিখা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সবাই ফিরে আসতে শুরু করে একে একে। প্রতিরোধের শক্তি আবারও হয়ে ওঠে শক্তিশালী, সময়ের ব্যবধানে তাতে যোগ দেয় ফ্রি কালারডরাও।

হয়তো স্বাধীনতা, নয়তো মৃত্যু

এই দুটি মাত্র শব্দ—জাত-পাত পেছনে রেখে সব হাইতিকে একত্রিত করে। আর ভেঙে দেয় সব প্রথা, ব্যবস্থা আর অন্যায়-অনাচারের বলয়।[৬৩] নতুন করে সাবেক দাস জঁ জ্যাক দেসালিনের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করে। আগে ও পরে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অভিন্নই—সেন্টডোমিঙ্গুর মাটি থেকে ফরাসিদের চিরতরে বের করে দেওয়া! অন্যদিকে উপনিবেশবাদী ফরাসিরা যে বসে ছিল, বিষয়টা তেমন নয়। তারাও পুরোদমে সম্ভাব্য সব চেষ্টা ব্যয় করে; এমনকি সব ধরনের সহিংসতা ও নৃশংসতার আশ্রয় নিয়ে হলেও প্রতিরোধ আন্দোলন ঠেকাবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু সেন্টডোমিঙ্গুর দখল তাদের হাত থেকে ফসকেই যায় শেষ পর্যন্ত।

১৮ নভেম্বর ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ। ভার্টিয়েরস যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ধুলা খাইয়ে ছাড়ে হাইতির বিপ্লবী বাহিনী। দখলদাররা বাধ্য হয় চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করে সেখানকার মাটি ছাড়তে। এভাবেই মূলত দীর্ঘ ১৩ বছরের টানা-সংগ্রাম শেষে সেন্টডোমিঙ্গুর জনগণ ইউরোপের তিন-তিনটি প্রধান পরাশক্তি : স্পেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে পারে একটা স্বাধীন ভূমিতে। রক্তাক্ত এক অধ্যায় রচিত হলেও নিজেদেরকে তারা আজাদ করে দাসত্ব ও বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে। সর্বোপরি তাদের হাত ধরে সৃষ্টি হয় ইতিহাসের এক বিপ্লবী নয়া নজির![৬৪]

---

[৬৩] লরেন্ট ডুবাইস : ১৮৮

[৬৪] থিওডর লুথরপ স্টোডার্ড : ৩৪৮; তেরেসা এ. মিড : ১৫২

১ জানুয়ারি১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দ। দেসালিন হাইতি নামে একটি নতুন প্রজাতন্ত্র গঠনের ঘোষণা দেন। স্বাধীন হাইতি; যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর পশ্চিম গোলার্ধের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেসালিন ঘোষণা করেন : 'আমরা বদলা নিয়েছি হত্যাকারীদের (ফরাসি) থেকে। আমরা রক্তের বিনিময়ে দিয়েছি তাজা রক্ত!' এরপর থেকে দেসালিন হয়ে যান স্বাধীন হাইতির ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। এরইসঙ্গে তিনি আরও ঘোষণা করেন শ্বেতাঙ্গদের সবাইকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়ার। ফলে দ্বীপের মধ্যে ঘটে যায় গণ-দেশত্যাগ।[৬৫]

প্রজাতন্ত্রের এই ঘোষণা ছিল মানব-ইতিহাসের একমাত্র সফল দাস-বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি। আর এখানে এসে গোড়াপত্তন হয় একটি আধুনিক আফ্রিকান প্রজানন্ত্রের। মজার বিষয় হচ্ছে, একটা আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রী সরকার, অথচ এটার ভৌগোলিক অবস্থান হয় আফ্রিকা মহাদেশেরই বাইরে! এখানেই জন্ম হয় মানবাধিকারের আধুনিক সব চিন্তা ও ধারণার; যার সঙ্গে যুক্ত হয় একটি নতুন সংবিধান, যা সমস্ত নাগরিকের অধিকারের কথা বলবে, স্বীকৃতি দেবে—সব মানুষ স্বাধীন! সব মানুষ সমান!

পার্শ্ববর্তী দেশের সরকাররা চেষ্টা করছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের এই বিদ্রোহ অন্যদের ওপর যাতে প্রভাবক না হয়ে ওঠে। অথচ সব চেষ্টা-বাধাকে ডিঙিয়ে তির-তীব্র গতিতে বিদ্রোহের এই উত্তাপ ঠিকই ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো ক্যারিবিয়ান দ্বীপে। ঐতিহাসিক লরেন্ট ডুবাইস তার এভেঞ্জারস অফ দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড বইয়ে লেখেন : 'হাইতির এই কারনামা ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্রোহ ছিল স্বাধীনতার আওয়াজ তুলে করা বিকট এক চিৎকার; দাসসমাজে স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির শুরু। পুরো ল্যাটিন আমেরিকার জন্য এটা একটা জরুরি পাঠ ছিল। কারণ এই বিদ্রোহ ছিল ঐতিহাসিক ও সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে; নিঃদন্দেহে যা ভারী ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার ছিল।'

হাইতি বিপ্লব, যাকে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্রোহও বলা হয়—এটা এক অতুলনীয় ইতিহাস। ইতিহাসের প্রথম সফল দাস-বিপ্লব; মার্কিন রাষ্ট্রের পর পশ্চিম গোলার্ধের দ্বিতীয় সফল বিপ্লব; এমনকি পৃথিবীর এমন বেনজির ঘটনা, যা কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে একটি প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত গঠন করে—প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশের শৃঙ্খল ভেঙে দেওয়ার এবং বৈশ্বিক স্বাধীনতার স্প্রিটের।[৬৬]

অথচ যাকে একেবারে অসম্ভবই ধরা হতো, প্রথমবারের মতো তা সম্ভব করে দেখাতে সক্ষম হয় এই হাইতি বিপ্লব; তাও আবার ফ্রান্সের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়ে। স্বাধীনতার পর বড় বড় কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল হাইতি নামক নতুন রাষ্ট্রটার সামনে, বিশেষ করে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মতো বিষয়গুলো। কারণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব

---

[৬৫] মলি হারম্যান : ৭৯

[৬৬] দ্য হাইতিয়ান রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য ফোরজিং অফ আমেরিকা, জিম থমসন : ভলিউম ৩৪, নম্বর ১, পৃ : ৭৮

দেওয়া লোকদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই এমন ছিল, যাদের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য ছিল রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার। তবে এই সংকটের মধ্যেও আশার ব্যাপার ছিল, সাধারণ মানুষকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে দেখা যায় পরম সচেতন। তাদের বিশ্বাস ছিল বিপদ এখনো কাটেনি, এমনকি দ্রুতই ফ্রান্সের সাথে আবারও যুদ্ধে জড়াতে হতে পারে তাদের। ব্রিটেন তো বলেছিলই, এই নতুন অস্তিত্বে আসা রাষ্ট্রের দম খুব দ্রুতই ফুরিয়ে যাবে। তাই দেসালিনের দায়িত্ব ছিল, প্রাথমিকভাবে যেকোনো পাল্টা বিদ্রোহ থেকে দেশকে হেফাজত করা, পাশাপাশি পোস্ট-রেভ্যুলেশনকালে যেসব বিশৃঙ্খলা হয়েছিল, দেশকে তা থেকে শৃঙ্খলে নিয়ে আসা।

*

সহজভাবে বললে, হাইতিয়ানদের দ্বারা ১৭৯১-এর বিপ্লব আর তারও আগের সময়ে স্বাধীনতার জন্য চালানো নানারকমের প্রচেষ্টা—এগুলো কিছুই আসলে হতো না, যদি না শ্বেতরা জুলুম আর বেইনসাফির জঘন্য সব কীর্তিকলাপ হাইতির কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে না ঘটাত। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা এটা ভুলে গিয়েছিল—দাস যে হয়, সে-ও মানুষই। আসলে যখনই তারা এটা ভুলে বসেছিল, তখন থেকেই ক্ষোভ ও বিক্ষোভের দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। যার অনিবার্য ফল হিসেবেই একসময় সেই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় এই বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লবের সুরতে।

হাইতি বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাবের সাথে দাথে, দাসপ্রথায় কিছু আইনগত সংশোধন এনেছিল ফরাসি সরকার। এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভেস্তে যায় তখন এর সবই। এর কারণ ছিল দুটি : এক. দাস-মনিবরা এসব আইনে বিশ্বাসী ছিল না, যা দাসদের কিছুটাও স্বাধীনতা দান করতে পারে; দুই. খোদ দাসরাই বিশ্বাস করত যে, এসব নিয়মকানুন আর লোকদেখানো সংশোধন কিংবা ন্যায়ের ভাষণ—এসবই স্রেফ রাজনীতির চাল; যা তাদের নিঃশর্ত স্বাধীনতার মানবিক ও বৈধ অধিকারে বাধা দেওয়ার জঘন্য চাল কিংবা পায়রাতা ছাড়া আর কিছুই না। আর এই দ্বিতীয় কারণই ছিল বিপ্লবের সফলতার অন্যতম প্রধান কার্যকরী কারণ।[৬৭]

*

হাইতির বিপজ্জনক পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আসলে ফ্রান্সের সামনে আসলে নির্মম বলপ্রয়োগ কিংবা পৈশাচিক দমননীতি অবলম্বন ছাড়া আর কোনো পথও খোলা ছিল না। ফ্রান্স সেই পথেই হাঁটে। যার ফলে দাসরা আরও ক্ষেপে ওঠে। ফ্রান্সের মতো পরাশক্তির সামনে তারা কিছুই না—এটা জেনেও তারা স্বাধীনতার আওয়াজ তুলেছিল। ফ্রান্স তার সামরিক শক্তির বলে চুটকিতেই মিশিয়ে দিতে পারে তাদের এই 'মামুলি বিদ্রোহ'—এটা জেনেও দাসরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শ্বেতাঙ্গদের

---

[৬৭] সাওরাতুল উলা ফিত তারিখিল হাদিস, লুতফি জামিল মুহাম্মাদ (মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিত তারবিয়াহ) : ৩৪২

বিরুদ্ধে, নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে। হাইতি যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ শুধু এটাই না যে, তারা ব্রিটেনের নেতৃত্বে একটি ব্যাপক ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিল; বরং সেখানে আরও কয়েকটি বিষয় বেশ প্রভাব ফেলেছিল : প্রথমত দাসদের ইচ্ছাশক্তি; দ্বিতীয়ত তাদের ঐক্য ও একতা; তৃতীয়ত তাদের এই বিশ্বাস যে, স্বাধীনতার বিপরীতে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই তাদের সামনে—'হয়তো স্বাধীনতা, নয়তো মৃত্যু'। এর বাই বাহ্যিক কারণ হিসেবে প্লেগসহ বিভিন্ন মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ফরাসি সৈন্যিদের গণহারে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়াটাও ছিল উল্লেখযোগ্য একটি কারণ।

হাইতি বিপ্লব আমেরিকা মহাদেশের দাসপ্রথা ও দাস-ব্যবসার ওপর ভালোভাবে ছায়া ফেলে। বিদ্রোহ চলাকালীন আমেরিকার অন্দরে তার প্রভাবের কারণে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে সাউথ কারোলিনাতে দাসদের আরেকটা বিদ্রোহের চেষ্টা ঘটে। পরবর্তীকালে এই দুই দেশেই আমরা দাসদের বিদ্রোহের ভিন্ন ভিন্ন সব চেষ্টা দেখতে পাই, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের ডোমিনিকান রিপাবলিকে ঘটা বিপ্লব। এরপর ১৮৬১-১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে হওয়া আমেরিকান গৃহযুদ্ধ; তারপর ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য বিপ্লবগুলোর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৮]

হাইতি বিপ্লব নিয়ে রচিত হয়েছে নানান ফিকশন, গল্প, উপন্যাস ও গবেষণা-প্রবন্ধ :

1. The Haitian Revolution, 2. The Black Jacobins (1938), 3. Tree of Liberty (1939), 4. Tropics of Haiti (2015), 5. Dangerous Neighbors (2010), 6. The Priest and the Prophets (2017), 7. Beyond the Slave Narrative (2011), 8. Silencing the Past (1995), 9. Avengers of the Nwe World (2004), 10. The World of the Haitian Revolution (2009), 11. Mirror's freedom (2014), 12. The Uses Of Haiti (1994).[69]

*

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবির অর্থনৈতিক চিন্তার দুই মূলনীতির দ্বিতীয়টি হচ্ছে—'শ্রমই মালিকানার মূল। ফলে অল্প শ্রমে বা বিনাশ্রমে কেউ মালিকানা ভোগ করতে পারবে না। আর যারা শ্রম দেয়, তাদের দাবিয়ে রাখতে সচেষ্ট যেকোনো ব্যবস্থাই শেষ করে দেওয়া উচিত। যে সমাজব্যবস্থা শ্রমের প্রকৃত মূল্য দেয় না, তার পতনও অনিবার্য।'[৭০]

---

[৬৮] প্রাগুক্ত আর্টিকেল : ৩৪৩

[৬৯] উইকিপিডিয়া

[৭০] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ

এটাই প্রকৃতির নিয়ম বা ফিতরত। হাইতির নিপীড়িত কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তা-ই। যেখানে শ্রম ছিল তাদের, মালিকানাও এসেছে তাদের হাতে; সমাজের পূর্বাবস্থা ভেঙে তারা নতুন করে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে।

প্রবন্ধের শেষে এসে যে বিষয়টি না বললেই নয়—আমাদের দেশের ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান আর তার আগ-পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের তরফ থেকে দেশের নাগরিকদের প্রতি যে সিস্টেমিক আচরণগুলোর আমরা সাক্ষী হয়েছি, তার সঙ্গে হাইতি বিপ্লবে হাইতির জনগণের সঙ্গে করা কলোনিয়াল ফ্রান্সের আচরণগুলোর বিশাল একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাংলাদশের ফ্যাসিস্ট রেজিম এই ভূমি আর তার নাগরিকদের সঙ্গে অনেকটা ঔপনিবেশিক হয়ে উঠেছিল আদতে। একটা উপনিবেশবাদী শক্তি যেভাবে তার কলোনিগুলোকে চুষে চুষে খায়, কোনোদিক থেকেই বাংলাদেশের বিগত রেজিমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। তাই দেখা যায়, হাইতির জনগণ যেভাবে ফ্রান্সের দেওয়া দাসপ্রথার আইনি শিথিলতাগুলো মেনে নেয়নি এবং সেগুলোকে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আর তাদের স্বাধীনতার মানবিক বৈধ অধিকার আদায়ে বাধা দেওয়ার পায়তারা হিসেবে নিয়েছিল, ২৪-এর অভ্যুত্থানেও বাঙালি জনতা ফ্যাসিবাদের নরম নরম কথা আর মিলে-মিশে চলার প্রস্তাবকে আমলে নেয়নি। জালিমের সামনে মজলুমের এই নৈতিক শক্তি প্রদর্শনের ফলে সব যুগেই মজলুমদেরই বিজয়ী হতে দেখা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় হাইতির মতো বাংলার আকাশও স্বাধীনতার সূর্য দেখেছে। আরও দেখেছে এমন একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন, যেখানে জনগণের অধিকারকে উপেক্ষা করা হবে না, কোনো ধরনের নোংরা রাজনীতির চর্চা হবে না আর জনগণ ও সরকার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করবে। একসাথে হয়ে কাজ করবে।

শেষ কথা এটাই যে, হাইতির বিপ্লব সবসময় সব যুগে পৃথিবীর যে কোণেই জুলুম হবে সেইখানেই হাজির থাকবে তার স্প্রিট নিয়ে, মুক্তির আওয়াজ নিয়ে। হয়তো ইতিহাস কখনো তো অনেক বর্ণাঢ্যভাবে আলোচনা করবে, আবার হয়তো কখনো সেই আলোচনা অন্য আলোচনাগুলোর নিচে হারিয়ে যাবে। কিন্তু এই স্প্রিট সবসময় এক থাকবে।

উনবিংশ শতাব্দীর যুগান্তকারী সিপাহি বিপ্লব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জাগরণের আখ্যান

মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান

❝ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহ কেবল একটি সামরিক বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম মহান সংগ্রাম। ❞

— কার্ল মার্কস (*New-York Daily Tribune*, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের নিবন্ধসমূহ)

❝ এই বিদ্রোহ ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করেছিল। ❞

— স্যার সৈয়দ আহমাদ খান (*The Causes of the Indian Revolt - 1857*)

বিপ্লব বলতে সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সামাজিক কাঠামোতে একটি মৌলিক পরিবর্তনকে বোঝায়, যা তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে এবং জনগণের বিদ্রোহ বা অসন্তোষের ফলস্বরূপ বাস্তবায়িত হয়। এরিস্টটলের মতে, বিপ্লবের দুটি প্রধান রূপ রয়েছে : এক. সংবিধান থেকে অন্য সংবিধানে পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন। দুই. একটি বিরাজমান সংবিধানের সংস্কার।[৭১]

'বিপ্লব' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মৌলিক পরিবর্তন নির্দেশ করে। জেমস ডেভিস বিপ্লবকে হিংসার মাধ্যমে শাসকশ্রেণিকে উৎখাত এবং জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট অন্য একটি শ্রেণি দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৭২] অন্যদিকে ক্রেন ব্রিনটনের মতে, বিপ্লব হলো প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সশস্ত্র উপায়ে এবং বিধিবহির্ভূতভাবে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া।[৭৩]

---

[৭১] Politics, Aristotle

[৭২] Toward a Theory of Revolution, James C. Davies

[৭৩] The Anatomy of Revolution, Crane Brinton

কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বিপ্লবকে সামাজিক সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন বলে আখ্যা দেন। তাদের মতে, ইতিহাস মূলত একটি গতিময় প্রক্রিয়া, যার মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্রমাগত পরিবর্তন। তারা বিশেষভাবে সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনকে বিপ্লবের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন।[৭৪]

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি অভ্যুত্থান : বিদ্রোহ, বিপ্লব, গণঅভ্যুত্থান নাকি স্বাধীনতা সংগ্রাম?

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি অভ্যুত্থান ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বহুমাত্রিক এবং বিতর্কিত ঘটনা। একে বিদ্রোহ, বিপ্লব, গণঅভ্যুত্থান, কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ওপর। তবে এটি নিশ্চিত যে, এটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছিল এবং উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রথম সুসংগঠিত প্রকাশ।

১. বিদ্রোহ

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের একটি বড় অংশ একে 'সিপাহি বিদ্রোহ' (Sepoy Mutiny) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমিত একটি সামরিক বিদ্রোহ। স্যার জন সিলি একে 'সিপাহিদের ধর্মঘট এবং রাজাদের ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন (John Seeley, The Expansion of England)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, নেতৃত্বের অভাব এবং স্থানীয় সমর্থনের অভাবে বিদ্রোহটি ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশদের কাছে এটি তাদের শাসন ব্যবস্থার প্রতি সাময়িক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ছিল।

২. বিপ্লব

কিছু ঐতিহাসিক একে বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁদের মতে, এটি কেবল সামরিক বিদ্রোহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং কৃষক, জমিদার, মজুর এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এটিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা হিসেবে তুলে ধরে। রণজিৎ গুহের মতে, এটি ভারতীয় সমাজের ভেতরে চলমান সংঘাত এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সামগ্রিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ছিল (Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India)।

৩. গণঅভ্যুত্থান

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাটি একটি বৃহত্তর গণজাগরণ হিসেবেও দেখা যায়। এর পেছনে ছিল স্থানীয় রাজা, জমিদার, সিপাহি, কৃষক এবং সাধারণ জনগণের

[৭৪] The Communist Manifesto, Marx & Engels

সক্রিয় অংশগ্রহণ। বিপুল সংখ্যক মানুষ উত্তর ভারত, বিহার, বাংলা এবং মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। এভাবে এটি একটি গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। আর.সি. মজুমদার উল্লেখ করেছেন, 'এটি শুধুমাত্র সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল না; বরং এটি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি গভীর অসন্তোষ থেকে উদ্ভূত একটি বৃহত্তর গণসংগ্রাম ছিল।' (R.C. Majumdar, The Sepoy Mutiny and the Revolt of ১৮৫৭)।

৪. স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, এটি ছিল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (First War of Independence)। ভি.ডি. সাভারকার একে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম বৃহৎ প্রতিরোধ হিসেবে বর্ণনা করেন (V.D. Savarkar, The Indian War of Independence, ১৮৫৭)। বিদ্রোহের নেতা বাহাদুর শাহ জাফর, নানাসাহেব, তাতিয়া টোপি, রানি লক্ষ্মীবাই প্রমুখ জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত হন। কৃষক ও জমিদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতির প্রতি প্রতিক্রিয়া একে একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

ফলত আমরা বলতে পারি, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি অভ্যুত্থান একক কোনো শ্রেণিবিন্যাসে আবদ্ধ নয়। এটি ছিল বিদ্রোহ, বিপ্লব, গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সম্মিলিত রূপ। যদিও সামরিকভাবে এটি ব্যর্থ হয়েছিল, তবে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারত শাসন শুরু করে। পাশাপাশি, এটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত রচনা করে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এই ঘটনা ছিল ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক মোড়। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) একশ বছর পরে ভারতীয় উপমহাদেশে সিপাহি বিদ্রোহ নামে পরিচিত এই অভ্যুত্থান ঘটে। এই একশ বছরের ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় জনগণের জন্য এক শোষণ এবং বঞ্চনার সময় ছিল। পলাশীর যুদ্ধ দিয়ে যে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত হয়।

ইংরেজ শাসনের বিস্তার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ইংরেজ শাসন বাংলার মাটিতে পা রাখে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে এই শাসনের সূচনা হয়। এরপর ইংরেজরা ধীরে ধীরে বিহার, ওড়িশা, এবং

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে।

লর্ড ডালহৌসির আমলে (১৮৪৮–১৮৫৬) 'ল্যাপসের নীতি' বা Doctrine of Lapse প্রবর্তিত হয়। এই নীতির মাধ্যমে কোনো নিঃসন্তান দেশীয় শাসকের রাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হতো। ফলে ঝাঁসি, সাতারা, নাগপুরসহ অনেক রাজ্য ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেশীয় রাজাদের দুরবস্থা

সেসময় দেশীয় রাজারা নামমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করছিলেন। ইংরেজ শাসনের রক্তচক্ষুর সামনে তাঁদের গদির স্থায়িত্ব ছিল অনিশ্চিত। লর্ড ডালহৌসির নীতি শুধু রাজ্য গ্রাসেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দেশীয় রাজাদের মর্যাদাহানির কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, যিনি পরবর্তীতে সিপাহি বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁর রাজ্য ইংরেজদের দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুরবস্থা

কৃষি, যা ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল, তাও ইংরেজ শাসনের শোষণের শিকার হয়। কৃষকদের উপর ভূমি করের বোঝা চাপানো হয়, এবং তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। বিলাসী জীবনযাপন ও বিলাতি পণ্যের প্রচলনের জন্য ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এভাবে ভারতের অর্থনীতি পুরোপুরি ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়, যা জনসাধারণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের জন্ম দেয়।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিস্তার এবং শোষণের ফলে সারা ভারতের চেহারা বদলে যায়। এই শোষণমূলক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনোভাব এতটাই তিক্ত হয়ে ওঠে যে, ১৮৫৭ সালে এক সর্বাত্মক বিদ্রোহ শুরু হয়। এটি সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে পরিচিত হলেও, এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম স্ফুরণ।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাহাদুর শাহ জাফর সিংহাসনে আরোহণের দুই দশক পরে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এর পেছনে ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছলনাময় শাসন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আঘাত, এবং অর্থনৈতিক শোষণের কারণে সৃষ্ট তীব্র অসন্তোষ।

ব্রিটিশদের শোষণমূলক নীতি

পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর একশো বছরের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কৌশল, ষড়যন্ত্র এবং শক্তির মাধ্যমে পুরো ভারতবর্ষকে গ্রাস করে। দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীনতা

খর্ব করে একের পর এক রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে নিয়ে যাওয়া হয়। লর্ড ডালহৌসির 'ল্যাপস নীতি' দেশীয় রাজাদের রাজ্য ও ক্ষমতা কেড়ে নেয়, যা তাঁদের অপমানিত করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে দেয়। লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও জনগণের জীবনযাত্রায় আঘাত হানে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আঘাত

ব্রিটিশদের শাসনে ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে অবজ্ঞা করা হয়। সেনাবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিদের জন্য একই খাবার সরবরাহ করা, যেখানে গরু ও শূকরের চর্বি থাকার অভিযোগ উঠেছিল, তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি থাকার গুজব বিদ্রোহের প্রাথমিক উস্কানির কারণ হয়।

সিপাহিদের অসন্তোষ

ভারতীয় সিপাহিদের উপর ব্রিটিশদের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং কম বেতন তাদের ক্ষোভের জন্ম দেয়। বিদেশের মাটিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা তাঁদের মানসিকভাবে আরও বিদ্রোহী করে তোলে।

বাহাদুর শাহ জাফরের প্রতীকী নেতৃত্ব

যদিও বাহাদুর শাহ জাফর তখন কার্যত ব্রিটিশদের অধীনস্ত ছিলেন, সিপাহিরা তাঁকে এই বিদ্রোহের প্রতীকী নেতা হিসেবে ঘোষণা করে। তিনি ধর্মীয় এবং জাতিগত ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

বিদ্রোহের সূচনা

এই বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় পশ্চিমবঙ্গের দমদম সেনাছাউনিতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি। সিপাহিরা অভিযোগ করেন যে, এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো হয়, যা তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে। যদিও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করে, এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সেনাছাউনিতে।

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর সেনাছাউনিতে প্রথম বড় ধাক্কা আসে, যখন ১৯ নম্বর পদাতিক বাহিনীর সিপাহিরা কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁরা অস্ত্রাগার ভেঙে পুরনো মাসকেট বন্দুক সংগ্রহ করেন। উত্তেজিত সিপাহিদের নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হলেও, এই বিদ্রোহের বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

২৯ মার্চ, ব্যারাকপুরে সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ করেন। তিনি গুলি চালিয়ে এক ইংরেজ সার্জেন্টকে হত্যা করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৮ এপ্রিল ফাঁসি দেওয়া হয়। মঙ্গল পাণ্ডের আত্মত্যাগ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

মিরাট বিদ্রোহ ও দিল্লি অধিকার

মূল বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে ৯ মে, ১৮৫৭ সালে উত্তর প্রদেশের মিরাটে। সিপাহিরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং দিল্লির পথে অগ্রসর হন। ১১ মে দিল্লি অধিকার করে সিপাহিরা বহু ইংরেজকে হত্যা ও বিতাড়ন করেন। তাঁরা লালকেল্লায় প্রবেশ করে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে স্বাধীন ভারতের বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই মুহূর্ত থেকে বাহাদুর শাহ জাফর বিদ্রোহের প্রধান প্রতীক ও নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ উত্তর প্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং বাংলার জলপাইগুড়ি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহের বিস্তার

দিল্লি অধিকার করার পর বিদ্রোহ দ্রুত কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, ঝাঁসি, মথুরা এবং ইন্দোরে ছড়িয়ে পড়ে। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, কানপুরের নানাসাহেব, তাতিয়া টোপির মতো নেতারা বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। সাধারণ মানুষও এতে যোগ দেন। বিদ্রোহীরা রেললাইন উপড়ে ফেলে, টেলিগ্রাফের লাইন কেটে দেয়, এবং ব্রিটিশ ব্যারাক ধ্বংস করে দেয়।

ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের মূল্যায়ন

প্রথমদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা বিদ্রোহকে গুরুত্ব দেয়নি। তাঁরা একে স্থানীয় অসন্তোষ বা সিপাহিদের সাময়িক বিদ্রোহ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের অনেকেই একে 'সিপাহি বিদ্রোহ' (Sepoy Mutiny) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটি কেবল সিপাহিদের বিদ্রোহ ছিল না; বরং এটি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতজুড়ে অসন্তোষ ও বঞ্চনার প্রতিফলন।

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে, এটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (First War of Independence)। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং সিপাহিদের আত্মত্যাগ একে কেবল সামরিক বিদ্রোহের সীমা অতিক্রম করে একটি জাতীয় প্রতিরোধে রূপান্তরিত করে।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এটি কেবলমাত্র

সিপাহিদের বিদ্রোহ নয়, বরং এটি ছিল কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি সামগ্রিক প্রতিরোধ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, যদিও ব্রিটিশ ও কিছু দেশীয় ইতিহাসবিদ একে শুধুমাত্র 'সিপাহি বিদ্রোহ' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এই বিদ্রোহকে 'সিপাহি বিদ্রোহ' বলা কতটা সঠিক?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তীর মতো দেশীয় ইতিহাসবিদরাও এই বিদ্রোহকে 'সিপাহি যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। যদিও এই নামকরণ বিদ্রোহের প্রকৃত রূপ ও গভীরতাকে খাটো করে। কার্ল মার্ক্স এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (First War of Independence) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিদ্রোহটি শুরু করেছিল সিপাহিরা, তবে এতে কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, যা এটিকে সামগ্রিক গণ-আন্দোলনে রূপ দেয়।

ভূমি শোষণ ও কৃষক অসন্তোষ

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের যাত্রা শুরু হয়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশরা বাংলার অর্থনীতি ও রাজস্বের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ভূমি কর বৃদ্ধিসহ শোষণের নানা উপায় কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়।

এরিক স্টোকস মনে করেন, সিপাহি বিদ্রোহ এবং গ্রামীণ বিদ্রোহের মধ্যে একটি সংযোগ ছিল। তাঁর মতে, বিদ্রোহটি ছিল মূলত কৃষকদের সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ। যদিও স্টোকস মনে করেন, কৃষকদের বিদ্রোহের পেছনে স্থানীয় জমিদার ও ধনী কৃষকদের প্রভাব কাজ করেছিল।

অন্যদিকে, রণজিৎ গুহ তাঁর "Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India" গ্রন্থে দাবি করেন, বিদ্রোহে কৃষকেরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তাঁদের আত্মপরিচয় ও শোষণের প্রতি বিদ্রোহের চেতনা তাঁদের সক্রিয় করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের পাশাপাশি দেশীয় মহাজন, জমিদার এবং বেনিয়াদের ওপরও কৃষকেরা আক্রমণ করেছিল।

চাপাতি ও গুজব

রণজিৎ গুহ বিদ্রোহে 'চাপাতি বিতরণ' এবং গুজবের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেছেন। উত্তর ভারতে চাপাতি বিতরণ একটি বিশেষ প্রতীকী অর্থ বহন করত। মহামারি বা বড় বিপদের সময়ে গ্রামবাসীরা চাপাতি বিতরণ করত। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের আগে চাপাতি বিতরণ শুরু হয়, যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ

রাজনৈতিক সংগ্রামের ইঙ্গিত ছিল।

গুজবও বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। সিপাহিদের মধ্যে রটে যে ব্রিটিশরা এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মিশিয়ে তাদের ধর্ম কলুষিত করছে। পাশাপাশি, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যেও অপবিত্র উপাদান মেশানোর অভিযোগ ওঠে। গ্রামবাসীর মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় যে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের ১০০ বছর পূর্ণ হবে এবং একটি মহাবিদ্রোহে এই শাসন ধসে পড়বে।

বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট

সিপাহিদের বিদ্রোহের কারণ শুধুমাত্র ধর্মীয় বা আইডেনটিটির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের মাইনে এবং সুবিধা অত্যন্ত কম ছিল। ইউরোপীয় সৈন্যদের তুলনায় তাঁদের বেতন ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এসব অর্থনৈতিক বৈষম্যও বিদ্রোহের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীদের বহুমুখিতা

বিদ্রোহ সিপাহিদের মধ্য দিয়ে শুরু হলেও তা দ্রুত সাধারণ কৃষক, আদিবাসী, এবং স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধুনধির মতো আদিবাসী গোষ্ঠী এবং ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই কিংবা নানা সাহেবের মতো দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকা বিদ্রোহকে এক ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। ঝাঁসির রানীর বীরত্ব এখনো জনগণের মুখে মুখে মিথ হয়ে রয়েছে।

সিপাহি ব্যতীত কৃষক এবং জমিদারদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র উল্লেখ করেছেন যে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী চার বিদ্রোহীর জীবনের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত যে বিদ্রোহ শুধুমাত্র সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর প্রবন্ধ 'Four Rebels of ১৮৫৭'-এ এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

রণজিৎ গুহ তাঁর গ্রন্থ "Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India"-তে দেখিয়েছেন, কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়ন বিদ্রোহের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষকরা কেবল সিপাহিদের সমর্থন করেনি; তারা ব্রিটিশদের পাশাপাশি দেশীয় মহাজন, জমিদার, এবং বেনিয়াদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালিয়েছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৮৫৭

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা বিদ্রোহকে 'সেপয় মিউটিনি' হিসেবে চিহ্নিত করলেও, অনেক ভারতীয় এবং বিদেশি ইতিহাসবিদ এটিকে বৃহৎ গণবিপ্লব হিসেবে দেখেছেন।

শশীভূষণ: তিনি বিদ্রোহকে সিপাহি বিদ্রোহ এবং গণবিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সুপ্রকাশ রায়: বিদ্রোহকে তিনি 'মহাবিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেছেন।

পিসি যোশী: ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহকে তিনি 'জাতীয় বিদ্রোহ" হিসেবে দেখেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ Rebellion ১৮৫৭ এ বিভিন্ন মার্কসবাদী ধারার বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে।

তালমিজ খালদুন: তাঁর মতে, এটি দেশীয় ভূস্বামী ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই।

রুদ্রাংশ মুখার্জি: তাঁর 'Awadh in Revolt' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের সাথে কৃষিপ্রশ্ন গভীরভাবে জড়িত।

বিদ্রোহের নামকরণ ও প্রভাব

বিদ্রোহের প্রকৃত গভীরতা বোঝার জন্য এটিকে শুধুমাত্র 'সিপাহি বিদ্রোহ' বলে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। একে মহাবিদ্রোহ বা গণজাগরণ হিসেবে দেখানো প্রয়োজন। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও আমাদের অনেক স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক এবং ইতিহাসের রচনায় এই বিদ্রোহকে শুধুমাত্র সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

সিপাহি বিপ্লবের ফলাফল

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মাপের বিদ্রোহ। যদিও বাহ্যিকভাবে এটি সফল হয়নি, তবে এটি ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। মহাবিদ্রোহের দমন এবং এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের শাসননীতিতে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় গভীর প্রভাব ফেলে।

বিদ্রোহ দমন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া

মহাবিদ্রোহ দমনের সময় ব্রিটিশ সরকার অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে —

১. বিদ্রোহে জড়িতদের প্রকাশ্যে ফাঁসি, গুলি বা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

২. কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়ার মতো বর্বর শাস্তি দেওয়া হয়।

৩. দিল্লির অধিবাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এবং অনেক বিদ্রোহীকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

এই কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে তোলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে, এবং ভারতের শাসনভার সরাসরি

ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায়।

শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর রানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে নতুন শাসননীতি কার্যকর হয়। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল :

১. প্রশাসনিক পরিবর্তন

ক. ভারতের গভর্নর জেনারেলকে 'ভাইসরয়" বা রাজ-প্রতিনিধি উপাধি দেওয়া হয়।

খ. ভারতের জন্য একজন ভারত সচিব (Secretary of State for India) নিয়োগ করা হয় এবং তাকে সহযোগিতার জন্য ১৫ সদস্যের কাউন্সিল গঠন করা হয়।

গ. কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা শিথিল করা হয়; মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকারের ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়।

২. রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পরিত্যাগ

ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, দেশীয় রাজা-নবাবদের রাজ্যগুলো আর দখল করা হবে না। তাদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও সন্ধিগুলো রক্ষা করা হবে। স্বত্ববিলোপ নীতি চিরতরে রহিত করা হয়।

৩. সামরিক সংস্কার

বিদ্রোহে অংশ নেওয়া সৈন্যদের সংগঠন ভেঙে ফেলা হয়। ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কামান ও ভারী অস্ত্রের দায়িত্ব ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৪. ভারতীয়দের প্রতি নতুন নীতি

রানি ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন, ভারতীয়দের ধর্ম ও সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। যোগ্যতার ভিত্তিতে ভারতীয়দের সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের মতামত নেওয়ার কথা বলা হয়।

বিদ্রোহের প্রভাব এবং মুসলমানদের প্রতি দমননীতি

ব্রিটিশরা মনে করেছিল, মহাবিদ্রোহের নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল মুসলমানদের। তাদের ধারণা ছিল, মুসলমানরা মোগল সাম্রাজ্যের হারানো ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

১. মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

২. তাদের প্রতি দমনমূলক নীতি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চালু থাকে।

৩. মুসলমানরা সরকারি চাকরি, শিক্ষার সুযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়।

বিদ্রোহের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ রোপিত হয়। এটি ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে এবং পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে। যদিও বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল, তবে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে স্মরণীয়, যা ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে।

অধ্যাপক কে. আলী-র উক্তিটি ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সুন্দরভাবে তুলে ধরে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৫৭ সালে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভে এসে শেষ হয়েছিল। এটি একটি গভীর ও বিশদ বিশ্লেষণ, যেখানে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ শুধুমাত্র সামরিক যুদ্ধ ছিল না, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল, যা ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একত্রিত প্রতিরোধ ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা উদিত হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোকে এক নতুন পথ দেখিয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়কালেও অনেক আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, যেমন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, এবং অবশেষে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের 'চল যাও দেশ' আন্দোলন।

যদিও ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, তবে এটি ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। এতে শুধু সিপাহি নয়, দেশের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ যেমন কৃষক, জমিদার, বেনিয়া, রাজা-নবাবসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীও অংশ নিয়েছিল, যা এই বিদ্রোহকে বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তী সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতীয়রা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তারা আর বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকতে চায় না, এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতার

জন্য সংগ্রাম করার এক শক্তিশালী আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা তাদের শাসন কৌশলে পরিবর্তন আনে, যেমন ভারতীয়দের সঙ্গে সামান্য সমঝোতা ও তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার, তবে তারা এখনও ভারতীয়দের অধিকার পুরোপুরি মেনে নেয়নি। তবে, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছিল, এবং এটি ভবিষ্যতে স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি এক নতুন দিশা ও প্রেরণা দিয়েছিল।

অতএব, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ শুধুমাত্র এক সামরিক প্রতিরোধ ছিল না, এটি ছিল এক ঐতিহাসিক বাঁক, যা ভারতীয় জনগণের জাতীয়তার পরিচয়, শোষণ-বিরোধী মনোভাব এবং স্বাধীনতার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত থাকে, যা পরবর্তী সংগ্রামের জন্য শক্তির উৎস হয়ে কাজ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৮২)। ২.সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়। ৩. ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, প্রমোদ সেনগুপ্ত। ৪. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আহমদ ছফা। ৫. আজাদি আন্দোলন, ফজলে হক খায়রাবাদি। ৬. সিপাহী যুদ্ধের ট্রাজেডি, আনিস সিদ্দিকী। ৬. তাআরফে জামাআতে মুজাহিদিন (উর্দু), অধ্যাপক চৌধুরী আবদুল হাফিজ। ৭. তারিকে পাক ও হিন্দ (উর্দু), শাকিল আহমাদ রিদা। ৮. ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ড.আবদুল করিম।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহ নামে স্থান পেয়েছে। সে সময় অসংখ্য নাম-পরিচয়হীন সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে শক্তিশালী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে শামিল হয়েছিল—সে স্মৃতি আজও ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তথা উপমহাদেশের অধিবাসীদের মনকে নাড়া দেয়।

আত্মত্যাগ, বীরত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরকালই সম্ভ্রম আদায় করে এসেছে। তাই ১৮৫৭ সালের বিপ্লবীদের সম্পর্কে উপমহাদেশবাসীর এই শ্রদ্ধাভাব অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, উপমহাদেশব্যাপী অভূতপূর্ব এই উথালপাথালের দ্বিতীয় কোনো নজিরও ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসে খুব একটা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ওই বছরের ঘটনাবলি ঐতিহাসিকদেরও অনেক ভাবিয়েছে আর এখনো ভাবায়।

বই : ১৮৫৭ সিপাহি বিপ্লবের ইতিহাস
লেখক : মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান
প্রকাশনা : বাতায়ন পাবলিকেশন
ধরন : বোর্ডবাঁধাই
পৃষ্ঠা : ২২৪
মুদ্রিত মূল্য : ৩৬০ টাকা

উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব-বিদ্রোহ

বিপ্লব-বিদ্রোহ, গাদ্দারি কিংবা ইতিহাসের আড়ালের ইতিহাস

আইনুল হক কাসিমী

“ এই বিদ্রোহ একদিকে যেমন আরবদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল স্বাধীনতার, অন্যদিকে এটি সাইকস-পিকো চুক্তির মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডকে পশ্চিমা শক্তির হাতে তুলে দিয়েছিল। ”

— জেমস ব্যার, (*A Line in the Sand*)

“ এই বিদ্রোহ আরবদের নিজস্ব ইচ্ছার চেয়ে পশ্চিমা শক্তির পরিকল্পনা ও সহায়তার ফলাফল বেশি ছিল। ব্রিটিশরা উসমানি খিলাফতের প্রতি আরবদের আনুগত্য ভেঙে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। ”

— ইউজিন রোজ, (*The Middle East and the West*)

হিজাজের শাসনব্যবস্থা

ইসলামি শাসনামলে মক্কার স্থানীয় শাসককে ‘শরিফ’ বলা হতো। হজরত হাসান বিন আলি বিন আবু তালিব রা.-এর হাশিমি বংশধরগণই এই লকবে ভূষিত ছিলেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুলগ্ন পর্যন্ত প্রায় সহস্র বছর মক্কার শাসন এই শরিফদের হাতে ন্যস্ত ছিল। আব্বাসি খিলাফত, মামলুক সালতানাত ও উসমানি খিলাফতের অধীনে থেকে মক্কার শরিফগণ হিজাজের পবিত্র ভূমি শাসন করেছেন।

সে হিসেবে মক্কার শেষ শরিফ ছিলেন হুসাইন বিন আলি—জন্মেছেন উসমানি খিলাফতের রাজধানী শহর ইস্তাম্বুলে, ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। লেখাপড়ার পাঠও চুকিয়েছেন সেখানে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় হুসাইন বিন আলি মক্কার শরিফ মনোনীত হন। খোদ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তাকে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হুসাইন বিন আলিকে শরিফ বানিয়েছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট।

কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের কবলে খিলাফত ও পরিণতি

সময়টা ছিল খুবই নাজুক। জায়নবাদী ও ফ্রি-ম্যাসন ইহুদিদের দিকনির্দেশনায় গড়ে ওঠা 'কমিটি অ্যান্ড ইউনিয়ন প্রগ্রেস'-এর তরুণ তুর্কিরা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ইস্তাম্বুলে বড় হওয়া এবং সেখানে পড়ালেখার সুবাদে হুসাইন বিন আলির ব্যাপারে ভালো জানাশোনা ছিল সুলতানের। তা ছাড়া নাজুক ওই সময়ে যে কাউকে মক্কার শরিফ বানাতে চাননি সুলতান। সুলতানের মতো হুসাইন বিন আলিও 'কমিটি অ্যান্ড ইউনিয়ন প্রগ্রেস' ও তরুণ তুর্কিদের ঘৃণা করতেন। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে হুসাইন বিন আলিকে মক্কার শরিফ মনোনয়নের বছরেই সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ক্ষমতাচ্যুত হন।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের পর মূলত উসমানি খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। তখন থেকে শুরু হয় উসমানিদের ঘৃণ্য ইতিহাস। সেসময় থেকে 'কমিটি অ্যান্ড ইউনিয়ন প্রগ্রেস' ও তরুণ তুর্কি দলের তিন অদূরদর্শী নেতা—জামাল পাশা, আনোয়ার পাশা ও তালাত পাশার নেতৃত্বে উসমানি খিলাফত নামকাওয়াস্তে চলতে থাকে। এই খিলাফত কিন্তু সেই খিলাফত ছিল না। এটি ছিল পর্দার আড়াল থেকে পরিচালনাকারী জায়নবাদী ইহুদিদের পরিচালিত 'ডেড খিলাফত'।

এই তিন পাশাই উসমানি খিলাফতকে রসাতলে ডোবান। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জায়নবাদীদের কুপরামর্শে এই তিন পাশাই জোরপূর্বক উসমানি খিলাফতকে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পতনের দিকে ঠেলে দেন। জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও উসমানি খিলাফত মিলে হয়েছিল কেন্দ্রীয় শক্তি। অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া মিলে ছিল মিত্রশক্তি। যুদ্ধে মিত্রশক্তির হাতে একের পর পরাজিত হতে থাকে কেন্দ্রীয় শক্তি, হারাতে থাকে নিজেদের ভূখণ্ড। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—মক্কার শরিফ হুসাইন বিন আলি কিন্তু শুরু থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের অংশগ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন।

হিজাজের টালমাটাল রাজনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মক্কার শরিফের শাসনাধীন হিজাজ ছিল যুদ্ধ-আওতার বাইরে। ততদিনে লাগাতার হারের মাধ্যমে উসমানি খিলাফতের বিদায়বেলাও ঘনিয়ে আসছিল। এদিকে হারামাইন তথা মক্কা-মদিনাকে যতদিন পর্যন্ত উসমানি খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন করা না যাবে, ততদিন পর্যন্ত উসমানি খিলাফতকে কফিনে শুইয়ে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়া অসম্ভব, এটা খুব ভালো করেই জানত ব্রিটিশরা।

এর কারণ হিসেবে বলা যায়—মধ্যপ্রাচ্য ছিল উসমানি খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বিশেষ করে 'হিজাজ' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানেই মক্কা-মদিনা তথা হারামাইন

শারিফাইনের অবস্থান। এ দুটি স্থানকে ঘিরে গোটা মুসলিম উম্মাহর অনুভূতি আলাদা। এখান থেকে উসমানিদের তাড়িয়ে দিতে পারলে গোটা মুসলিমবিশ্বে তাদের সমর্থনে ভাটা পড়বে। কেননা এ দুটি স্থানকে কেন্দ্র করে যাদের শাসন হবে, মুসলিমবিশ্ব তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়বে। তাই উসমানি খিলাফতের এই আত্মাকে ছিঁড়েফুঁড়ে বের করে ফেলা ছাড়া ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না।

যেহেতু মক্কার শরিফ হুসাইন তিন পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত উসমানি খিলাফত সমর্থন করতেন না, সেহেতু এই সুযোগটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ব্রিটেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা টি ই লরেন্স (যিনি লরেন্স অব অ্যারাবিয়া নামে বিখ্যাত) নামের এক ব্রিটিশ গুপ্তচরকে নিয়োগ দেয় হিজাজে। তিনি আরবি ভাষা জানতেন। মাথায় আরবদের মতো ইগাল ও রুমাল এবং গায়ে আজানুলম্বিত জুব্বা পরতেন। ধুরন্ধর লোকটা অত্যন্ত কৌশলে শরিফ হুসাইনকে গোটা আরব জাহানের বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করতে থাকেন। এমনকি তিনি হিজাজের আরবদের মধ্যেও তুর্কি আধিপত্যের বিরোধিতার নামে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উসকে দেন।

একটি 'গোপন ঘনিষ্টতা' ও বিদ্রোহ

শরিফ হুসাইন বিন আলির পুত্র আবদুল্লাহর ঘনিষ্ঠতা ছিল ব্রিটিশ গুপ্তচর লরেন্সের সঙ্গে। এই গুপ্তচরের মাধ্যমে বাবার হয়ে যুবরাজ আবদুল্লাহ ব্রিটিশ হাইকমিশনার হেনরি ম্যাকমাহনের সঙ্গেও পত্র চালাচালি করতে থাকে। একদিকে চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে হিজাজে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দানা বাধছিল ঘোরতরভাবে। এদিকে তলে তলে শরিফ হুসাইনের পুত্রধন আবদুল্লাহও আবার ব্রিটিশদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গোছাতে ব্যস্ত ছিল।

যেহেতু মক্কার শরিফ হুসাইন বিন আলি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে উৎখাতকারী তিন পাশার নেতৃত্বাধীন এক ভিন্নরকম উসমানি খিলাফতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খিলাফতের হিস্সা নেওয়ার পক্ষেও ছিলেন না, আবার লাগাতার হারের মাধ্যমে উসমানি খিলাফতের বিদায়ঘণ্টাও শুনতে পাচ্ছিলেন; তাই এমন 'ক্লিনিক্যাল ডেড' খিলাফতের লাশকে কাফনে মোড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে কালক্ষেপণ করতে চাননি তিনি। আখের ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন হুসাইন বিন আলি নিজ হাতে মক্কায় তুর্কি কেল্লার ওপর গুলি ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন।

এ ঘটনার পর গোটা হিজাজে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। মক্কার শরিফের অধীন সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ ছিল আরব। তারা কথিত তুর্কি আধিপত্যের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিদ্রোহে শরিফ হুসাইনের পক্ষ নেয়। সামান্য কিছু তুর্কি সৈন্য নিয়ে উসমানি জেনারেল ফখরুদ্দিন পাশা শরিফ হুসাইনের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে থাকেন।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের চোরাবালিতে আটকে পড়া উসমানিরা শরিফের মোকাবিলার জন্য সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে পারেনি। অবশেষে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে শেষ হওয়া আরবদের মহাবিদ্রোহে শরিফ হুসাইন বিন আলি জয়লাভ করেন। এভাবেই হিজাজ উসমানি খিলাফতের হাতছাড়া হয়ে যায়।

অন্যদিকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই থেকে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধও ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর কেন্দ্রীয় শক্তির শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এতে করে উসমানিরা সম্মুখীন হয় এক মহাবিপর্যয়ের। খিলাফতের কোমর ভেঙে যায়। বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত খিলাফতের অধীন দেশগুলো নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ইউরোপীয়রাও খিলাফতের ভূমিগুলোকে 'নো ম্যান ল্যান্ড' বা 'রাজাবিহীন রাজ্য' ঘোষণা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পলিসি বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে থাকে। আর সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের পর থেকে তো মরণোন্মুখ উসমানি খিলাফতকে তারা ব্যঙ্গ করে 'অসুস্থ পুরুষ' নামে ডাকতই।

ব্রিটেনের উদ্দেশ্যমূলক কূটনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভের পর বিজিত অঞ্চলগুলোর ওপর নিজেদের ভাগবাটোয়ারা ঠিক করার জন্য ছয় মাস সময় নেয় তারা। এরপর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই রাজপ্রাসাদে পরাজিত কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে জার্মান ও বিজয়ী মিত্রশক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক বিতর্কিত ভার্সাই চুক্তি। দুই শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী ১৪ দফার ওই চুক্তিপত্রে অনেক কিছুই ছিল। বিশেষ করে উসমানি খিলাফতভুক্ত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলোকে ভাগবাটোয়ারা করা হয়। মিসর ও ফিলিস্তিনের দখল নেয় ব্রিটেন, সিরিয়ার দখল নেয় ফ্রান্স।

ভার্সাই চুক্তির পর ব্রিটেন ও তার মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে শরিফ হুসাইনের যে বিরোধ লাগার কথা ছিল, সেটা আর দেখা যায়নি। বরং হুসাইন বিন আলিকে গোটা আরব জাহানের বাদশাহ হওয়ার টোপ দিয়ে উসমানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করালেও চুক্তি অনুযায়ী তাকে আরবের কোন কোন ভূখণ্ডের মালিক বানানো হবে, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে রাখে ব্রিটেন। তেমনিভাবে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনেও ব্রিটেন যে তার শাসন মানতে চাচ্ছিল না, এটা দেরিতে হলেও বুঝতে পারেন আত্মপ্রবঞ্চিত হুসাইন বিন আলি।

ভার্সাই চুক্তির পর সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দখলদারি মেনে নিতে পারেননি হুসাইন বিন আলি। এখান থেকেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে তার বিরোধ স্পষ্ট হয়। কেননা উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হুসাইন চেয়েছিলেন হিজাজভিত্তিক একটি হাশিমি খিলাফত কায়েম করতে। এজন্য তিনি সিরিয়া, বিশেষ করে ফিলিস্তিন হাতছাড়া করতে মোটেও রাজি ছিলেন না। হাশিমি খিলাফতের জন্য মক্কা ও মদিনার পাশাপাশি বাইতুল মুকাদ্দাসেরও দরকার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা তার সেই স্বপ্ন নষ্ট করে দেয়।

তা ছাড়া ফিলিস্তিন নিয়ে জায়নবাদীদের কুমতলব খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হুসাইন বিন আলি। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের মতো তিনিও ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই মিত্রশক্তির প্রধান ব্রিটেন এই জঘন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। কেননা ব্রিটেনের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জায়নবাদী ইহুদি রাজনীতিবিদ ও বণিকদের মারাত্মক প্রভাব ছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর একটি চিঠির মাধ্যমে ব্রিটিশ নাগরিক ইহুদি ধনকুবের রথসচাইল্ডকে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমির আশ্বাস দিয়েছিলেন। ব্রিটেনের দেওয়া সেই কুখ্যাত ও অবৈধ বেলফোর ঘোষণার শিকার আজও ফিলিস্তিনি মুসলমানরা।

১৯১৬-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের আরব বিদ্রোহে হুসাইন বিন আলি জয়লাভ করার পর এই বিদ্রোহ সিরিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। হিজাজের পাশাপাশি সিরিয়া থেকেও উসমানিদের হটানো হয়। হুসাইন বিন আলি তার পুত্র ফয়সালকে সিরিয়ার সুলতান হিসেবে মনোনয়ন করেছিলেন। কিন্তু ভার্সাই চুক্তির পর ফ্রান্স সিরিয়া দখল করে নেয়। হুসাইন বিন আলি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চান। কিন্তু ফরাসিদের সামনে টিকতে পারবেন না এই বুঝ দিয়ে ব্রিটেন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নতুন যুদ্ধে জড়ানো থেকে বিরত রাখে। আর সিরিয়ার পরিবর্তে ফয়সালকে ইরাকের সুলতান মনোনয়ন করে।

অন্যদিকে ব্রিটেন হুসাইনের পুত্র আবদুল্লাহকে বানায় জর্ডানের বাদশাহ। বর্তমান জর্ডানের হাশিমি শাসকরা শরিফ হুসাইন বিন আলিরই বংশধর। আর এর মাধ্যমে ব্রিটেন হুসাইন বিন আলিকে হিজাজের মধ্যেই সীমিত রাখে। একটু খেয়াল করলে তাদের এই কূট-কৌশল আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ব্রিটিশরা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী হিজাজ, ইরাক ও জর্ডানে হুসাইন বিন আলির ক্ষমতা মেনে নিলেও কৌশলে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে তাকে দূরে রাখে। আর এখানেই চতুর ব্রিটেনের আসল রাজনীতি প্রকাশ পায়।

দাবার দ্বিতীয় চাল 'মুস্তফা কামাল পাশা'

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরণোন্মুখ উসমানি খিলাফতেও তিন পাশার দিন ফুরিয়ে আসে। বিশাল উসমানি সাম্রাজ্য ভেঙে খানখান হয়ে 'খিলাফত' তখন শুধু তুরস্কের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। প্রতীকীরূপে সুলতান ও খলিফা পদবি বাকি রাখা হয়। পর্দার আড়াল থেকে জায়নবাদী ইহুদিরা এতদিন তিন পাশাকে ব্যবহার করলেও এখন আর তাদের প্রয়োজন মনে করেনি। অদূরদর্শী তিন পাশাও তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আফসোস করেছিলেন। তবে স্রোত অনেক দূর গড়িয়েছিল, গত হয়েছিল বহু সময়।

এ সবকিছুর মধ্যেই হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয় মুস্তফা কামাল পাশা। দোনমে ইহুদি বংশোদ্ভূত খোদাদ্রোহী এই পাশা ততদিনে উসমানি সেনাবাহিনীর বড় একটা

অংশকে প্রভাবিত করে জিরো থেকে হিরো হয়ে যায়। তাকে মঞ্চস্থ করার পেছনে জায়নবাদী ও পশ্চিমাদের হাত ছিল। তার ভয়ে পালাতে হয় তিন পাশাকে। নানা নাটকীয় পদক্ষেপের পর অবশেষে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ সে চূড়ান্তভাবে উসমানি খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণা করে।

হাশিমি খিলাফতের ঘোষণা

১৯০৮-১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হুসাইন বিন আলি উসমানিদের পক্ষ থেকে মক্কার 'শরিফ' নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন বিদ্রোহ করার পর থেকে নিয়ে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মোট আট বছর তিনি মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাকে কেন্দ্র করে হিজাজের সুলতান বা বাদশাহ ছিলেন। এ সময়ে তার পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন জর্ডানের বাদশাহ। আর অন্য পুত্র ফয়সাল ছিলেন ইরাকের বাদশাহ। পিতা ও সন্তানরা মিলে হিজাজ, জর্ডান ও ইরাকের বিশাল মধ্যপ্রাচ্য শাসন করলেও ভূরাজনৈতিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিরিয়া থাকে ফ্রান্সের দখলে আর ফিলিস্তিন থাকে ব্রিটেনের অধীনে।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ উসমানি খিলাফত বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত হিজাজের বাদশাহ হুসাইন বিন আলি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেননি। মিত্রশক্তির হাতের পুতুল হওয়ার পরও তিনি উসমানি খলিফাকে সম্মান করতেন। যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন—এই খিলাফত ক্লিনিক্যাল ডেড হয়ে আছে, অতিশীঘ্রই এর লাশ দাফন করা হবে, তবুও প্রতীকীরূপে হলেও তো তখনো উসমানি খিলাফত বহাল ছিল, তাই তিনি সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন।

মুস্তফা কামাল পাশার উসমানি খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে হুসাইন বিন আলি সেই সুযোগ পেয়ে যান। উসমানি খিলাফত বিলুপ্তির মাত্র এক সপ্তাহ পর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ হিজাজের বাদশাহ হুসাইন বিন আলি নিজেকে মুসলিম উম্মাহর খলিফা বলে মক্কা ও মদিনাকে রাজধানী বানিয়ে গোটা আরব বিশ্বে এক আরবি হাশিমি খিলাফতের ঘোষণা দেন। রাজনৈতিকভাবে অস্থির বিশ্বে—বিশেষ করে সদ্য খিলাফতহারা মুসলিমবিশ্বে নতুন এই হাশিমি আরবি খিলাফতের ঘোষণা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। সবার মধ্যে ছিল তখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

মক্কা-মদিনার বড় বড় আলিমদের সমর্থন

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে আরব বিদ্রোহের মাধ্যমে হুসাইন বিন আলি যখন কাবাঘরের পাশে উপস্থিত হয়ে নিজেকে আরবের স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন, তখন সেখানে মক্কা ও মদিনার বড় বড় আলিম এবং বিভিন্ন গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ওই সময় সারা আরবের বাদশাহ হিসেবে তার হাতে বাইআত দেন মক্কার সবচেয়ে বড় হানাফি মুফতি আল্লামা আবদুল্লাহ সিরাজ। তার দেখাদেখি অন্যান্য

আলিম ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গও বাইআত দেন। এমনকি বাইআত দেন সিরিয়ার প্রখ্যাত আলিম ফুয়াদ আল-খতিবও। হুসাইন বিন আলির মন্ত্রীপরিষদ শাইখ আবদুল্লাহ সিরাজ, শাইখ আলি মালিকি, শাইখ ইউসুফ বিন সালিম, শাইখ মুহাম্মাদ আমিন, শাইখ আহমদ বানাজাহ-সহ সেই সময়ের বড় বড় আলিম নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

হুসাইন বিন আলি নিজেকে আরবের বাদশাহ থেকে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান ও ফিলিস্তিনসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তার প্রতি জোরালো সমর্থন আসে। আসতে থাকে বাইআতও। সেসব স্থানের আলিম-উলামা ও সাধারণ মুসলমান এই সংবাদ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে প্রচার করতে থাকে। কেননা আরবের এসব অঞ্চল কাছাকাছি হওয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল থাকায় এবং হুসাইন বিন আলিকে ভালোভাবে চেনার কারণে তাকে সমর্থন দেয়। সমর্থন দেওয়ার পেছনে আরও সবচেয়ে প্রভাবক কারণ ছিল বলা যায়, তার হাশিমি আরবি হওয়াটা।

দূরবর্তী আলিম ও মুসলিমদের বিরোধিতা

তবে বিপত্তি দেখা দেয় আরেক জায়গায়। হুসাইন বিন আলি এমন এক নাজুক সময়ে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন, যখন আরবের একাংশসহ মুসলিমবিশ্ব তার প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করত। মুসলমানদের মনে এই নেতিবাচক ধারণা বদ্ধমূল করতে তুর্কি ইত্তিহাদি ভের তরক্কি বা কমিটি অব ইউনিয়ন প্রগ্রেস পরিচালিত উসমানি সংবাদমাধ্যমগুলোর অবদান ছিল অনেক বেশি। এই ইয়াং তুর্কদের তৈরি বয়ান অনুসারে সংবাদমাধ্যমগুলো হুসাইন বিন আলিকে একজন গাদ্দার, ব্রিটিশদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে।

এই কারণে আরবের একাংশসহ মুসলিমবিশ্বের দূরের দেশগুলো হুসাইন বিন আলির খিলাফতকে মেনে নেয়নি। তারা বরাবরের ন্যায় তাকে একজন বিদ্রোহী, গাদ্দার ও অবৈধ খলিফা হিসেবেই চিত্রিত করে; এর বেশি কিছু নয়। আফ্রিকার মিসর ও মরক্কোতেও হুসাইনের বিরোধিতা হয়। সবচেয়ে বেশি বিরোধিতার সম্মুখীন হন হিন্দুস্তানি মুসলমানদের দিক থেকে। এখানে তো হুসাইনকে গাদ্দার জ্ঞান করে উসমানি খিলাফতকে পুনরুদ্ধারের জন্য জন্য রীতিমতো খিলাফত আন্দোলনেরও সূচনা হয়।

সেসময় সিরিয়া ছিল আলিম-উলামা বিশেষ করে হানাফি আলিমদের স্বর্গরাজ্য। সিরিয়ার বহু আলিম, রাজনীতিবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদ হুসাইন বিন আলিকে সমর্থন করলেও সিরিয়ার আলিম ও মুফতিরা তার খিলাফত মেনে নেননি। যদিও হুসাইন বিন আলির আসল বিরোধ ছিল জায়নবাদী ও পশ্চিমা প্রভাবিত ইত্তিহাদিদের সঙ্গে, তারপরও বাহ্যিকভাবে নামকাওয়াস্তে খিলাফতের মসনদে সমাসীন উসমানি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করে সিরিয়ার হানাফি মুফতি আল্লামা আবুল খাইর

আবিদিন, মাহমুদ আবুশ শামাত, শাইখ তাওফিক সুয়ুতি, শাইখ বদরুদ্দিন কিলানি, মুস্তফা যারকা প্রমুখ হুসাইন বিন আলির বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান করেন। একইসঙ্গে হুসাইন বিন আলির ঘোষিত খিলাফতকেও তারা অবৈধ ঘোষণা করেন।

বিরোধিতার নেপথ্যরহস্য

আসলে হুসাইন বিন আলির কপাল ছিল খারাপ। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ হয়েও তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের কাছে ঘৃণিত হয়ে যান। মধ্যপ্রাচ্যে বেশিরভাগ সমর্থন লাভ করলেও বিশ্বব্যাপী তিনি জায়নবাদী, ব্রিটিশ ও ইয়াং তুর্কদের সংবাদমাধ্যমগুলোর বদৌলতে গাদ্দার হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে যান। এটা এক তিক্ত সত্য যে, তিনি ছিলেন মিডিয়াসন্ত্রাসের শিকার। মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় গোটা মুসলিমবিশ্ব তার বাহ্যিকভাবে গাদ্দারি দেখলেও এর আড়ালে লুক্কায়িত বাস্তবতাটা আর তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি।

ওই সময় মূলত ইয়াং তুর্কদের স্বরূপ, তাদের লক্ষ্য, জায়নবাদী ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়গুলো সম্পর্কে মুসলিমবিশ্ব ছিল অসচেতন। ফলে হুসাইন বিন আলিকে তাদের ঘৃণা করাও স্বাভাবিক ছিল। তারা ইয়াংক তুর্কদের হাতে মরা লাশ হওয়ার পরও আগের মতো উসমানি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার তাগিদেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। অথচ বুঝতেই পারছিল না খিলাফতের আসল রুহ থেকে দূরে সরে যাওয়া এই ইয়াং তুর্কদের চেয়ে হাশিমি হুসাইন বিন আলি বহুগুণে উম্মাহর জন্য কল্যাণকর ছিলেন।

এদিকে নজদের শাসক শুরু থেকেই উসমানি খিলাফতের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ বজায় রেখেছিল। আলে সৌদ পরিবার হুসাইনকে আরবদের নেতা হিসেবে অনুপযুক্ত বলে আরব বেদুইন গোত্রগুলোর মধ্যে প্রচার করতে থাকে। এতে করে হুসাইন বিন আলি কুরাইশের হাশিমি বংশের অত্যন্ত সম্মানী একজন ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও আরব বেদুইনদের অপছন্দের তালিকায় পড়ে যান। বিপরীত দিক দিয়ে জাতপাতহীন ঐতিহ্যগতভাবে মরুদস্যু আলে সৌদ পরিবার আরবের বেদুইন গোত্রগুলোর সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। এভাবে হিজাজেও অকুণ্ঠ সমর্থনের অভাবে হুসাইন বিন আলির জন্য জমিন সংকীর্ণ হতে থাকে।

হিজাজের রাজনীতিতে শেষ ক্রীড়নক

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন ব্রিটেন তখন তার আসল চেহারা দেখাতে শুরু করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হুসাইন বিন আলির মতো একজন নিষ্ঠাবান শরিফকে দিয়ে বিদ্রোহ ঘটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে নিয়েছিল তারা ঠিকই, কিন্তু এবার খোদ হুসাইন বিন আলিকেই তারা নিজেদের স্বার্থের পথে বাধা হতে

দেখে পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে নানা চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। মধ্যপ্রাচ্য শুধু মুসলিমদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে ব্রিটেনের সহযোগিতায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরাও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এমনকি এক ভাগ ইহুদিদের কপালেও জোটে। আগেই বেলফোর ঘোষণার মাধমে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি দেওয়ার ওয়াদা করেছিল তারা। কিন্তু হুসাইন বিন আলি ব্রিটিশের সেই অসদিচ্ছা মানতে কিংবা বাস্তবায়ন করতে রাজি ছিলেন না। তিনি হিজাজ, জর্ডান, ইরাকের পাশাপাশি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মালিকানাও বুঝে নিতে চাচ্ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কোনোভাবেই তিনি সাবেক উসমানি খিলাফতভুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অঞ্চল হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না।

অবশেষে বাইতুল মুকাদ্দাস হাতছাড়া না করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে মনোমালিন্য বাধিয়ে ফেলেন হুসাইন বিন আলি। কিন্তু ধুরন্ধর ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনকে শরিফ হুসাইনের হাতে দিতে রাজি ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের বিপক্ষে। এখন তার হাতে ফিলিস্তিন ছেড়ে দিলে এখানে ইহুদি আবাসভূমি গড়ে তোলার সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে খেলার শুরুতে যে লোকটা ব্রিটিশদের হাতের মুঠোয় ছিল, সে এখন খেল খতম হওয়ার আগেই মুঠো থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ব্রিটেন পড়ে যায় মহাবিপাকে।

ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে হাশিমি বংশের এই লোক আরেক 'ভুল পদক্ষেপ' নিয়ে বসেছে। উসমানি খিলাফতের পর সে নিজেকে মুসলিমবিশ্বের নতুন খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে সূচনা করেছে হাশিমি আরব খিলাফত। ছয়শো বছর ধরে যে তুর্কি উসমানি খিলাফত পশ্চিমাদের ভৃত্য বানিয়ে রেখেছিল, তাদের মাথা ওঠাতে দেয়নি; সেই খিলাফতকে বিলুপ্ত করতে না করতেই হুসাইন যে হাশিমি আরব খিলাফত কায়েম করতে যাচ্ছেন, এটা তো ব্রিটেন ও তাদের সহযোগীদের গালে চপেটাঘাত করার মতো ব্যাপার ছিল। কারণ মক্কা ও মদিনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন এই খিলাফত কোনোভাবে টিকে যেতে পারলে পশ্চিমাদের কপালে খারাবি আছে। উসমানিদের চেয়েও আরও শোচনীয় অবস্থা করবে তাদের। সারা দুনিয়ার সব মুসলমান এই হাশিমি কুরাইশি খিলাফতকে অকুণ্ঠ সমর্থন করবে। এজন্য অঙ্কুরেই বিনাশ করে ফেলতে হবে একে। তাই পথের এই কাঁটা সরানোর চিন্তা থেকে ব্রিটেন নিজেদের চিরাচরিত পলিসি অনুযায়ী কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পথে এগিয়ে যায়।

সেই কাঁটা ছিল তৎকালীন নজদের শাসক আলে সৌদ। হুসাইনকে খেলার মাঠ থেকে লালকার্ড দেখিয়ে সেখানে তারা হাজির করে বাদশাহ আবদুল আজিজ আলে সৌদকে। এই আলে সৌদ এখনো পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে তাদের ক্রীড়নক হয়ে আছে।

সুলতান আব্দুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে ইয়াং তুর্কদের বিদ্রোহ

এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনের না-বলা কিছু কথা

মূল : মুহাম্মাদ আল জাওয়াদি । অনুবাদ : হাসান মাহমুদ

❝ সুলতান আব্দুল হামিদ খান ছিলেন একাধারে একজন দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও কঠোর শাসক। তার বিরোধিতায় ইয়াং তুর্করা যা করেছিল, তা সাম্রাজ্যের ভঙ্গুর ঐক্যকে আরও ভঙ্গুর ও দুর্বল করে তুলেছিল। ❞

— লর্ড কিনরস, (*The Ottoman Centuries*)

❝ ইয়াং তুর্কদের আন্দোলন এবং আব্দুল হামিদের বিরোধ; এটি মূলত দুটি দ্বন্দ্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ছিল : একদিকে পশ্চিমা প্রভাবিত আধুনিকীকরণ এবং অন্যদিকে ইসলামী ঐতিহ্য। ❞

— বার্নার্ড লুইস, (*The Emergence of Modern Turkey*)

সুলতান আব্দুল হামিদ এর বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল, নিকটতম অতীতে এটিকেই সর্বপ্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মজার ব্যাপার হলো—এই বিদ্রোহ সফল হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল, সুলতান আব্দুল হামিদের খোদাভীতি। সুলতান একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি চাইলেই এই বিদ্রোহ শক্তহাতে দমন করতে পারতেন। তবে তিনি কোনোভাবে চাননি, তাঁর হাতে কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরুক। (যেমনটা খলিফা উসমান রা. কুচক্রিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত এড়াতে সশস্ত্রভাবে তাদের দমনের চেষ্টা করেননি।)

তবে দুঃখজনক সত্য হলো, সুলতানের এই সরল-শুদ্ধতার সুযোগে বিদ্রোহীরা নির্মম খুনোখুনির পথ বেছে নেয়। পরবর্তী সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেটা লাখো নিরপরাধ মুসলমানদের নির্মম রক্তপাতের কারণ হয়েছে। শুরুতেই যদি গুটি কয়েক বিদ্রোহীকে দমন করা হতো, তাহলে হয়তো এই নির্মম বর্বরতার ক্ষেত্র তৈরি হতো না।

বিদ্রোহ দমন করা সত্যিই কি সম্ভব ছিল?

ইতিহাসের নথিপত্র ঘেঁটে আমরা যা জানতে পারি তা থেকে এটা বোঝা যায় যে, সশস্ত্রবাহিনীর একাংশের এই বিদ্রোহ নস্যাৎ করা সম্ভব ছিল। বিদ্রোহীরা নিজেদের পক্ষে জনমত তৈরির লক্ষ্যে নানারকম চটকদার ও আকর্ষণীয় স্লোগান ব্যবহার করেছিল। যেমন—'একতা ... উন্নয়ন... তুর্কি জাতীয়তাবাদ ... রাজনৈতিক সংস্কার' ইত্যাদি জৌলুসপূর্ণ বুলি। এসব চটকদার স্লোগান তুর্কিদের তুর্কি জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উসকানি দিয়েছে আর অন্যদের জাতীয়তাবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্যেকুলারদের উদ্বুদ্ধ করেছে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছে এটা বলে যে, এই বিদ্রোহ সফল হলে রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে; যেমনটা এর আগে অতীতে স্বল্পকালীন হলেও জেনেসারি আন্দোলনের সময় তারা লাভ করেছিল। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা তো এটাই যে, সুলতান আব্দুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে হওয়া এই বিদ্রোহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একেবারে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

এই বিদ্রোহের কারণে উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয়। এ ছাড়াও এর প্রভাব ছিল ধারণারও বাইরে। আন্তর্জাতিক ভারসাম্যও এর কারণে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। বরং এটাও যদি বলা হয় যে, উসমানি সাম্রাজ্যের বাইরের দুনিয়াতেই এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে, তাহলেও বোধহয় ভুল হবে না। এই অস্থিরতার রেশ ধরেই পরবর্তী সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী বৈশ্বিক অস্থিরতার পেছনেও এর প্রভাব ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে এই বিদ্রোহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির নেই। এই বিদ্রোহের ফলে ইউরোপে উসমানি খেলাফতের অধীন দেশগুলোতে যে প্রভাব পড়েছিল তা হচ্ছে, দেশে দেশে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সরব হয়েছিল। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল জাতিগত বিভক্তি। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল, এটাও অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই পরে বিবদমান পক্ষগুলোর নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে একের পর এক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ যেন ব্যারেলভর্তি বারুদে আগুন লাগার কারণে একের পর এক হতে থাকা বিস্ফোরণ।

লেভান্ট বা শাম অঞ্চলে বিদ্রোহ-পরবর্তী বিরূপ অবস্থা

তুরস্কের সীমান্তবর্তী লেভান্ট বা বৃহত্তর সিরিয়া অঞ্চলে এই অভ্যুত্থানের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করা হবে। উসমানি সাম্রাজ্যের নৌমন্ত্রী জামাল পাশা সিরিয়ায় একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাষ্ট্রবিরোধী

নেতৃবর্গকে আজ্ঞাবহ সামরিক আদালতে বিচারের মাধ্যমে গণহারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন তিনি। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় গণহত্যার এই ধারা আরব-আফ্রিকাসহ প্রায় সব দেশেই চর্চিত হয়েছে। রাষ্ট্র যখনই অভ্যন্তরীণ গৃহ-কোন্দলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, তখনই বিরোধীদের দমনে এমন গণহত্যা চালিয়েছে।

সিরিয়ায় উসমানি সাম্রাজ্যের ফেডারেল বা মিত্র শাসনের দুর্ভোগ

বৃহত্তর শাম তথা বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন ও জর্ডানে উসমানি নৌ-মন্ত্রী জামাল পাশার অনিয়ন্ত্রিত শাসনের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহ বর্ণনা তুলে ধরার জন্যে কবি ফারিস আল খুরির লিখিত কবিতার একটি পঙ্ক্তি উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তাকেও জামাল পাশা সেই দেশদ্রোহী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। কবি ফারিস আল খুরি বলেন—'ভাগ্যই তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, আর আমাকে পেছনে ছেড়ে গেছে।' অর্থাৎ তিনিও রাষ্ট্রের রোষানলে পড়েছিলেন, তারও ফাঁসি হতে পারত; তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় বেঁচে গেছেন। আর হ্যাঁ, বাস্তবে হয়েছেও তাই। সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনের জনগণের যাদেরই রাজনৈতিক কোনো সম্পৃক্ততা ছিল, তারা কোনো না কোনোভাবে জুলুমের শিকার হয়েছেন।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে দামেশক ও বৈরুত নগরী প্রত্যক্ষ করেছে এক রক্তাক্ত ট্র্যাজেডি। এদিন দামেশকে ৬ জন আর পরবর্তীতে বৈরুতে ১৪ আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। যদিও এই হত্যাযজ্ঞে ব্যক্তিগতভাবে জামাল পাশার হাত রয়েছে; কিন্তু ইতিহাস এটাকে তুর্কি-উসমাদিনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করেছে। তালাত পাশা—উসমানি সাম্রাজ্যের উজিরে আজম; জামাল পাশা—নৌমন্ত্রী, আর আনওয়ার পাশা ছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী। এই তিন পাশার কাছে একরকম জিম্মি হয়ে পড়েছিল উসমানি সালতানাত। কিন্তু পরিণতি কি হলো? জামাল পাশার মৃত্যু হয়েছিল সেই আর্মেনীয় আততায়ীদের হাতে। তালাত পাশাকে ইতিহাস ভুলে গেছে আর আনওয়ার পাশা পরবর্তীকালে নিজের ভুল স্বীকার করে সালতানাত রক্ষার লড়াইয়ে শহিদ হয়েছেন।

ইউরোপে এই বিদ্রোহের প্রভাব

বিদ্রোহের কারণে উসমানি সালতানাতের শাসনাধীন আরব-অঞ্চলগুলোতে রাজনৈতিক কী প্রভাব পড়েছিল—তার আলাপ ছেড়ে আসি ইউরোপের আলোচনায়। এই বিদ্রোহের কারণে ইউরোপে রাজনৈতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে নড়বড়ে হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর বেশি ইউরোপে রাজনৈতিক ভারসাম্য বহাল ছিল। যার কৃতিত্ব দিতে হয় ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথকে। ১৮৩৭ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৪ বছর তা স্থায়ী ছিল।

এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৎকালীন সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত এই স্থিতিশীলতা উসমানি সালতানাত, অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট ছিল। উসমানি সালতানাতের অভ্যন্তরীণ এই গোলযোগ এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন ব্রিটেন সমুদ্রের ওপর তার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের কারণে এই ভারসাম্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিল। আর ফ্রান্সও তখন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য নেপোলিয়ান সবরকম চেষ্টাই করছিলেন। দুঃখজনকভাবে সুলতান আব্দুল হামিদ খানের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোকে আরও ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল। আর সমগ্র ইউরোপের ভারসাম্যকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—১৭৯৮ সালের ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী নেপোলিয়ান-যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারে তার অবিরাম যুদ্ধের পরও ফ্রান্স প্রকৃতপক্ষে বিজয়ের স্বাদ নিতে পারেনি। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমীয় যুদ্ধে উসমানি ও ব্রিটিশদের (এবং তাদের সাথে মিশর ও তিউনিসিয়ার) সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার পরই তারা বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছিল। আর এই বিজয় আত্মতৃপ্তির এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ফ্রান্স সেটা অনেক গভীরভাবে অনুভব করেছিল আর ফরাসিরাও গর্বের সঙ্গে তা উদ্যাপন করেছিল।

সার্বিয়া ও বুলগেরিয়াকে ফরাসিরা তাদের দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করত। এ দুটি রাষ্ট্রকে তারা উসমানি সালতানাত, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নানাভাবে উসকে দিত। অন্যদিকে ব্রিটেন তার উপনিবেশিক মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদী সক্ষমতার কারণে এসব দ্বন্দ্বকে আখেরে নিজের স্বার্থে সামঞ্জস্য করতে পারত। এক্ষেত্রে ব্রিটিশরা বিশ্ব-পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করত। এতে অবশ্য তাদের স্বার্থ রক্ষিত হতো। আর তাই লক্ষ্য করা যায়, ব্রিটেনের মতামতই তদানীন্তন বিশ্বে শেষ কথা বলে গৃহীত হতো। এমনকি ফ্রান্স পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি ব্রিটেনের মতামত ও ইচ্ছার বাইরে পদক্ষেপ নিত না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফ্রান্স

ফরাসিরা সার্ব, স্লাভিয়ান, বুলগেরিয়ান, গ্রিক ও আর্মেনিয়ান অঞ্চলগুলোকে—যেগুলো উসমানিদের শাসনাধীন ছিল—উসমানি সালতানাতের বিরুদ্ধে সবসময় প্ররোচিত করত। জাতীয়তাবাদের আবেগ উসকে দিয়ে তাদেরকে উসমানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষেপিয়ে তুলত। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধেও এই দেশগুলোকেই তারা দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করত।

বাস্তবতা হলো—এরা জাতিতে ইউরোপীয়া হওয়ার কারণে সবসময় অঙ্গীকার ভঙ্গ করত; যা ইউরোপীয়দের মজ্জাগত স্বভাব ছিলও বটে। তুর্কিদের সঙ্গে ধর্মের

ভিন্নতার কারণে উসমানি সালতানাতের সঙ্গে তারা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কোনো কাজে পারতপক্ষে অংশই নিত না। এসব কারণ-উপকরণ একত্রিত হয়ে একসময় সব পক্ষের ঘৃণাই বেড়েছে। আর সেই ঘৃণা একসময় দাবানলের মতো কাজ করেছে। তবে ঐতিহাসিক সত্য তো এটাই যে, এই বিদ্রোহের ফলে তাদের কোনো লাভ হয়নি। কারণ ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর ধর্ম এক হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবাদ ও শ্রেণিবৈষম্যের যাঁতাকল থেকে তাদের সত্যিকারের মুক্তি মেলেনি।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও ইউরোপের ধূর্ততা

উসমানিরা ধর্মীয় ও আখলাকি নীতি-নৈতিকতার দায়বদ্ধতার কারণে প্রতিবেশী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার ছিল। সালতানাতের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে মাথা ঘামাত না তাদের নিয়ে। এর বিপরীতে ইউরোপ চরমপর্যায়ের সংকীর্ণমনা ছিল। বিশেষত ফ্রান্স তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে বেজায় অহংকারী ছিল। এ জন্য উসমানি সালতানাতের আশপাশের অমুসলিম জাতিগুলোকে উসমানিদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করাই যেন তাদের প্রধান কাজ ছিল।

ইউরোপের যে দেশগুলো উসমানি সালতানাতের শাসনাধীন ছিল, সেগুলো এখন স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে বাস্তবতা হলো—এসব দেশ ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে উসমানিদের থেকে আলাদা হয়নি; আলাদা হয়েছে কেন্দ্রীয় সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগে। সুলতান আব্দুল হামিদ খানের পদচ্যুতির পর ইউরোপের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলো সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিলে শুরু থেকেই এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রমের নিকুচি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সালতানাতের নিষ্ক্রীয়তার সুযোগে বিরোধী শক্তিগুলো এসব বিদ্রোহীদের নানাভাবে ইন্ধন যুগিয়ে যায়। আর সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, ম্যাসেডোনিয়া, গ্রিস, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ও মোল্দোভাতে এ সবকিছুরই পুনরাবৃত্তি হয়।

এর বাইরে তদানীন্তন তুর্কিদের আরেকটি সংকট ছিল—বাস্তবে ঘটে যাওয়া তিক্ত সত্যের দিকে নজর না দিয়ে, বরং তারা ঠুনকো সব বিষয় নিয়ে বারবার উত্তেজিত হতে থাকে। যার ফলে ইউরোপ-এশিয়ার বিস্তৃত দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী এই সালতানাত ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। সালতানাতের কিছু পদস্থ লোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর শত্রুদের ষড়যন্ত্রের উৎস ইয়াং তুর্কদের এই বিদ্রোহ সালতানাতের ভিত যেমন নড়বড়ে করে দিয়েছিল, তেমনিভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, অঞ্চল ও স্বার্থগত নানামুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতকেও উসকে দিয়েছিল। প্রলম্বিত করে তুলেছিল নানারকম সংকট আর সমস্যাও। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এই বিদ্রোহ আসলে কারও জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনেনি।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব

রক্তাক্ত দুই বিপ্লব, রাজতন্ত্রের পতন ও সমাজতন্ত্রের উত্থান

মূল : হিস্ট্রি ডট কম টিম। অনুবাদ ও সংযোজন : মাহিম দেওয়ান

❝ এই বিপ্লব ইতিহাসের একমাত্র উদাহরণ যেখানে শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের নেতৃত্ব সরাসরি একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ❞

— জন রিড, (*Ten Days That Shook the World*)

❝ লেনিন ছিলেন রুশ বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। তার নেতৃত্ব ছাড়া এই বিপ্লব সফল হতে পারত না। তবে তার কঠোরতা এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক মানসিকতা বিপ্লবের আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ❞

— রবার্ট সার্ভিস, (*Lenin: A Biography*)

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব ছিল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। এই বিপ্লব রাশিয়া থেকে রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটায় আর উত্থান ঘটায় এমন এক নতুন শাসনব্যবস্থার, যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় সাধারণ মানুষের মত, আবেগ, চিন্তা আর জনগণের ভোটে নির্বাচিত নেতৃত্বকে।

তদানীন্তন রাশিয়া ছিল এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত। একে তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে দেশটির অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, সংকট দেখা দেয় খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের; তারপর আবার সরকারের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে জনগণের মধ্যে জন্ম নেয় চরম হতাশা। এসব সমস্যার কারণে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের[৭৫] প্রতি জনগণের আস্থা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে আর তার শাসনের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকে বিরোধিতা ও অসন্তোষ।

---

[৭৫] সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস (Tsar Nicholas II) : তিনি ছিলেন রাশিয়ার শেষ সম্রাট এবং রোমানভ রাজবংশের সদস্য। ১৮৯৪ থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়া শাসন করেন। দুর্বল নেতৃত্ব ও জন-অসন্তোষের কারণে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত বিপ্লবের পর সিংহাসন হারান। আর পরবর্তী সময়ে পরিবারসহ নিহত হন।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বলশেভিক[৭৬] নামে একটি বিপ্লবী দল দৃশ্যপটে হাজির হয়। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন।[৭৭] জনগণের মধ্যে এক নতুন আশার আলো জ্বালান তিনি। আর এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার আওয়াজ তুলেন—যেখানে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তাদের প্রধান দাবি ছিল : 'রুটি, জমি আর শান্তি'। তাদের এমন গণমুখী দাবি সাধারণ মানুষের মন জয় করে নেয়। এতে অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে যায়।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর নাগাদ বলশেভিকরা রাশিয়ার রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এই বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই আনেনি, বরং সমাজের ভেতরেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যেমন, জমিদারদের জমি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ, শিল্প-কারখানাগুলো সরকারের অধীনকরণ এবং ধীরে ধীরে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। মজার বিষয় হচ্ছে, যে বলশেভিকদের হাত ধরে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়, তারাই পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত হয় এবং দীর্ঘ কয়েক বছর রাশিয়া শাসন করে। এই বিপ্লবের আদর্শ ও চিন্তাধারা যেমনই হোক—বাস্তবতা তো এটাই যে, তা শুধু রাশিয়ার ওপরই প্রভাব ফেলিনি, বরং প্রভাব ফেলেছিল বিশ্ব রাজনীতিতেও। এমনিভাবে তা অনেক দেশে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের উৎসও হয়ে উঠেছিল। আর পৃথিবীর বহু দেশে বিস্তার ঘটিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার।

রুশ বিপ্লবের সময়কাল

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ায় আসলে দুটি বিপ্লব ঘটে, যা শতাব্দীকাল ধরে চলা রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটায়। একইসঙ্গে রুশ জনগণকে স্বপ্ন দেখায় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্তের। এই বিপ্লব দুটির অনিবার্য ফল হিসেবেই শেষমেশ অস্তিত্বে আসে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব দুটি অল্প কয়েক মাসের ব্যবধানে ঘটলেও তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, রাশিয়ায় অনেক আগে থেকেই সামাজিক অস্থিরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ—একদিকে ছিল বিশাল

---

[৭৬] বলশেভিক (The Bolshevik Party) : এটি ছিল রাশিয়ার একটি বিপ্লবী দল, যার নেতৃত্ব ছিল ভ্লাদিমির লেনিনের হাতে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরের বিপ্লবে তারা রাজতন্ত্র ও অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতার বাগডোর হাতে নিয়ে নেয়। এ দলটিই পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

[৭৭] ভ্লাদিমির লেনিন (Vladimir Lenin) : তিনি ছিলেন রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা এবং বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্র উৎখাত করার মধ্য দিয়ে তার হাত ধরেই সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লেনিন পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম শাসক হিসেবে শাসনকার্যও পরিচালনা করেন। তার হাতেই কমিউনিস্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংখ্যক দরিদ্র কৃষক; আর অন্যদিকে দুরবস্থার শিকার শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে আর ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাধছিল। সবমিলিয়ে পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশই রাশিয়াকে পিছিয়ে পড়া এক অথর্ব রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল।

রুশ সাম্রাজ্য তখনো সার্ফডম তথা একটি ফিউডাল ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। এটি এমন একটি ব্যবস্থা—যেখানে ভূমিহীন কৃষকরা জমিদারদের জন্য কাজ করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ থেকেই তখন এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রুশ সাম্রাজ্যও সার্ফডম বাতিল করে দেয়, যার ফলে কৃষকরা স্বাধীনতা পায়। আর এই স্বাধীনতা তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়; পরবর্তী সময়ে যা রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণগুলো একটি হয়ে ওঠে।

কয়েক শব্দে বললে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিনের অস্থিরতা, ভঙ্গুর অর্থনীতি, সাধারণ মানুষের আর্থিক সমস্যা আর তার পাশাপাশি কৃষক ও শ্রমিকদের দুর্দশা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে যা অনেক বড় সমস্যা মনে হলেও পরবর্তী সময়ে তা রাশিয়ায় অনেক বিশাল এক পরিবর্তনের উপলক্ষ হয়েছিল। এ সবকিছুর বদৌলতেই মূলত ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবর মাসে দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। যার প্রথমটি ছিল সরাসরি জনগণের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফল, আর দ্বিতীয়টি ছিল বলশেভিক বিপ্লব—যা শুধু শাসনব্যবস্থাই নয়; বরং পুরো দেশেরই চেহারা বদলে দেয়।

সহজভাবে মূল্যায়ন করলে বলতে হয়—এই বিপ্লব শুধু রাশিয়ার ইতিহাসেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই ছিল এক নতুন রাজনৈতিক চিন্তার সূচনা এবং সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নশীল বিন্যাস।

রুশ বিপ্লবের কারণ ও পটভূমি

নিঃসন্দেহে রুশ বিপ্লব ছিল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা অনেক কিছুর কায়া বদলে দিয়েছিল। এই বিপ্লব কেন সংঘটিত হয়েছিল, তার পেছনে ছিল নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। একইসঙ্গে ছিল দীর্ঘ এক পটভূমিও। এখানে সহজ ভাষায় সেই প্রধান কারণগুলোর বিবরণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সেই পটভূমি তুলে ধরছি, যে পটভূমি একে একে বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করেছিল।

১. শিল্পবিপ্লব এবং সমাজে পরিবর্তন : রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় অনেক দেরিতে শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশশতাব্দীর শুরু দিকে ধীরে ধীরে রাশিয়ায় শিল্পায়ন শুরু হয়। ফলে সেন্ট পিটার্সবার্গ[৭৮]

[৭৮] সেন্ট পিটার্সবার্গ (Saint Petersburg) রাশিয়ার নেভা নদীর তীরে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক শহর। একসময়

ও মস্কোর মতো বড় বড় শহরগুলোতে জনসংখ্যাও খুব দ্রুত বাড়তে থাকে।

১৮৯০ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই এসব শহরের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই দ্রুত নগরায়নের কারণে তৈরি হয় এক নতুন শ্রেণি—শিল্পশ্রমিক শ্রেণি। তাদের জীবন ছিল অনেক কঠিন। তারা দীর্ঘ সময় কাজ করত, কিন্তু তারা পর্যাপ্ত মজুরি পেত না। তাদের থাকার জায়গাটুকু পর্যন্ত হতো ছোট, অস্বাস্থ্যকর এবং গাদাগাদি করা।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ায় জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তবে দেশের আবহাওয়া ও ভূগোল বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের কঠিন ঋতু তাদের ফসল উৎপাদনে সমস্যা তৈরি করতে থাকে। এতে জনগণের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-শস্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

তা ছাড়া যুদ্ধের খরচ এবং দুর্বল অর্থনীতি তাদের খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাও ততদিনে ভেঙে দিয়েছিল। দুঃখজনকভাবে এর ফলে তৈরি হওয়া ১৮৯১-১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের মাত্র এক বছরের দুর্ভিক্ষে প্রায় ৪ লাখ মানুষ মারা যায়; যা সমাজের মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা আরও বাড়িয়ে তোলে।

৩. ব্যর্থ যুদ্ধ ও সম্রাটের দুর্বল নেতৃত্ব : ১৯০৪-১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধ রাশিয়ার জন্য একটি বড় ধাক্কা সাব্যস্ত হয়েছিল। কারণ, রাশিয়া এই যুদ্ধে জাপানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং নিজেদের সৈন্য, অর্থ ও আন্তর্জাতিক সম্মান—এককথায় সবই হারায়।

এই পরাজয়ের ফলে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। আর সবার মনে প্রশ্ন ওঠে—কেন রাশিয়া এমনভাবে হেরে গেল আর কতকাল একজন সম্রাট একাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যাবেন?

৪. শিক্ষিত শ্রেণির অসন্তোষ : রাশিয়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছিল। তারা বুঝতে পারছিল, রাশিয়া পিছিয়ে আছে শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের দমনমূলক শাসনের কারণে। আসলে জারতন্ত্র এবং অভিজাত শ্রেণির শোষণ রাশিয়াকে আধুনিক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পথে বাধা দিচ্ছিল। অনেকেই তখন গণতন্ত্র, শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে একত্রিত হতে শুরু করেন। সবমিলিয়ে দেখা যায়—শিল্পায়নের কষ্ট, খাদ্যসংকট, যুদ্ধের ক্ষতি, কঠোর শাসন আর পশ্চিমের উন্নতির সঙ্গে নিজের দেশের তুলনার মতো বিষয়গুলো রুশদের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এটি রাশিয়ার রাজধানীও ছিল। শহরটি ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে পিটার দ্য গ্রেট প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তার ঐতিহ্য ও রাজকীয় স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব ও তার পূর্বাভাষ

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব ছিল রাশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বলা যায়, এই বিপ্লবই মূলত পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাভাষ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তার জন্য পথও সুগম করেছিল। এর সূচনা ২২ জানুয়ারির 'ব্লাডি সানডে' নামে পরিচিত এক হৃদয়বিদারক ঘটনার মাধ্যমে। সেদিন সেন্ট পিটার্সবার্গে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর জারের সেনারা নির্মমভাবে গুলি চালায় এবং শত শত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর গোটা রাশিয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী মাসগুলোতে শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক বিদ্রোহ এবং সেনাবাহিনীর একটা অংশের বিদ্রোহ; এ সবকিছু সেই বিপ্লবকে আরও ত্বরান্বিত করে তোলে। এই সময় শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'সোভিয়েত'[৭৯] বা কাউন্সিল গঠিত হয়, যা একটি নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে উঠে আসে। বিশেষভাবে পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজে[৮০] নাবিকদের বিদ্রোহের কথা না বললেই নয়। এটা সেনাবাহিনীর ভেতরের অসন্তোষকে পুরো পৃথিবীর সামনে নিয়ে আসে।

যদিও এই বিপ্লব সরাসরি রাজতন্ত্রকে উৎখাত করতে পারেনি, কিন্তু এর বদৌলতে শেষ পর্যন্ত জার দ্বিতীয় নিকোলাস সংস্কার আনতে বাধ্য হন এবং 'ডুমা'[৮১] নামের একটি সংসদ গঠনের প্রতিশ্রুতিও দেন। জারের এই সংস্কারকর্ম ছিল সীমিত ও প্রতীকী। রুশ বিপ্লবের মহান নেতা ভ্লাদিমির লেনিন একে অভিহিত করেন 'The Great Dress Rehearsal'[৮২] হিসেবে—কারণ, এটি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কাজ করেছিল।

---

[৭৯] সোভিয়েত (Soviet) : বা কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ এ দলটি ছিল শ্রমিক, কৃষক ও সেনা-প্রতিনিধিদের একটি দল, যা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের সময় গঠিত হয়। এটি তখনকার সময়ে রুশ জনগণের ঐক্য ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে।

[৮০] পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজ (Potemkin battleship) : এটি ছিল ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের কেন্দ্র। জাহাজের নাবিকরা খারাপ খাদ্য ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আর তখন থেকেই এই ঘটনা সামরিক শৃঙ্খলার অসন্তোষ এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।

[৮১] ডুমা (Duma) : এটি ছিল রাশিয়ার একটি নির্বাচিত আইনসভা, যা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের চাপে জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি সীমিত পরিসরে গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে গঠিত হলেও, প্রকৃত ক্ষমতা জারের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। এর অনিবার্য ফল হিসেবেই বলা যায়, এটি জনগণের বাস্তব প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়।

[৮২] এটি ভ্লাদিমির লেনিন ব্যবহার করেছিলেন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবকে বোঝাতে। কারণ তিনি একে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিমূলক পর্যায় বা 'মহা মহড়া' হিসেবে দেখতেন।

দ্বিতীয় নিকোলাস ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের রক্তক্ষয়ী বিপ্লব এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর, রাশিয়ার জনগণ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এককথায় সবার মধ্যে মারাত্মক এক অস্থিরতা তৈরি হয়। তখন পরিস্থিতি শান্ত করতে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস কিছু সংস্কার আনার প্রতিশ্রুতি দেন। জনগণকে বাকস্বাধীনতা দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। আরও প্রতিশ্রুতি দেন : তিনি 'ডুমা' নামে একটি সংসদ বা পরিষদ গঠন করবেন, যেখানে জনগণের মতামত শোনা হবে এবং সরকারের কাজে পরিবর্তন আনা হবে। যদিও 'ডুমা'-এর ক্ষমতা খুব বেশি ছিল না, তারপরও এটি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে বাকস্বাধীনতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, রাশিয়া সার্বিয়ার সমর্থনে মিত্রজোটে যোগ দেয়—যেখানে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি আর জাপানও ছিল। তারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, জার্মানি ও উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের শুরুতে রাশিয়ায় দেশপ্রেম ও উদ্দীপনা দেখা দিলেও, দ্রুতই যুদ্ধের ধকল ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি নির্মম বাস্তবতা হয়ে ধরা দেয়। এতে রাশিয়ার অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে, সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যায় এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছে, যা দেশটির জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে।

সামরিক দিক থেকে রাশিয়ার অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। তখন রাশিয়ার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। উন্নতির দিক দিয়ে ছিল তারা অনেক পিছিয়ে। তারপর আবার আধুনিক অস্ত্র বা প্রশিক্ষিত সেনা বলতেও বেশি কিছু ছিলনা তাদের। বিপরীতে, জার্মানি ছিল অনেক বেশি শিল্পোন্নত এবং শক্তিশালী ও সুসংগঠিত। এতে রাশিয়ার সেনারা যুদ্ধের ময়দানে একের পর এক তাদের অক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকে। সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল রুশ সেনাদের বিশাল প্রাণহানি—এই যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি ছিল অন্য দেশগুলোর তুলনায় সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৪ লাখ রুশ সেনা এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

একই সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থারও দ্রুত অবনতি হতে থাকে। অর্থনীতির ভঙ্গুরদশার কারণে দেশটি গভীর সংকটে পড়ে যায়। দেখা দেয় খাদ্য ও জ্বালানির তীব্র অভাব। হু হু করে দাম বাড়তে থাকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের। এর ফলও যা হওয়ার, তা-ই হয়। জনগণের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে। মজুরি না বাড়লেও জিনিসপত্রের চড়া দামের কারণে অনেক মানুষ না খেয়ে থাকে, শহরে বিক্ষোভ শুরু হয় আর শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে থাকে।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের সেই কঠিন পরিস্থিতিতে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সিদ্ধান্ত নেন, তিনি নিজেই রুশ সেনাবাহিনীর প্রধান হবেন। আর রাজধানী ছেড়ে সোজা যুদ্ধের

ময়দানে গিয়ে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত রাজনীতিতে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রশাসনের দায়িত্ব পড়ে সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার[৮৩] ওপর, যিনি সাধারণ জনগণের কাছে খুবই অজনপ্রিয় ছিলেন। এরচেয়েও বড় কথা, তাকে রাজদরবারের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত মনে করা হতো। তার ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা রাসপুটিনের[৮৪] প্রভাব এবং নানা বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে রাজপরিবারের প্রতি জনগণের আস্থা আরও কমে গিয়েছিল। ফলে একদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা, অন্যদিকে প্রশাসনের ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা; এ সবকিছু সারাদেশে মানুষের ক্ষোভকে ধীরে ধীরে চরম বিক্ষোভের রূপ দিতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত এই ক্ষোভ ও বিক্ষোভের পথ ধরেই রুশ বিপ্লবের পটভূমি তৈরি হয়।

রাসপুটিন ও জারিনা

যখন রাশিয়ার সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন, তখন দেশের দায়িত্ব উঠে আসে তার স্ত্রী জারিনা আলেকজান্দ্রার কাঁধে। কিন্তু আলেকজান্দ্রার প্রতি রুশ জনগণের তেমন বিশ্বাস ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা বিক্ষুব্ধ সেই সময়টাতে তার এই পরিচয় তাকে জনগণের মধ্যে আরও অপ্রিয় করে তুলেছিল। দায়িত্ব হাতে নেওয়া রপর আলেকজান্দ্রার একের পর এক সরকারি কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রতি অসন্তোষ আরও বেড়ে যায়।

জারিনার সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গুলোর মধ্যে একটি ছিল গ্রেগরি রাসপুটিনকে নিজের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা। রাসপুটিন ছিলেন এক রহস্যময় ও বিতর্কিত ধর্মগুরু, যার অলৌকিক শক্তি আছে বলে মনে করা হতো। তিনি রাজপরিবারের ওপর বিশেষ প্রভাব রাখতেন; বিশেষ করে জারিনার একমাত্র পুত্র অ্যালেক্সেইয়ের[৮৫] কারণে। অ্যালেক্সেই হেমোফিলিয়া নামের এক বিরল রক্তরোগে ভুগছিল, আর তার শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য জারিনা রাসপুটিনের অলৌকিক ক্ষমতার ওপর ভরসা করতেন।

---

[৮৩] সম্রাজ্ঞী আলেজান্দ্রা ফিওদোরভনা (Alexandra Feodorovna) : তিনি ছিলেন রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের স্ত্রী এবং জার্মান রাজকন্যা। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে নিকোলাসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ভূমিকা এবং গ্রেগরি রসপুটিনের প্রতি তার আস্থা রাজপরিবারের পতনের কারণগুলোর অন্যতম। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বলশেভিকদের হাতে পরিবারের সঙ্গে তিনি নিহত হন।

[৮৪] গ্রেগরি রাসপুটিন (Grigori Rasputin) : তিনি ছিলেন একজন ধর্মগুরু, যিনি অসুস্থ রাজপুত্রকে সুস্থ করার কারণে জার পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অনেক বেশি; যা রাজদরবারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। কিন্তু তাঁর বিতর্কিত ভূমিকা রাজপরিবারের জনপ্রিয়তাও কমিয়ে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

[৮৫] অ্যালেক্সেই নিকোলায়েভিচ (Alexei Nikolaevich) : তিনি ছিলেন রাশিয়ার শেষ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস ও সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার একমাত্র পুত্র।

রাসপুটিনের প্রভাব যত বাড়তে থাকে, ততই রাশিয়ার ধনী ও অভিজাতদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ে। তাদের মনে হতে থাকে, রাসপুটিন শুধু রাজনীতিতেই হস্তক্ষেপ করছেন না, বরং রাজপরিবারের সম্মানও নষ্ট করছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর কিছু রুশ অভিজাত মিলে তাকে হত্যা করে। ঘটনাটি ছিল খুবই নাটকীয় ও নির্মম—প্রথমে তাকে বিষ দেওয়া হয়, তারপর গুলি করে বরফঢাকা একটি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের সেই দিনগুলো নাগাদ দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধকলে ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ লাখ মৃত্যুর শিকার হয়েছে রাশিয়ার।

সবমিলিয়ে দেখা যায়, জনগণ জারের নেতৃত্বের ওপর পুরোপুরিভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। সরকারি দুর্নীতি পৌঁছে গিয়েছিল চরম সীমায় এবং অর্থনীতি ছিল অগ্রগতিহীন-ভঙ্গুর। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জারের পাগলামি। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর গঠিত সংসদ 'ডুমা'-য় তিনি ব্যাপক হস্তক্ষেপ করতেন। সংসদের মত তার বিরুদ্ধে গিলে কিংবা কোনো কারণে বনিবনা না হলে সরাসরি সংসদই ভেঙে দিতেন তিনি। তার এসব উদ্ভট কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এই পরিস্থিতিতে শুধু চরমপন্থীরা নয়, মধ্যপন্থী ও প্রগতিশীলরাও জারের খারাপ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারা নতুন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নেতৃত্বের দাবি করতে থাকে। যা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন শ্রেণি ও মতাদর্শের মানুষরা জারের পতনের পক্ষে একত্রিত হতে থাকে, আর এইভাবেই রুশ বিপ্লবের দিকে দেশ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

রাশিয়ায় তখন জুলিয়ান ক্যালেন্ডার[৮৬] ব্যবহৃত হতো, তাই এই ঘটনাকে বলা হয় 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব'। যদিও গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার[৮৭] অনুযায়ী তা মার্চ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ (জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৩ ফেব্রুয়ারি) পেট্রোগ্রাদ (সেন্ট পিটার্সবার্গ) শহরে এক বড় ধরনের গণআন্দোলন শুরু হয়। হাজার

---

[৮৬] জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (Julian Calendar) : এটি একটি প্রাচীন সূর্যভিত্তিক দিনগণনার ক্যালেন্ডার, যা ৪৫ খ্রিষ্টপূর্বে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রবর্তন করেন। এতে প্রতি বছর ৩৬৫.২৫ দিন ধরা হয়, ফলে প্রতি চার বছরে একদিন অতিরিক্ত যোগ করা হয়। তবে সময়ের পার্থক্যের কারণে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়, যা বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের দিনগণনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

[৮৭] গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার (Gregorian Calendar) : এটি ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ১৩তম গ্রেগরি প্রবর্তন করেন, যা জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ত্রুটি সংশোধন করে। এটি সূর্য বছরের সঠিক দৈর্ঘ্য ও সময় অনুসরণ করে এবং প্রতি চার বছরে একদিন অতিরিক্ত (অধিবর্ষ) যোগ করে। বর্তমানে এটি বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দিনগণনার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

হাজার মানুষ—বিশেষ করে নারীরা রাস্তায় নেমে এসে 'রুটি চাই, রুটি চাই' বলে স্লোগান দিতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে তখন রাশিয়ায় তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া এবং জ্বালানির অভাব ছিল আরও বেশি। এর সঙ্গে ছিল শ্রমিকদের দুরবস্থা, দারিদ্র্য ও সরকারের অকার্যকারিতা। এসব কারণে অনেক শিল্প শ্রমিকও ধর্মঘটে যোগ দেন। এতে কিছুদিনের জন্য দমে যাওয়া আন্দোলন আবারও চাঙা হয়ে ওঠে।

প্রথম দিকে নিরাপত্তাকর্মীরা আন্দোলন দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। ১১ মার্চ (জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৬ ফেব্রুয়ারি) পেট্রোগ্রাদে সেনাবাহিনীর একটি অংশকে বিক্ষোভ দমন করতে পাঠানো হয়। কিছু সৈন্য বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, এতে কয়েকজন নিহতও হয়। তারপরও আন্দোলন থেমে যায়নি, বরং জনগণের প্রতিবাদ আরও জোরালো হতে থাকে। ধীরে ধীরে সৈন্যদের মধ্যেও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। অনেক সৈন্য শাসকশ্রেণির আদেশ অমান্য করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এর ফলে রাজতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে ওঠে। চারদিকে চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে।

১২ মার্চ রাশিয়ার পার্লামেন্ট 'ডুমা' একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতে এর নেতৃত্বে ছিলেন প্রিন্স জর্জি লভ,[৮৮] পরে দায়িত্ব নেন আলেকজান্ডার কেরেনস্কি।[৮৯] এই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং রাশিয়াকে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে এগিয়ে নেওয়া। এর মাত্র কয়েকদিন পর অর্থাৎ ১৫ মার্চ (জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২ মার্চ) রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হন। এর মাধ্যমে রোমানোভ রাজবংশের প্রায় ৩০০ বছরের শাসনের অবসান ঘটে আর রাশিয়ায় সূর্যোদয় হয় এক নতুন শাসনব্যবস্থার।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়—এই ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল রুশ বিপ্লবের প্রথম ধাপ। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়; যদিও পরবর্তী সময়ে তা ব্যর্থ সাব্যস্ত হয় হয়। এরপর অক্টোবরে আবারও সংঘটিত হয় বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি ছিল বলশেভিকরা। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতেই ক্ষমতার বাগডোর চলে যায়। আর রাশিয়ায় শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পথচলা।

---

[৮৮] প্রিন্স জর্জি লভ (Prince Georgy Lvov) : তিনি ছিলেন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম প্রধান। তার চেষ্টা ছিল একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার, তবে তার সরকার শাসন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরে বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে।

[৮৯] আলেকজান্ডার কেরেনস্কি (Alexander Kerensky) : তিনি ছিলেন রাশিয়ার ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম নেতা এবং রাশিয়ান সমাজবাদী বিপ্লবী। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তার নেতৃত্বে সরকার দিনদিন বিপর্যয়ের দিকে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অক্টোবরে বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি।

আলেকজান্ডার কেরেনস্কি

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ডুমার মাধ্যমে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আলেকজান্ডার কেরেনস্কিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন তরুণ রুশ আইনজীবী। তার হাত ধরে একটি উদার গণতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রবর্তন হয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাকস্বাধীনতা, সমতা, আইনানুবর্তিতা, শ্রমিক দল গঠন এবং ধর্মঘটের অধিকার। কেরেনস্কি ও তার সমর্থকরা সহিংস বিপ্লবের বিরোধী এবং শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন।

যুদ্ধমন্ত্রীর পদে থাকাকালীন কেরেনস্কি রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় রাশিয়াকে বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে বলেন; যদিও মানুষের মধ্যে এর বিরোধিতা ছিল তীব্র ও ব্যাপক। তার এই সিদ্ধান্ত রাশিয়ার খাদ্য সরবরাহ সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এর ফলও যা হওয়ার, তা-ই হয়। জনগণের মধ্যে অস্থিরতা দিনদিন শুধু বাড়তেই থাকে, কৃষকরা জমির দখল নিতে শুরু করে আর শহরগুলোতে খাদ্যসংকটের কারণে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হয়ে যায় প্রতিদিনের রুটিন।

কেরেনস্কির এই পদক্ষেপগুলো রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ এক বিক্ষুব্ধ রূপ ধারণ করেছিল। কারণ জনগণ যুদ্ধের তীব্রতা এবং খাদ্য সংকটের জন্য সরকারকে দোষারোপ করছিল। এমন সংকটাপন্ন অবস্থাতেই বলশেভিকদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী শক্তির উত্থান ঘটতে শুরু করে, যা পরবর্তী সময়ে রাশিয়াকে একটি ঐতিহাসিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়।

বলশেভিক বিপ্লব

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ও ৭ নভেম্বর[৯০] বিপ্লবীরা বলশেভিক পার্টির নেতা ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে ডুমার অধীনে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে সরানোর জন্য এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান ঘটায়। অন্তর্বর্তী এই সরকার রাশিয়ার পুঁজিবাদী শ্রেণির কিছু নেতার অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল তখন। পর্দার আড়াল থেকে তারাই সবকিছু কলকাঠি নাড়ছিল। কিন্তু লেনিন এর পরিবর্তে একটি সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান—যেখানে সৈন্য, কৃষক ও শ্রমিকদের কাউন্সিল সরাসরি দেশ শাসন করবে এবং যেখানে সুবিধাভোগী ও দুর্নীতিবাজদের কোনো জায়গা থাকবে না।

বলশেভিকরা তাদের মিত্র ও অনুসারীদের সঙ্গে সমন্বয় করে পেট্রোগ্রাদ শহরের সরকারি ভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। কালবিলম্ব না করে তারা একটি

---

[৯০] জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে ২৪ ও ২৫ অক্টোবর, তাই এটি 'অক্টোবর বিপ্লব' নামেও পরিচিত।

নতুন সরকারও গঠন করে ফেলে। এই সরকারের প্রধান নিযুক্ত করা হয় লেনিনকে। এর মাধ্যমে, লেনিন বিশ্বের প্রথম কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন।

এই বিপ্লব রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পুরো কাঠামোকেই বদলে ফেলে। সেখানে শ্রমিক ও কৃষকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বলশেভিক বিপ্লবের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন[৯১] গঠিত হয়, যা বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার হিসেবে পরিচিতি পায়। বলশেভিকদের এই সফল বিপ্লব বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে। একদিকে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে শাসকশ্রেণির প্রতিও মানুষ আগে থেকে আরও সতর্ক মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। সর্বোপরি—এই বিপ্লবের প্রভাব পুরো বিশ্বকে আন্দোলিত করেছিল; পরবর্তী সময়ে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইতিহাসেরও গতিপথ নির্ধারণেও পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে সংঘটিত রুশ বিপ্লবের পর দেশে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ; ইতিহাসে যা 'রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ' (Russian Civil War) নামে পরিচিত। এই সংঘাতের মূল কেন্দ্র ছিল বলশেভিকদের নেতৃত্বাধীন রেড আর্মি বা রেড আর্মি[৯২] এবং তাদের বিরোধী হোয়াইট আর্মি বা সাদা বাহিনীর[৯৩] মধ্যে। তবে এটি কেবল দুটি পক্ষের মধ্যকার সাধারণ কোনো ক্ষমতার লড়াই ছিল না—বরং এর গভীরে ছিল মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং রাশিয়ার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের প্রশ্ন।

রেড আর্মি ছিল ভ্লাদিমির লেনিনের বলশেভিক সরকারের পক্ষে, যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছিল। তারা চেয়েছিল রাশিয়ার বিত্তশালী, অভিজাত, জমিদার ও শিল্পপতীদের মালিকানা বিলুপ্ত করে শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে ক্ষমতা

---

[৯১] সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR) : এটি ছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রধান ফেডারেশন, যা ১৯২২ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোভিয়েত ১৫টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত ছিল এবং বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি ভেঙে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র মানচিত্রে যোগ হয়।

[৯২] The Red Army (রেড আর্মি) : এটি ছিল রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সামরিক বাহিনী, যা ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে বলশেভিকদের নেতৃত্বে গঠিত হয়। এটি গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষক ও শ্রমিকদের সমর্থন পাওয়া এই বাহিনী আদর্শগতভাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিল এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বলশেভিকদের বিজয়ে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

[৯৩] The White Army (হোয়াইট আর্মি); এটি ছিল রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় বলশেভিক বিরোধী সামরিক শক্তি, যা জারের সমর্থক, উদারপন্থী ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রবিরোধী গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। এই বাহিনী মূলত পুরোনো শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বিদেশি শক্তির সমর্থন সত্ত্বেও তাদের অভ্যন্তরীণ বিভাজন এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কৌশলের অভাবে তারা সফল হতে পারেনি।

তুলে দিতে। অপরদিকে হোয়াইট আর্মি ছিল বলশেভিকদের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর এক জগাখিচুড়িমার্কা ঐক্য—যার মধ্যে ছিল রাজতন্ত্রবাদী, পুঁজিবাদী, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী এবং প্রাক্তন জারবাদী সামরিক কর্মকর্তারা। তাদের লক্ষ্য ছিল বলশেভিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে পূর্বের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

এই গৃহযুদ্ধে শুধু দেশের ভেতরের পক্ষগুলোই নয়, অনেক বিদেশি শক্তিও জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপানসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ হোয়াইট আর্মিকে অস্ত্র, অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। তারা কমিউনিজমের প্রসারে আতঙ্কিত ছিল এবং রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুলাই এক বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে পুরো বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে যায়—বলশেভিকরা রোমানভ রাজবংশের সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস ও তার পুরো পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ঘটনা হোয়াইট আর্মির জন্য ছিল অনেক বড় এক ধাক্কা, আর রেড আর্মির চোখে এটি ছিল রাজতন্ত্রের শেষ পরিণাম।

পাঁচ বছর ধরে চলা এই গৃহযুদ্ধের শেষ হয় ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, রেড আর্মির জয়ের মধ্য দিয়ে। বলশেভিকরা তখন দৃঢ়ভাবে ক্ষমতার দখল নেয়। এর পরেই গঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই নতুন রাষ্ট্রটি একদলীয় শাসন ও কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার পথে এগিয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচক্ষণ সব পদক্ষেপের ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন এক যুগের সূচনা হয়। কমিউনিজম শক্তিশালী একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা পরবর্তী সময়ে যা বিশ্বের আরও কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টি হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শীতল যুদ্ধের (Cold War) রূপে সূচনা করে—এক দীর্ঘতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার।

উৎস গ্রন্থ :

১. দ্য রাশান রেভোলিউশনস অব ১৯১৭। আনা এম. সিনসিয়ালা, ইউনিভার্সিটি অফ কানসাস। ২. দ্য রাশান রেভোলিউশন অব ১৯১৭। ড্যানিয়েল জে. মেইসনার, মারকুয়েট ইউনিভার্সিটি। ৩. রাশান রেভোলিউশন অব ১৯১৭। ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি। ৪. রাশান রেভোলিউশন অব ১৯০৫। মার্কসিস্টস.অর্গ। ৫. দ্য রাশান রেভোলিউশন অব ১৯০৫ : হোয়াট ওয়্যার দ্য মেজর কজেস? নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। ৬. টাইমলাইন অব দ্য রাশান রেভোলিউশন। ব্রিটিশ লাইব্রেরি।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের চীনা বিপ্লব

জনতার বিপ্লব, বিপ্লবের সফলতা ও চীনের উত্থান

মূল : অ্যালান উডস । ভাষান্তর : ফাহাদ আবদুল্লাহ

❝ চীনা বিপ্লব ছিল এমন একটি আন্দোলন—যা শুধু চীনকে নয়, পুরো এশিয়াকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ❞

— এডগার স্নো, (*Red Star Over China*)

❝ বিপ্লব পরবর্তী চীনকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা আধুনিকীকরণের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ❞

— মার্টিন জ্যাক, (*When China Rules the World*)

মার্কসবাদীদের কাছে চীনা বিপ্লব হচ্ছে মানব-ইতিহাসের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ও মহিমাবিজড়িত ঘটনা। আর প্রথমটি হচ্ছে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে শোষিত মানবেতর জীবন যাপন করা লাখো চীনা জনতা মুক্তির দিশা পেয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অপমানজনক শৃঙ্খল ভেঙে তারা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল।

১৯২৫-২৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম চীনা বিপ্লব প্রকৃত অর্থেই একটি শ্রমিক-বিপ্লব ছিল। কিন্তু স্ট্যালিন (Joseph Stalin) ও বুখারিনের[১৪] ভুল নীতির কারণে তা ব্যর্থতার মুখ দেখে। চীনের শ্রমিক শ্রেণিকে তারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের[১৫] প্রধান চিয়াং কাই-শেকের অধীন হতে বাধ্য করেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তখন বুর্জোয়া কুওমিনতাং (কেএমটি) পার্টির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এরচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার

[১৪] নিকোলাই বুখারিন (Nikolai Bukharin) : তিনি ছিলেন সোভিয়েত রাজনীতিবিদ ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেও পরে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। তিনি 'সামাজিকতাবাদ এক দেশে' তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন।

[১৫] এখানে 'তথাকথিত গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া' বলে বোঝানো হয়েছে তদানীন্তন চীনের অভিজাত শ্রেণি ও চিয়াং কাই-শেকের অনুগত কুওমিনতাং গোষ্ঠীকে।

ছিল, স্ট্যালিন চিয়াং কাই-শেককে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে আমন্ত্রণ জানান।

এই ভুল নীতির কারণে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে এক ভয়াবহ পরাজয় ঘটে কমিউনিস্টদের, যখন এই তথাকথিত 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রপন্থী' চিয়াং কাই-শেক সাংহাইয়ে (Shanghai) কমিউনিস্টপন্থী শ্রমিকদের ওপর এক বর্বর গণহত্যা চালান। বলা যায়, এখানেই ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ধাপ রচিত হয়। চীনা শ্রমিক শ্রেণির এই ভেঙে পড়া পরবর্তীকালে চীনা বিপ্লবের চরিত্র ও ধরন নির্ধারণ করে দেয়। এই গণহত্যার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কমিউনিস্ট পার্টির অবশিষ্টাংশ কোনোরকম গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়। এরপর তারা সেখান থেকেই কৃষক শ্রেণির সাহায্যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। তাদের এই কর্মপন্থা সামগ্রিকভাবে বিপ্লবের পুরো গতিপথকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে দেয়।

বুর্জোয়াদের পচন ও অবক্ষয়

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব সফল হয় মূলত চীনের সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের অচলাবস্থার কারণে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সাংহাইয়ের শ্রমিকদের রক্ত ও লাশের ওপর দিয়ে ক্ষমতার দখল নেওয়া বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাই-শেকের হাতে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য দুই দশকের মতো সময় ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, শেষপর্যন্ত চীন আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল থেকে যায়। কৃষকদের সমস্যা থেকে যায় অমীমাংসিত, পুরো দেশটির অবস্থা হয়ে যায় আধা-সামন্তবাদী ও আধা-ঔপনিবেশিক। চীনা বুর্জোয়া ও অন্যসব সম্পদশালী শ্রেণি এই সাম্রাজ্যবাদের হর্তাকর্তা ছিল। আরও স্পষ্ট করে বললে, নিজেদের স্বার্থের সুরক্ষার জন্য তারা সব ধরনের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গড়ে তুলেছিল।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জাপানি সাম্রাজ্যবাদীরা মাঞ্চুরিয়া (Manchuria) আক্রমণ করলে চীনা বুর্জোয়া শ্রেণির দুর্বলতা ও অবক্ষয় আরও প্রকট হয়ে ওঠে। জাপানি দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি) চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন কেএমটির সঙ্গে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেয়। তবে বাস্তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সিপিসি ও কেএমটির মধ্যে কার্যকর কোনো সহযোগিতা আদান-প্রদান হয়নি। এই তথাকথিত মৈত্রীসম্পর্ক কেবল কাগজে-কলমেই ছিল, বাস্তবে তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো কার্যকর সম্পর্ক বা তার রূপরেখা দেখা যায়নি।

জাপানের বিরুদ্ধে চীনের লড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিগর্ভের পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বড় অংশই কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে কেএমটি বরাবরই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

নিয়ে সরব ছিল। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে চিয়াং কাই-শেক সিপিসির সামরিক শাখার নিউ ফোর্থ আর্মিকে আনহুই (Anhui) ও জিয়াংসু (Jiangsu) প্রদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা জারি করেন। ফলে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)[৯৬] ও চিয়াং-এর বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এবং কয়েক হাজার সেনার প্রাণহানি ঘটে। আর এর মধ্য দিয়েই তথাকথিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের কাগজে-কলমে হওয়া সম্পর্কেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও স্ট্যালিনের কমিউনিস্ট রাশিয়ার ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। এ দুই পরাশক্তির মধ্যে সংঘাতের সূচনাও বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৯ আগস্ট সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়াতে জাপানিদের বিরুদ্ধে একটি আকস্মিক অভিযান চালায়। এই অভিযানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হাতে জাপানি সেনাদের মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হতে হয়। যার অনিবার্য ফল হিসেবেই মাঞ্চুরিয়ার দখল চলে যায় সোভিয়েত সেনাদের হাতে। এরচেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানরত ৭ লাখ জাপানি সেনা আত্মসমর্পণ করে আর রেড আর্মি মাঞ্চুকুও,[৯৭] মেনজিয়াং,[৯৮] উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ সাখালিন (South Sakhalin) ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ (Kuril Islands) জয় করে নেয়।

জাপানের কোয়ানটাং আর্মির দ্রুত পরাজয়ের বিষয়টি ইতিহাসে তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হলেও এটিই মূলত জাপানের আত্মসমর্পণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই পরাজয় এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনাতেও বড় প্রভাব ফেলেছিল। মার্কিনিরা তখন আশঙ্কা করেছিল যে, সোভিয়েত রেড আর্মি চীনের মধ্য দিয়ে জাপানে প্রবেশ করতে পারে, যেমনটা তারা এর আগে পূর্ব ইউরোপে করেছিল। জাপান শেষ পর্যন্ত হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন বিমানবাহিনীর পরমাণু বোমা হামলার পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তবে মার্কিনিদের এই ধ্বংসাত্মক হামলার মূল উদ্দেশ্য শুধু যুদ্ধ শেষ করা ছিল না; বরং এটি ছিল স্ট্যালিনকে এই মর্মে হুঁশিয়ারি দেওয়া যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আর যেমন-তেমন কোনো পরাশক্তি নয়। তাদের হাতে রয়েছে এখন খুবই শক্তিশালী ও ভয়ঙ্কর এক নতুন অস্ত্র।

---

[৯৬] পিপলস লিবারেশন আর্মি (People's Liberation Army) : পিপলস লিবারেশন আর্মি হলো চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি)-এর সশস্ত্র শাখা—যা ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি চীনা বিপ্লবের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেয়। এটিই মূলত আধুনিক চীনের সামরিক বাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

[৯৭] মাঞ্চুকুও (Manchukuo) : এটি ছিল জাপানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পুতুল রাষ্ট্র, যা ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

[৯৮] মেনজিয়াং (Mengjiang) : এটিও জাপানের মদদপুষ্ট একটি মঙ্গোলীয় রাষ্ট্র ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যা উত্তর চীনের মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত বাহিনীর অভিযানের সময় এটি জাপানি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় চীনা ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের শর্ত অনুযায়ী—যা যুক্তরাষ্ট্র ঠিক করে দিয়েছিল—জাপানি সেনাদের চীনের দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে কমিউনিস্টদের কাছে নয়, বরং চিয়াং কাই-শেকের সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুধুমাত্র মাঞ্চুরিয়ায় জাপানিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যার কারণ ছিল সেখানে কেএমটির কোনো বাহিনী ছিল না। চিয়াং কাই-শেক জাপানিদেরকে তাদের অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেন—যাতে কমিউনিস্টরা নয়; কেএমটির সেনারা তাদের কাছ থেকে অস্ত্রগুলো গ্রহণ করতে পারে।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন, তারা কমিউনিস্টদের ঠেকানোর জন্য জাপানিদের ব্যবহার করেছেন। তার আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন : 'আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার ছিল, আমরা যদি জাপানিদের অস্ত্রসমর্পণ করে সমুদ্রপথে চলে যেতে বলতাম, তবে পুরো দেশটি কমিউনিস্টদের দখলে চলে যেত। তাই আমারা শত্রুদের গ্যারিসন হিসেবে ব্যবহার করার অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হই—বিশেষ করে দক্ষিণ চীনে চিয়াং কাই-শেকের বাহিনী আর বন্দরে মার্কিন মেরিন সেনা পাঠানো পর্যন্ত আমাদেরকে ঠান্ডা মাথায় এই চাল চেলে যেতে হয়।'

চীনা বিপ্লব ও সোভিয়েতের অবস্থান

স্ট্যালিনের নেতৃত্বে মস্কোর অবস্থান ছিল সিপিসির প্রতি সন্দেহপ্রবণ ও দ্বিধাজড়িত। প্রাথমিকভাবে রেড আর্মি মাঞ্চুরিয়ায় পিএলএর অবস্থান শক্তিশালী করতে সহায়তা করলেও ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরের পর তারা নিজেদের অবস্থান বদলায়। মাঞ্চুরিয়া কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে, এমন শঙ্কার কথা বিবেচনা করে চিয়াং কাই-শেক ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা শঙ্কিত ছিল। এ জন্য চিয়াং মস্কোর সঙ্গে একটি চুক্তিও করেন, যাতে সোভিয়েত সেনাদের প্রত্যাহার-পর্ব আরও বিলম্বিত করা হয়। এর পেছনে তার লক্ষ্য ছিল—সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষিত সেনা ও আধুনিক সরঞ্জাম স্থানান্তরিত করা। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানের মাধ্যমে কেএমটি তাদের সেনাদের সেই অঞ্চলে নিয়ে যায়। সোভিয়েতদের সহযোগিতায় কেএমটি উত্তর চীনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও গ্রামীণ এলাকাগুলো তখনো সিপিসির নিয়ন্ত্রণেই থেকে যায়।

স্ট্যালিন চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি এবং তিনি বিশ্বাসও করতেন না যে, তারা ক্ষমতার বাগডোর হাতে নিতে সফল হবে। এর অনিবার্য ফল হিসেবেই বলা যায়—মস্কো বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের চেয়ে চিয়াংয়ের সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে বেশি মনোযোগী হন। বিপ্লব সফল হওয়ার পর মাও অত্যন্ত তিক্ততা ও অনুযোগের সঙ্গে বলেছিলেন : 'চিয়াং

কাই-শেকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শেষ বিদেশি রাষ্ট্রদূত ছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত।' স্ট্যালিন মাওকে কেএমটির সঙ্গে একটি যৌথ সরকার গঠনের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সিপিসির সশস্ত্র শাখা বিলুপ্ত করার কথাও বলেছিলেন। মজার বিষয় হচ্ছে, মাও নিজেও প্রাথমিকভাবে তার এই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পিএলএকে খুবই সীমিত সাহায্য দিয়েছিল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেএমটিকে প্রদান করেছিল প্রচুর পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ও অর্থ সহায়তা। মার্কিন কূটনীতিক জেনারেল মার্শাল স্বীকার করেছিলেন, পিএলএ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে রসদ পেয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না। বাস্তবতা ছিল, পিএলএ জাপানিদের ফেলে যাওয়া বিপুল সংখ্যক অস্ত্র আর পরবর্তীকালে কেএমটির আত্মসমর্পণকারী সেনাদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। কেএমটির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এসব অস্ত্রের পরিমাণ একেবারেই কম ছিল না, এসবের মধ্যে কয়েকটি ট্যাংকও তারা হাসিল করতে পেরেছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, এই অস্ত্রগুলোর বেশিরভাগই ছিল কেএমটির প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি।

এই সময়টাতে সোভিয়েতরা মাঞ্চুরিয়ার শিল্প অবকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে অপসারণ করে, যার মূল্যমান ছিল প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার। সোভিয়েত সেনারা গোটা গোটা কারখানা খুলে-ভেঙে জাহাজে ভরে ভরে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। কমিউনিস্টদের ইতিহাস গ্রন্থগুলো যত-যা কিছুই বলুক—আসল সত্য তো এটাই যে, স্ট্যালিন মাওয়ের সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে মারাত্মক সন্দিহান ছিলেন এবং চেষ্টা করছিলেন চিয়াংয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার। যেমনটা স্টুয়ার্ট স্ক্র্যাম উল্লেখ করেছেন : 'সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে স্ট্যালিনের অতিরিক্ত উদ্বেগ আর তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, এমন একটি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অনাগ্রহ—এই দুটি কারণেই ঘটনাগুলো ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন থেকে যায়।'[৯৯]

বলা যায়, এভাবেই চীন-সোভিয়েত সংঘাতের বীজ বোনা হয়েছিল একেবারে শুরুতেই। এটি আদর্শগত কোনো সংঘাত ছিল না, যেমনটা প্রায়ই দাবি করা হয়। বরং এটি ছিল দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী আমলাতন্ত্রের স্বার্থ-সংঘাত। দুটি পক্ষই ঈর্ষাপূর্ণভাবে নিজেদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ, ভূখণ্ড, সম্পদ, ক্ষমতা ও সুবিধা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ছিল লেনিন ও ট্রটস্কির[১০০] সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের সাহসী ও উদার চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বিশ্বাস করতেন, সীমান্ত বা জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও মুক্তির জন্য লড়াই করাই আসল

---

[৯৯] মাও সে-তুং, স্টুয়ার্ট স্ক্র্যাম : ২৩৯

[১০০] ট্রটস্কি (Trotsky) : তিনি ছিলেন রাশিয়ান বিপ্লবী, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এবং বলশেভিক পার্টির অন্যতম নেতা। লিওন ট্রটস্কি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং রেড আর্মির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি পান।

লক্ষ্য। লেনিন তো একাধিকবার বলেছিলেনই—জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি রুশ বিপ্লবকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন।

যদি স্ট্যালিন ও মাও লেনিনবাদের নীতিতে অটল থাকতেন, তবে তারা কালবিলম্ব না করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের একটি সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন) গঠনের প্রস্তাব করতেন। শক্তিশালী দুটি বিপ্লবের ধারক দুই নেতার সমন্বয়ে গঠিত এই ফেডারেশন দুই দেশের জনগণের জন্যই অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করত। দুঃখজনকভাবে এমন কিছুই হয়নি। উল্টো তাদের মধ্যকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ ও কূটচালাকির হিসাব-নিকাশের ওপর ভিত্তি করে। যার পরিণতিতে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। রুশ ও চীনা কমরেডরা ১৯ শতকে রুশ জার ও চীনের সম্রাটের নির্ধারিত একটি কৃত্রিম সীমান্ত নিয়ে তীব্র সামরিক উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়েন। সীমান্ত নিয়ে তাদের মতপার্থক্য এতটাই চরমে পৌঁছায় যে, তা কেবল আর কথার যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং রকেট ও কামানের গোলা বর্ষণের মাধ্যমে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষের রূপ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন—আদর্শগতভাবে যারা সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের প্রবক্তা ছিল, তাদের মধ্যে এই ধরনের সংঘাত সেই ঐক্যের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে পুরোপুরি ব্যাহত করেছিল। আর পৃথিবীবাসীর সামনে উন্মোচন করেছিল এক সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া দ্বন্দ্বের বাস্তবতা।

চিয়াং কাই-শেকের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সমর্থন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে তাদের প্রভাবাধীন একটি আধা-উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিল। তবে যুদ্ধশেষে চীনের জনগণ এতটাই বিপর্যস্ত ছিল যে, তারা নতুন কোনো যুদ্ধের ধকল আর সহ্য করার অবস্থায় ছিল না। একই সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে মার্কিন সেনারা চীনে সরাসরি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণেও ব্যর্থ হয়। এর ফলে চীনা বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। সহজ কথায়, এই সীমাবদ্ধতাই মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য তৎকালে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা তাদের সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি।

এ পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রশাসন তাদের কৌশল পরিবর্তন করে ষড়যন্ত্রের পথে এগোয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল মার্শালকে চীনে পাঠানো হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তার ভূমিকা ছিল পিএলএর নেতৃত্ব ও চিয়াং কাই-শেকের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন—চিয়াংয়ের শক্তি বাড়ানো। মার্কিন সহায়তায় তাকে অস্ত্র, অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়; যাতে তিনি পিএলএর বিরুদ্ধে নতুনভাবে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। মাও সেতুং এই ষড়যন্ত্রের হেরফের খুব ভালোভাবেই

বুঝতে পেরেছিলেন। আলোচনায় অংশ নেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি গৃহযুদ্ধের মুখে চিয়াংয়ের আক্রমণ মোকাবিলা করার প্রস্তুতিও নিতে থাকেন। যদিও সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনিরা সরাসরি ১৯৪৬-৪৯ খ্রিষ্টাব্দের গৃহযুদ্ধে জড়াতে পারেনি, কিন্তু তারা কেএমটিকে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার মূল্যের নতুন ও উদ্বৃত্ত সামরিক সরঞ্জামসহ বিপুল পরিমাণ অর্থ, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করেছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, এই সামরিক সরঞ্জামগুলোর একটি বড় অংশই পরে মাওয়ের পিএলএর হাতে পড়ে যায়। পরবর্তীকালে এগুলোই আবার ভিয়েতনামি সেনাদের হাত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাওয়ের এই প্রতিশোধ কিংবা প্রতিশোধের কৌশলকে নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদরা বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছেন।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মস্কো সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে গোলটেবিল আলোচনার সময় যুক্তরাষ্ট্র চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে বরাবরের মতোই এটি তাদের পুরানো প্রতারণামূলক নীতিরই পুনরাবৃত্তি ছিল। যেমনটা তারা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তথাকথিত 'অহস্তক্ষেপ নীতি' গ্রহণ করার মাধ্যমে করেছিল। সেই সময় তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলো স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রকে বর্জন করলেও ফ্রাঙ্কোর পক্ষে হিটলার ও মুসোলিনি অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ করেছিল। এটি স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সেই কূটনৈতিক প্রহসনের দৃশ্যই তুলে ধরে, বারবার 'অহস্তক্ষেপ' নীতির নাটক সাজিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা তারা এতদিন পর্যন্ত মঞ্চস্থ করে আসছিল।

বলা যায়, চীনকে নিজেদের প্রভাবাধীন আধা-উপনিবেশে পরিণত করার সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই তারা কেএমটিকে বোমারু বিমান, যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক, রকেট লঞ্চার, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, গ্যাসোলিন বোমা থেকে শুরু করে গ্যাস প্রজেক্টাইলসহ বিভিন্ন ভারী ভারী সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে। যার বিনিময়ে কেএমটি চীনের সার্বভৌমত্ব একপ্রকার মার্কিনিদের কাছে সমর্পণ করে দেয়। মার্কিনিদের জন্য তারা দেশের ভূখণ্ড, জলপথ ও আকাশসীমায় বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করে। একইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল ও বাণিজ্যে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার আইন প্রয়োগ করে। এ ছাড়া, মার্কিন সেনারা চীনের সাধারণ জনগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন এবং অসাদাচরণ করে যায়। শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, গাড়ি চাপা দিয়ে পিষে ফেলা, মারধর আর নারীদের ধর্ষণের মতো জঘন্য সব অপরাধ করেও কেএমটির দাসখত দেওয়া রাজনীতির কারণে তারা শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

কৃষি কিংবা কৃষকদের বিপ্লব

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে কেএমটি চীনকে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেয়। চিয়াং কাই-শেক পিএলএর বিরুদ্ধে পাল্টা-

বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা শুরু করেন। তার বাহিনী তখন পিএলএর তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন গুণ বড় ছিল। এ ছাড়া তাদের কাছে ছিল আধুনিক শিল্প, উন্নত সামরিক সরঞ্জাম ও যোগাযোগব্যবস্থার সুবিধা, যার কিছুই বলা যায় পিএলএর কাছে ছিল না। তাই বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী চিয়াংয়ের বিজয় অনেক সহজ ও নির্বিঘ্ন হওয়ার কথা ছিল।

গৃহযুদ্ধের প্রথম বছর (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই—১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন) কেএমটি আক্রমণাত্মক আর পিএলএ ছিল প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে। চিয়াংয়ের বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়ে নতুন নতুন বহু শহর এবং পিএলএর নিয়ন্ত্রিত কিছু এলাকা দখল করে নেয়। সবশেষে যখন তারা পিএলএর রাজধানী ইয়েনান দখল করে নেয়, তখন অনেকেই মনে করে এটাই পিএলএর জন্য চূড়ান্ত পরাজয়। কিন্তু এই মূল্যায়ন যে ভুল ছিল—সেটা ইতিহাস নিজে সাক্ষী দিয়েছে পরবর্তীকালে। মাও তখন কৌশলগত পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের দুর্বল ও যুদ্ধের গ্লানিতে বিধ্বস্ত বাহিনী দিয়ে বড় শহর রক্ষার পরিবর্তে তিনি গ্রামীণ এলাকাগুলোর প্রতি মনোযোগ দেন, যেখানে তার শক্তি ও ভিত্তি ছিল কৃষকসমাজের সমর্থন রূপে। এখান থেকেই তিনি পাল্টা-আক্রমণের জন্য পুনর্গঠনের ছক কষতে শুরু করেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর তাদের অনুগত চিয়াং যা বুঝতে পারেনি তা হলো, পিএলএর হাতে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বন্দুক কিংবা ট্যাঙ্ক ছিল না, বরং তাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিল তাদের প্রচারণা। তারা ভূমিহীন ও ক্ষুধার্ত কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—পিএলএর পক্ষে লড়লে তারা জমিদারদের কাছে থেকে নিজেদের জমি ছিনিয়ে নিতে পারবে। এ জন্য দেখা যায়, শহরের আগে গ্রাম ও ছোট শহরগুলোই অধিকাংশ সময় পিএলএর নিয়ন্ত্রণে চলে আসত। আর ঠিক এখান থেকেই মাওয়ের ‘গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও’ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

১৯২৮-৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘তৃতীয় পর্যায়ের’ চরম বামপন্থী নীতি পরিত্যাগ করে স্ট্যালিন যখন পপুলার ফ্রন্টিজম বা গণজোটের সুবিধাবাদী নীতিগুলোতেও পরিবর্তন আনেন, তখন মাও তার কৃষি কর্মসূচি সংশোধন করেন। নিজের আগের ‘লাঙল যার জমি তার’-এর মতো র‍্যাডিকাল নীতি তিনি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। আর সেই জায়গায় গ্রহণ করেন খাজনা কমানোর মতো তুলনামূলক সহনশীল নীতি। সবচেয়ে বড় কথা, এটা ছিল তার একটা যুদ্ধকৌশলই। কারণ এর মাধ্যমে ‘প্রগতিশীল জমিদার’-দের সমর্থন লাভ করার ধারণাও তার মাথায় ছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পর তিনি আবারও নীতি পরিবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে স্টুয়ার্ট স্ক্র্যাম লেখেন : ‘এই সময়ে অনুসৃত কৃষিনীতি ১৯৩৭-৪৫-এর সময়কালের চেয়ে বেশি সংস্কারবাদী ছিল। আগের নীতিতে তাৎক্ষণিক ভূমি সংস্কারের পরিবর্তে সুদ ও খাজনা কমানোর কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু নতুন কৌশল ছিল ধীরে ধীরে এবং স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগোনো। মাও তখনো “দেশপ্রেমিক জমিদার”-দেরকে সেই বিশাল ও ব্যাপক যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত

করতে চেয়েছিলেন; আর নিজের এই চাওয়ার জন্য যা করার প্রয়োজন হয়—সেটা করতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কয়েক বছর কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণের পর সব জমিজামা পুনরায় বিতরণ করা হবে; তখনকার সময়ে এমন সংস্কার যে জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশি মানুষকে প্রভাবিত করবে না—এমনটাই ভাবা হয়েছিল। মাও তার বিখ্যাত সেই 'তিন শৃঙ্খলা বা আচরণ বিধি'[১০১] ও 'আট লক্ষণীয় মূলনীতি'[১০২] পুনরায় জারি করার নির্দেশ দেন। এই বিধি ও মূলনীতিগুলো কোনো না কোনো রূপে, প্রায় বিশ বছর ধরে বেসামরিক জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং লুটতরাজ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে আসছিল। এটাই রেড আর্মিকে চীনা কৃষক ও সাধারণ মানুষের চোখে অতীতে দেখা অন্যান্য সব বাহিনী থেকে পৃথক করেছিল। একইসঙ্গে তাদের জন্য জনগণের সমর্থন অর্জনেও ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল।'[১০৩]

কৃষকদের জমির প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিএলএ যুদ্ধের জন্য বিশাল সংখ্যক যোদ্ধা ও লজিস্টিক সাপোর্ট সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিল। বন্দীদের ওপর প্রয়োগ করা তাদের এই কৌশল আসলেই বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। সম্ভবত ইতিহাসে অন্য যেকোনো সেনাবাহিনীর চেয়ে কেএমটির সেনাবাহিনীতে সৈন্য পালানোর হার ছিল সবচেয়ে বেশি। এর অর্থ হলো—ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসত্ত্বেও পিএলএ নতুন সৈন্য রিক্রুট করতে পারছিল; যার ফলে তাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াও সহজ হচ্ছিল। শুধুমাত্র হুয়াইহাই অভিযানের[১০৪] সময় তারা কেএমটির বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ৫৪ লাখ ৩০ হাজার কৃষককে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। স্টুয়ার্ট স্ক্র্যাম পিএলএর সেনাসংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছেন : '১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অষ্টম রুট আর্মি ও নতুন চতুর্থ আর্মির কমান্ডের অধীনে থাকা মোট সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা পাঁচ লাখ থেকে বেড়ে দশ লাখে পরিণত হয়েছিল। কেএমটির সেনাবাহিনীর আকার ছিল এরও প্রায় চারগুণ। তবে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এক বছরের দীর্ঘ তীব্র সংঘর্ষের পর এই ব্যবধান নাটকীয়ভাবে কমে আসে এবং প্রায় সমান সমান হয়ে যায়।'[১০৫]

---

[১০১] তিন শৃঙ্খলা বা আচরণ বিধি (Three Rules of Discipline) : মাও সে-তুং প্রণীত এই বিধিগুলো চীনা রেড আর্মির সদস্যদের আচরণবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই তিন বিধি ছিল— ১. আদেশ মেনে চলা, ২. জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা এবং ৩. জনগণের সবকিছু সঠিকভাবে রক্ষা করা।

[১০২] আট লক্ষণীয় মূলনীতি (Eight Points for Attention) : এই নির্দেশনাগুলোও সেনাদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক আচরণে নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করেছিল। আটটি লক্ষণীয় মূলনীতি ছিল— ১. দরজায় কড়া নেড়ে প্রবেশ করা, ২. ঋণ নিলে সেটা সময়মতো শোধ করা, ৩. ধার নেওয়া বস্তু যথাযথভাবে ফেরত দেওয়া, ৪. পয়সাপাতি দিয়ে জিনিস কেনা, ৫. ফসলের ক্ষতি না করা, ৬. বেসামরিক জনগণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ৭. নারীদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং ৮. চুরি না করা।

[১০৩] মাও সে-তুং, স্টুয়ার্ট স্ক্র্যাম : ২৪২

[১০৪] হুয়াইহাই অভিযান (Huaihai Campaign) : অভিযানটি ছিল চীনা গৃহযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, যা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

[১০৫] মাও সে-তুং, স্টুয়ার্ট স্ক্র্যাম : ২৪২

জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণ

দার্শনিক ক্লজউইটজের বিখ্যাত একটি উক্তি আছে : 'যুদ্ধ রাজনীতিরই ভিন্ন মাধ্যমে চলতে থাকা একটি রূপ।' প্রতিটি যুদ্ধে রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে এটি গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। যদিও আমেরিকানরা (বরাবরের মতোই) এই যুদ্ধকে 'কমিউনিজম বনাম গণতন্ত্র' হিসেবে উপস্থাপন করেছে, কিন্তু বাস্তবে তাদের অনুগত চিয়াং কাই-শেক ছিলেন একজন নির্মম খুনি ও স্বৈরাচার। অবশ্য ওয়াশিংটনের চাপে চিয়াং কিছু 'গণতান্ত্রিক সংস্কার' আনার ভান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, দেশে-বিদেশে থাকা তার সমালোচকদের মুখ বন্ধ করা। এরই ধারাবাহিকতায় চিয়াং একটি নতুন সংবিধান ও জাতীয় পরিষদের ঘোষণা দেন—যেখানে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেওয়া হয়। সে যাইহোক, তার তথাকথিত এই সংস্কারগুলোকে মাও প্রতারণা বলে তীব্র সমালোচনা করেন। জনগণের বৃহৎ অংশ তখন সরকারের দুর্নীতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং বিশেষ করে চরম মুদ্রাস্ফীতির কারণে জীবনমানের পতন নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। এ ছাড়াও সারাদেশে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের এক উত্তাল ও বিক্ষুব্ধ ঢেউ উঠেছিল।

কেএমটির জাতীয়তাবাদী বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে সাদা-সন্ত্রাসের শাসন চালু ছিল। চিয়াং সেই একই কৌশল গ্রহণ করেন, যা ইতিপূর্বে দখলদার জাপানিরা প্রয়োগ করেছিল—অর্থাৎ জ্বালাও-পোড়াও, লুটপাট, ধর্ষণ, রাহাজানি ও হত্যাযজ্ঞ। লাখো নারী-পুরুষ, তরুণ ও বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আর এটা জনগণের মধ্যে তাদের প্রতি যে ঘৃণা ছিল, তার পারদকে যেন আরও তুঙ্গে নিয়ে যায়। একইসঙ্গে পিএলএর প্রতিও তাদের সমর্থন জোরদার করে।

সার্বিক বিবেচনায়, জাতীয়তাবাদী কেএমটি পিএলএর তুলনায় সবদিক থেকেই এগিয়ে ছিল। জনবল, অস্ত্রশস্ত্র, সুযোগ-সুবিধা—এককথায় কাগজে-কলমে তারা সবকিছুতেই ছিল নিরঙ্কুশ ও শ্রেষ্ঠ। বিশাল ভূখণ্ড ও বিপুল জনসংখ্যার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল; সঙ্গে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের কাছ থেকে পাওয়া ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনও। কিন্তু তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধু কাগজ-কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতীয়তাবাদী কেএমটির সেনারা ছিল চরম দুর্বল-মনোবলহীন এবং দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই দুর্বলতা তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এ সবকিছুর পাশাপাশি তারা জনগণের সমর্থনও পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল। কেএমটির ক্ষেত্রে ইতিহাসের সেই মূলনীতিরই বাস্তবায়ন ঘটেছিল যে, যে সেনাবাহিনী জনগণের সমর্থন পায় না, তাদের পক্ষে যুদ্ধে জয়ী হওয়াও সম্ভব হয় না।

নীতি-নৈতিকতা ও মনোবলহীন অসংগঠিত জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা পিএলএর

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সামনে তীব্র বাতাসের মুখে থাকা খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছিল। হয়তো তারা আত্মসমর্পণ করছিল, নয়তো অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করছিল। বিপুল সংখ্যক কেএমটি সৈন্য বন্দি হওয়ার কারণে দেখা যায়—ট্যাঙ্ক, ভারী কামান ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম পিএলএর সেনাদের হস্তগত হতে থাকে। এটা পিএলএকে গ্রেট ওয়াল বা মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও সরবরাহ করে। তারা শুধু কেএমটির সুরক্ষিত শহরগুলো দখল করেই নয়, বরং শত-সহস্র দক্ষ সৈন্যদেরও ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তারা লুয়োয়াং (Luoyang) শহর দখল করে, যার ফলে শিয়ানের (Xi'an) সঙ্গে কেএমটির সেনাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর এরই মধ্য দিয়ে পিএলএ আরও শক্তভাবে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। একইসঙ্গে তারা কেএমটির সেনাদেরকে সাধারণ আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতেও বাধ্য করে। শত্রুবাহিনীর কাছ থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করার কারণে পিএলএর সামরিক সামর্থ্য আরও উন্নত হয়ে যায়। আর এরপরই তারা নিজেদের আর্টিলারি ও প্রকৌশল বিভাগ গঠন করে আর আয়ত্ত করে কঠোরভাবে রক্ষিত পয়েন্টগুলোতে নিখুঁতভাবে আক্রমণের কৌশল। ইতিপূর্বে তাদের বিমান বা ট্যাঙ্ক না থাকার কারণে যা সম্ভব হয়নি, আর্টিলারি ও প্রকৌশল বিভাগ গঠনের পর সেটাও তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এখন তারা শুধু গেরিলা কিংবা মোবাইল যুদ্ধ নয়, বরং স্থির যুদ্ধেও দক্ষ হয়ে ওঠে। মাওয়ের নিজের হিসাব অনুযায়ী : '... প্রতি মাসে পিএলএর যোদ্ধারা কেএমটির নিয়মিত বাহিনীর প্রায় আটটি ব্রিগেড (বর্তমানের আটটি ডিভিশনের সমতুল্য) ধ্বংস করেছে।'[১০৬]

সামরিক পরিস্থিতির এই পরিবর্তন যেকোনো যুদ্ধ বা বিপ্লবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বহু বছর ধরে যাদের সংখ্যা ছিল সামান্য, সেই পিএলএ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই কেএমটির সেনাবাহিনীকে সংখ্যায় ছাড়িয়ে যায়। মাও সে-তুং শত্রুবাহিনীর দুরবস্থার যে চিত্র বা পরিসংখ্যান তখন তুলে ধরেছিলেন, তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর : 'প্রথম বছর আমরা শত্রুর ৯৭টি ব্রিগেড ধ্বংস করেছি, যার মধ্যে ৪৬টি ব্রিগেড হয়েছিল পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। দ্বিতীয় বছর ৯৪টি ব্রিগেড, যার মধ্যে ৫০টি ব্রিগেড হয়েছিল পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। তৃতীয় বছরের প্রথমার্ধে অসম্পূর্ণ তথ্য অনুযায়ী—১৪৭টি ডিভিশন ধ্বংস হয়েছে, যার মধ্যে ১১১টি ডিভিশন হয়েছিল একেবারে নিশ্চিহ্ন। শুধু এই ছয় মাসে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া শত্রু ডিভিশনের সংখ্যা আগের দুই বছরের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়ে ১৫টি বেশি ছিল। শত্রুপক্ষের শিবির কার্যত ভেঙে পড়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শত্রুপক্ষের পুরো বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,

---

[১০৬] মাও সে-তুং, 'বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাও' শীর্ষক প্রবন্ধ। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ। নির্বাচিত রচনাবলী : ৪/২৯৯।

উত্তর চীনেও শিগগির একই পরিণতি ঘটবে। আর পূর্ব চীন ও মধ্য-সমভূমিতেও কেবল কিছু শত্রু সেনা অবশিষ্ট রয়েছে। ইয়াংসি নদীর (Yangtze River) উত্তরে কেএমটির মূল বাহিনীর এমন শোচনীয় পরাজয়, চীনের দক্ষিণাঞ্চলে পিএলএর অভিযানকে এবং আরও ব্যাপকভাবে বললে সমগ্র চীনকে মুক্ত করার জন্য তাদের অগ্রযাত্রাকে সহজতর করে তুলেছে। সামরিক ক্ষেত্রে এই অসামান্য বিজয়ের পাশাপাশি চীনা জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অনন্য সফলতা অর্জন করেছে। এ কারণেই বিশ্বজুড়ে জনমত এখন চীনা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক বিজয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছে না আর। এমনকি সাম্রাজ্যবাদীদের সংবাদপত্রগুলোও এ বিষয়ে এখন আর কোনো দ্বিমত প্রকাশ করছে না।'[১০৭]

বেইপিংয়ের পতন

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি ঘুরে যায়। পিএলএর কঠোর প্রচেষ্টার ফলে উত্তরের শেনইয়াং (Shenyang) ও চাংচুন (Changchun) শহরেরও পতন ঘটে তাদের হাতে। আর এরই মধ্য দিয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীন পিএলএর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। চাংচুনে ছয় মাসের নির্মম অবরোধে তিন লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে ক্ষুধার তাড়নায়। এরপর কেএমটির স্পেশাল কমান্ডো ইউনিটগুলোকেও আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। চিয়াং কাই-শেক পাল্টা আক্রমণের যে ছক কষে আসছিলেন, তার কমান্ডো ইউনিটগুলোর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে যায়। পিএলএ শুধু উত্তর-পূর্ব চীনে হারানো তাদের বেশিরভাগ অঞ্চল পুনরুদ্ধারই করেনি, বরং ইয়াংসি ও ওয়েইশুই নদীর (Weishui River) উত্তরে কেএমটি-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোকেও যুদ্ধ-সীমানার মধ্যে নিয়ে আসে। তারা শিহচিয়াচুয়াং (Shijiazhuang), ইউনচেং (Yuncheng), সিজিপিংকাই (Xipingkai), লুয়োয়াং (Luoyang), ইচুয়ান (Yichuan), পাওকি (Paoqi), ওয়েইশিয়েন (Weixian), লিনফেন (Linfen) ও কাইফেংয়ের (Kaifeng) মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোও দখল করে নেয়।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পিএলএ ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে অগ্রসর হলে ভয়াবহ এই গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি অনেকটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তবে তথাকথিত ট্রটস্কিপন্থীদের অনেকে তখনো বাস্তবতা মেনে নিতে পারছিল না। আমেরিকায় ম্যাক্স শাখটম্যান[১০৮] উইলিয়াম ক্যাননের[১০৯] সেই বক্তব্য নিয়ে বেশ উপহাস করেছিলেন, যেখানে ক্যানন

---

[১০৭] প্রাগুক্ত

[১০৮] ম্যাক্স শাখটম্যান (Max Shachtman) : বিশ শতকের একজন প্রভাবশালী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদ, যিনি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রটস্কি মতবাদের ঘোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

[১০৯] ক্যানন (Cannon) : তার পুরো নাম উইলিয়াম ক্যাথকার ক্যানন। ট্রটস্কি-সমর্থক মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষক

ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বলেছিলেন—মাও চিয়াং কাই-শেকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন। শাখটম্যান কটাক্ষ করে বলেছিলেন তখন : 'হ্যাঁ, মাও চিয়াংয়ের কাছে আত্মসমর্পণ তো করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তার সমস্যা হচ্ছে, তিনি চিয়াংকে কোনোভাবেই কাছে পাচ্ছেন না!'

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ নাগাদ কেএমটির অবস্থান ছিল চরম হতাশাজনক। যখন চিয়াংয়ের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, তখন তিনি শান্তির পরমদূত হয়ে আবির্ভূত হন এবং মাওয়ের কাছে বারবার শান্তিচুক্তির প্রস্তাব পাঠাতে থাকেন। অথচ এর মাত্র তিন বছর আগেও চিয়াং গর্ব করে বলতেন, যেকোনো মূল্যে হোক তিনি এই ভূমি থেকে কমিউনিস্টদের নির্মূল করে ছাড়বেন। তার সৈন্যরা 'লুটপাট করো, জ্বালিয়ে দাও আর হত্যা করো' নীতিকে চরম উন্মাদনার সঙ্গে অনুসরণ করে গিয়েছিল। কিন্তু যখন পরাজয় নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, তখন চিয়াং শান্তির বন্দনা শুরু করেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল সেই শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর পরিবর্তন!

চিয়াংয়ের এই তথাকথিত 'শান্তি কৌশলে'-র পেছনে ছিল ওয়াশিংটন, যারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন নিয়ে বিশ্ব-মোড়ল হিসেবে ছড়ি ঘুরাচ্ছিল। মার্কিনিরা বুঝতে পেরেছিল, যুদ্ধ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। পিএলএকে শক্তি দিয়ে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিজেদের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। তবে তাদের এসব চালবাজি কেউ ততটা গুরুত্বের সঙ্গেই নেয়নি—গ্রহণযোগ্যতা কিংবা সেটা নিয়ে ভাবার কথা তো দূরে থাক। বিশেষ করে মাও সে-তুং ওয়াশিংটনের এসব প্রস্তাব এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতেন।

পিপলস ওয়ার কৌশলের অংশ হিসেবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরগুলোর আগে চারপাশের গ্রামাঞ্চল ও ছোট শহরগুলো পিএলএর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাববলয়ের অধীনে চলে এসেছিল। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে পিএলএ কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই বেইপিং দখল করে নেয় এবং এর নাম পরিবর্তন করে রাখে বেইজিং। এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে অন্যান্য বড় শহরগুলোরও পতন হয়ে যায় একটু-আধটু প্রতিরোধের মুখে। ২১ এপ্রিল নাগাদ মাওয়ের সেনারা ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে কেএমটির রাজধানী নানজিংয়েরও দখল নিয়ে নেয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা কেএমটির বিশৃঙ্খল ও মনোবলহীন অবশিষ্ট বাহিনীকে দক্ষিণ চীনের দিকে পিছু হটতে বাধ্য করে।

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর সবশেষে পরাজিত চিয়াং কাই-শেক ও প্রায় ২০ লাখ জাতীয়তাবাদী চীনা—যাদের বেশিরভাগই ছিলেন প্রাক্তন সরকারি আমলা ও ব্যবসায়ী—চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে তাইওয়ান (তৎকালীন ফরমোজা নামে পরিচিত) দ্বীপে পালিয়ে

ও লেখক, যিনি চীনের গৃহযুদ্ধ ও পিএলএর উত্থান নিয়ে কঠোর সমালোচনার জন্য পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

যান। চিয়াং তাইপেইকে চীনের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করেন। পালানোর আগে তিনি জাতীয় কোষাগার থেকে প্রায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলার আত্মসাৎ করেন এবং নিজের ও সহযোগীদের পকেট ভর্তি করেন।

চিয়াং ও তার অনুসারীদের পলায়নের মধ্য দিয়েই মূলত সমগ্র চীনে পিএলএর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। যার অনিবার্য ফল হিসেবেই ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর মাও সে-তুং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মাওয়ের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেদিন বিশ্ব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

একটি নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

মাও সে-তুং একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যা সরাসরি শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র ছিল না; বরং সেটি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে গঠিত হয়েছিল। এই রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তিনি জমিদার ও পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা অধিগ্রহণ করেন। যদিও প্রক্রিয়াটি কিছুটা কঠোরভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তবু জাতীয়করণের এই পদক্ষেপ এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা চীনের জন্য দুটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ এবং বিশাল অগ্রগতি ছিল। তবে মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারা অনুযায়ী, এটি প্রকৃত অর্থে কোনো শ্রমিক বিপ্লব ছিল না। চীনা স্ট্যালিনবাদীরা শ্রমিক শ্রেণির নামেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল অর্থনৈতিক কাজগুলো সম্পন্ন করেছিল; কিন্তু চীনের শ্রমিকদের এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের কোনো স্বাধীন বা সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ফলে এই বিপ্লব ওপর থেকে একনায়কতান্ত্রিকভাবে বোনাপার্টিস্ট পন্থায়, আরও সহজ করে বললে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বা গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পরিচালিত হয়। বিপ্লব ও সরকারের হর্তাকর্তারা স্ট্যালিনের রাশিয়ার অনুকরণে একটি সর্বাত্মকবাদী একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। বিপ্লব যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল, তারপর আবার চীনের সীমান্তে একটি শক্তিশালী স্ট্যালিনবাদী রাষ্ট্রের উপস্থিতি—সবমিলিয়ে চীনের বিষয়গুলোও যে এমন পরিণতির দিকে গড়াবে, এটা আগে থেকেই অনুমানযোগ্য ছিল।

মাও পুরানো রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য কৃষক সেনাবাহিনীকে একটি শক্তিশালী আঘাতের যন্ত্র বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিক্ত হলেও বাস্তবতা হচ্ছে—কৃষক শ্রেণি এমন এক শ্রেণির মানুষদের সমন্বয়ে গঠিত, যারা সমাজতান্ত্রিক চেতনা অর্জনে সবচেয়ে দুর্বল এবং কম সক্ষম। অবশ্য অনুন্নত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে কৃষক শ্রেণিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। এটি দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার কারণে সময় ও পরিস্থিতির দাবি। তবে তাদের এই ভূমিকা কখনোই স্বাধীনভাবে নেতৃত্বদানের

পর্যায়ে পৌঁছায় না। বরং এটি শহরের শ্রমিকদের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী আন্দোলনের একটি সহায়ক বা পরিপূরক ভূমিকা হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে।

চীনে যে ধরনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ধ্রুপদী বা প্রথাগত আদর্শ থেকে একটি বিচ্যুতিকেই তুলে ধরে। কিন্তু তিক্ত হলেও এটাও জীবনেরই বাস্তবতা যে, আসল জীবনে বা কর্মক্ষেত্রে সবকিছু সবসময় আদর্শ, প্রথা বা নিয়ম মেনে হয় না। কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন আর পরিমার্জনও হয়। ঘটে যায় অদ্ভুত ধরনের ব্যতিক্রমধর্মীয় অনেক রূপান্তর। টেড গ্রান্টই[১১০] ছিলেন একমাত্র মার্কসবাদী তাত্ত্বিক—যিনি ট্রটস্কির নিরন্তর বিপ্লব তত্ত্বের একটি ব্যতিক্রমী রূপ হিসেবে শ্রমিক বোনাপার্টিজমের মাহাত্ম্য ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছিলেন। মাওয়ের দৃষ্টিভঙ্গি যখন দীর্ঘমেয়াদী পুঁজিবাদের পক্ষে ছিল, ঠিক সেই সময়টাতেই টেড গ্রান্ট মাওয়ের বিজয়ের অনিবার্যতা এবং একটি আমলাতান্ত্রিক শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও আগে থেকেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, চীনা আমলাতন্ত্র একসময় মস্কোর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হবে।[১১১]

চীনা বিপ্লব : এক বিশাল সম্ভাবনা

চীনা বিপ্লব ছিল এক অসামান্য যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লব সফলতার মুখ না দেখলে, দেশটি যে চিয়াং কাই-শেকের স্বৈরতন্ত্রের অধীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধা-উপনিবেশে পরিণত হতো—এতে কোনো সন্দেহ নেই। দাসত্বের পথ বেছে নেওয়ার পরিবর্তে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে চীনা জনগণ ভিনদেশিদের দাসত্ব থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্তি অর্জন করে; ইতিহাসে যা ছিল তাদের প্রথম স্বাধীনতা। এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল এবং বিশ্বের পরাধীন ঔপনিবেশিক জাতিগুলোকেও মুক্তি সংগ্রামে যুগিয়েছিল বিপুল প্রেরণা। কেবল এই একটি কারণেই এই বিপ্লবকে সাদরে গ্রহণ ও সমর্থন করা যায়।

তবে শুধু এটুকুই এই বিপ্লবের পূর্ণ চিত্র নয়। এই বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতিতে ঘটেছিল জমিদারতন্ত্র ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। জমিদারতন্ত্রের বিলুপ্তি চীনকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। শিল্পের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিসমাপ্তি আর বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, এই দুটি পদক্ষেপ চীনের শিল্প বিকাশে সঞ্চার করেছিল এক অভাবনীয় গতি। তবে মনে রাখতে হবে—উৎপাদনের উপায়-উপকরণকে রাষ্ট্রায়ত্ত করাটা সমাজতন্ত্র নয়, যদিও অনেক দার্শনিক সেটাকে

[১১০] টেড গ্রান্ট (Ted Grant) : তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, বিপ্লবী ও মার্কসবাদের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ট্রটস্কির নিরন্তর বিপ্লব তত্ত্বের ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যা প্রদান করে শ্রমিক বোনাপার্টিজমের ধারণা উপস্থাপন করেন।

[১১১] রিপ্লাই টু ডেভিড জেমস, স্প্রিং ১৯৪৯।

সমাজতন্ত্রের পথে এক অপরিহার্য সোপান বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে থাকা উপনিবেশিক দেশগুলোতে বিপ্লবের এই অদ্ভুত পরিবর্তনগুলো ঘটেছিল, কারণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটছিল দেরিতে। তবে এখন পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আজ সারা বিশ্বে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। এখন শুধু প্রয়োজন আসল মার্কসবাদী প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির অনুপস্থিতি কিংবা দুর্বলতার জন্যই বিপ্লবের এই প্রক্রিয়া হয়তো আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের চীনা বিপ্লব না হলে, চীন আজকের এই অসাধারণ উন্নতি করতে পারত না। এখন সারা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি চীনের বিপ্লব-পরবর্তী এই বিরাট সাফল্যকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চলা অর্থনীতির অফুরন্ত ক্ষমতা ও সক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে পারে। আজকাল অনেকেই রাষ্ট্রীয়করণ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সমালোচনা করেন। কিন্তু 'বাজার অর্থনীতির' তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের সব দাবি বর্তমান ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের—যা ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের পর বিশ্ব পুঁজিবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সংকট—সামনে একেবারে ফাঁকা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় চলা পরিকল্পিত অর্থনীতির অসাধারণ সাফল্যই চীনকে একটি শক্তিশালী শিল্পোন্নত জাতি হিসেবে বিশ্ব-দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার মূল কারণ। এই পার্থক্য কতটা গভীর, তা বুঝতে ভারতের সঙ্গে চীনের তুলনা করলেই যথেষ্ট। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে দুটি দেশ প্রায় একই জায়গা থেকে শুরু করলেও, ভারত কোথায় পড়ে আছে আর চীন কত দ্রুতগতিতে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

হয়তো ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকেই চীনের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের অতীতের গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্যকে আবার খুঁজে বের করবে। নতুন প্রজন্ম গভীর শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করবে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ট্রটস্কি ও চীনা কমিউনিজমের স্থপতি ও এর আসল পথপ্রদর্শক চেন তুসিউর[১১২] চিরন্তন বিপ্লবী ভাবনাগুলোকে। নেপোলিয়ন একবার চীন সম্পর্কে বলেছিলেন: 'এই দৈত্য যখন জাগবে, বিশ্ব তখন ভয়ে কাঁপবে।' আমরাও সেই অমর কথারই প্রতিধ্বনি করি, তবে একটু যোগ করে বলি: যে দৈত্য একদিন বিশ্বকে কাঁপাবে, সে আর কেউ নয়, সে হলো চীনের অজেয়, অপ্রতিরোধ্য শ্রমিক শ্রেণি। আমরা অধীর আগ্রহে সেই নতুন জাগরণের সোনালি মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছি।

---

[১১২] চেন তুসিউ (Chen Duxiu) : চীনের বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবীদের ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি আধুনিক চীনা রাজনীতির একজন পথিকৃৎ, যিনি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'নিউ ইয়ুথ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ এবং মে চতুর্থ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হন। চেন তুসিউ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সিঁপিসির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মার্কসবাদকে চীনের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের দৌহিত্র। সিরাজউদ্দৌলার হৃদয় ছিল দেশপ্রেমে পূর্ণ। দেশের মানুষকে ইংরেজদের গোলামি থেকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। ইংরেজদের শঠতা আর মীর জাফরদের গাদ্দারির কারণে পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হন তিনি। এরপর মৃত্যু। ইতিহাসে রচিত হয় একটি কালো অধ্যায়। সিরাজবিদ্বেষীরা উঠেপড়ে লাগে সিরাজকে খাটো ও হীন করে দেখানোর উদ্দেশ্যে। ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্য ছড়াতে থাকে অসংখ্য অপবাদ ও মিথ্যাচার। কেউ বলে গণ্ডমূর্খ কেউ বলে চরিত্রহীন। কেউ-বা আবার উপস্থাপন করে নারীলোভী ও অর্থলোভী হিসেবে। সময়ের পালাবর্তনে এমন অনেক আজগুবি কথাবার্তা রটে যায় সিরাজের ব্যাপারে। সত্যিই কি সিরাজউদ্দৌলা এমন ছিলেন? সত্যিই কি সিরাজউদ্দৌলা তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার নায়ক? এমন অসংখ্য প্রশ্নের জবাব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'সিরাজউদ্দৌলা'র পাতায় পাতায়।

বই : **সিরাজউদ্দৌলা**

লেখক : আমীরুল ইসলাম ফুআদ

প্রকাশনা : বাতায়ন পাবলিকেশন

পৃষ্ঠা : ১৯২

ধরন : বোর্ডবাঁধাই

মুদ্রিত মূল্য : ৩০০ টাকা

১৯৫৯ সালের কিউবা বিপ্লব

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম

নূর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

❝ এই বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি ছোট দেশের আত্মমর্যাদার প্রতীক ছিল। এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের জন্য লড়াইয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ। ❞

— রিচার্ড গট, (*Cuba: A New History*)

❝ কিউবা বিপ্লব বেশ ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছিল যে, আদর্শের জন্য লড়াই কীভাবে একটি জাতির ভাগ্য ও ইতিহাস পরিবর্তন করে দিতে পারে। এটি শুধু একটি সামরিক বিজয় নয়; বরং একটি আদর্শিক বিজয়ও। ❞

— হাওয়ার্ড জিন, (*A People's History of the United States*)

এক. বিপ্লবের পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক পটভূমি

১. কিউবার উপনিবেশ শাসনের ইতিহাস, স্প্যানিশ শাসন থেকে মার্কিন প্রভাব

কিউবার ইতিহাসে প্রথম থেকেই দেশটি ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনে ছিল। শুরুর দিকে স্প্যানিশরা প্রায় চারশ বছর কিউবাকে শাসন করেছে। এই সময়ে কিউবা মূলত চিনি, তামাক ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে মনোযোগী ছিল। তখন কিউবার শ্রমিকরা অত্যন্ত শোষিত ছিল এবং দেশটির সম্পদ পশ্চিমারা কুক্ষিগত করে নিত। মোটকথা ঔপনিবেশিক শাসনের সময় কিউবা একটি ধনী উপনিবেশে পরিণত হলেও এর স্থানীয় জনগণ ছিল অত্যন্ত দারিদ্র্য। তারা প্রচণ্ডরকম শোষণ ও চরম বৈষম্যের মধ্যে বসবাস করত।

১৮৯৮ সালে স্প্যানিশ বনাম আমেরিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর পর কিউবা চলে আসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। যদিও কিউবা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছিল, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় ব্যাপক রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কিউবার অধিকাংশ শিল্প ও অর্থনীতি ছিল মার্কিন স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল, যা কিউবার স্বাধীনতার ধারণাকে একপ্রকার বাধাগ্রস্ত করে।

২. কিউবায় দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপট

বিশ শতকের প্রথম দিকে কিউবা অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভুগছিল। একদিকে মার্কিন প্রভাব ছিল প্রবল, অন্যদিকে কিউবায় বিরাজ করছিল একটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ। ফলে কিউবায় তখন বিভিন্ন সরকার বারবার ক্ষমতায় আসত, কিন্তু তাদের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কখনো সৃষ্টি হয়নি। দুর্নীতি ছিল ব্যাপক। এদিকে সাধারণ জনগণ, বিশেষত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি অত্যন্ত শোষিত ছিল।

১৯৩০-এর দশকের শুরুতে অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের ক্ষোভ তীব্র হতে থাকে। কিউবা তখন এক ধরনের রাজনৈতিক ভাঙন দেখছিল, যেখানে দুর্নীতি ও অবিচার ছিল শীর্ষে। এমন এক পরিস্থিতিতে ১৯৩৩ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং ফুলগেনসিও বাতিস্তা ক্ষমতা দখল করেন, যিনি পরবর্তী সময়ে কিউবায় একটি স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাতিস্তার শাসন কিউবা সমাজে অস্থিরতা, অসন্তোষ ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি করেছিল, যা জনগণকে বিপ্লবের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

দুই. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ও বাতিস্তার স্বৈরাচার

১. ১৯৫২ সালে বাতিস্তার অভ্যুত্থান ও মার্কিন সমর্থন

১৯৫২ সালের কথা। কিউবার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল চরম অস্থিরতা ও দুর্নীতিতে ভরা। বিভিন্ন সরকার বারবার ক্ষমতায় এলেও কেউ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারছিল না। এরই মধ্যে ফুলগেনসিও বাতিস্তা এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে প্রতিষ্ঠা করেন স্বৈরাচারী শাসন। বাতিস্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন। ফলে তার শাসনামলে কিউবা মার্কিন প্রভাবের অধীনে চলে যায়। বাতিস্তা সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা রক্ষা করতে কিউবার অধিকাংশ অর্থনৈতিক সম্পদ ও শিল্প মার্কিন স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করত।

বাতিস্তার শাসনের ফলে কিউবায় একধরনের রাজনৈতিক একঘেয়েমি তৈরি হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক কিউবার জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। কারণ কিউবা তখন আমেরিকার এক প্রকার কলোনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার্কিন সমর্থন পাওয়ার পরও কিউবার জনগণ বঞ্চিত হচ্ছিল। তারা জানত তাদের দেশে মার্কিনিদের প্রভাব নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলবে।

২. অর্থনৈতিক বৈষম্য, দুর্নীতি ও নিপীড়ন এবং বিপ্লবের ভিত্তি

বাতিস্তা সরকারের অধীনে কিউবার অর্থনীতি আরও বেশি বৈষম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিউবার অধিকাংশ সম্পদ ছিল মার্কিন কোম্পানিগুলোর হাতে এবং কিউবার স্থানীয়

জনগণকে বিশেষভাবে কৃষক শ্রেণিকে অত্যন্ত নিপীড়িত হতে হয়েছিল। শিল্পের অধিকাংশ লাভ মার্কিন ব্যবসায়ীদের হাতেই চলে যেত আর কিউবার সাধারণ জনগণ অসন্তুষ্ট থাকত তাদের দারিদ্র্য ও অবহেলার কারণে।

এ ছাড়া বাতিস্তা সরকারের মধ্যে চরম দুর্নীতি ছিল। সরকারি কর্মকর্তারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। তাই তারা জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সমাজে ন্যায়বিচারের ধারাবাহিক অবমূল্যায়ন বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করতে সহায়ক ছিল। কিউবার জনগণ, বিশেষত শ্রমিক ও কৃষকরা, তাদের মৌলিক অধিকার ও উন্নত জীবনের জন্য আপসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই সমস্ত অবিচার, দুর্নীতি ও বৈষম্যের ফলস্বরূপ কিউবা একটি বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দেয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো ও তার সঙ্গীরা।

তিন. মনকাডা ব্যারাক হামলা : বিপ্লবের সূচনা

১. মনকাডা ব্যারাকে হামলা

১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই, ফিদেল কাস্ত্রো এবং তার বিপ্লবী দল একটি সাহসী অভিযান পরিচালনা করেন কিউবার সান্তিয়াগো দে কিউবার মনকাডা ব্যারাকের বিরুদ্ধে। এই ব্যারাক ছিল বাতিস্তার শাসনের শক্তিশালী সেনাঘাঁটি, যেখানে অস্ত্রাগার এবং কিউবায় শাসকের শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল। কাস্ত্রো ও তার দলের উদ্দেশ্য ছিল বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আঘাত হানা এবং জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ছড়ানো।

হামলা শুরু হয় ভোরে, কিন্তু এটি একদম সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। হামলার আগেই কিউবায় সরকারের সেনাবাহিনী শক্তিশালী প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বিপ্লবীদের অধিকাংশ সদস্যকে বন্দি করে ফেলে। তবে এই হামলা ছিল বিপ্লবের সূচনা এবং কাস্ত্রো ও তার সঙ্গীরা এর মাধ্যমে কিউবাকে রাজনৈতিকভাবে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। যদিও হামলা ব্যর্থ হয়েছিল, তার পরও কাস্ত্রো এর মাধ্যমে দেশের জনগণের মধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিরোধের সূচনা করেছিলেন।

২. কাস্ত্রোর বিচার এবং 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' বক্তৃতার প্রভাব

মনকাডা ব্যারাক হামলার পর কাস্ত্রো ও তার সঙ্গীরা আটক হন। তখন বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। কাস্ত্রো নিজে বিচারে উপস্থিত ছিলেন। ওই সময় তার একটি বক্তব্য ছিল ইতিহাসের জন্য বিশেষ এক মুহূর্ত। তিনি তার বিখ্যাত 'ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে' (History Will Absolve Me) বক্তৃতাটি প্রদান করেন, যেখানে তিনি সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের আন্দোলনকে বৈধতা দেন। কাস্ত্রো এই বক্তৃতায় কিউবা ও তার জনগণের জন্য একটি নতুন

দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন, যা কেবল একটি সামরিক অভ্যুত্থান নয়, বরং একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের ভিত্তি।

এই বক্তৃতা শুধু তার বিচারকে ঘিরে ছিল না, বরং এটি বিপ্লবের আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করে এবং কিউবার জনগণের মধ্যে শক্তিশালী সমর্থন সৃষ্টি করে। কাস্ত্রোর বক্তব্যে স্ফূর্তির সঞ্চার ঘটেছিল, যা পরবর্তী সময়ে বিপ্লবের জন্য একটি অঙ্গীকার হিসেবে কাজ করে। তার এই বক্তব্য বিপ্লবীদের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় এবং কিউবার ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়।

চার. গেরিলা যুদ্ধ ও ২৬ জুলাই আন্দোলন

১. মেক্সিকোতে ফিদেল কাস্ত্রোর পুনর্গঠন এবং চে গুয়েভারার সঙ্গে মিলিত হওয়া

মনকাডা ব্যারাক হামলার পর ফিদেল কাস্ত্রো ও তার ভাই রাউল কাস্ত্রোসহ অন্যান্য বিপ্লবীরা বন্দি হন। এরপর ১৯৫৫ সালে সাধারণ ক্ষমায় তারা মুক্তি পান। মুক্তির পর কাস্ত্রো মেক্সিকোতে গিয়ে সেখানকার বিপ্লবী সংগঠক চে গুয়েভারার সঙ্গে মিলিত হন। চে গুয়েভারা একজন আর্জেন্টাইন ডাক্তার, বিপ্লবী চিন্তাবিদ এবং গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কাস্ত্রো ও গুয়েভারার মধ্যে মতাদর্শিক মিল ছিল এবং তারা একত্রে কিউবায় ফিরে গিয়ে কিউবার বিপ্লবের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন।

মেক্সিকোতে মিলিত হওয়ার পর কাস্ত্রো ও গুয়েভারা একসাথে ২৬ জুলাই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং কিউবায় পুনরায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিউবায় ফিরে এসে তারা সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতে গেরিলা বাহিনী গঠন করেন, যা খুব দ্রুত কিউবায় বিপ্লবের শক্তিশালী কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

২. সিয়েরা মায়েস্ত্রায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এবং কৃষকদের সমর্থন

কাস্ত্রো ও গুয়েভারা সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বতের দুর্গম পরিবেশে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। গেরিলা বাহিনী মূলত ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল এবং তারা সরকারের সেনাবাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাত। কাস্ত্রো ও গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ছিল দ্রুত ও সচেতন এবং শত্রুকে বিভ্রান্ত করার পদ্ধতিতে ভিত্তি করে। তারা নিজেদের বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে চলত এবং শত্রুর মোকাবিলা করত।

এই গেরিলা বাহিনী স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করে। কৃষকরা স্বাভাবিকভাবে তখন কিউবার শাসকদের নিপীড়নের শিকার ছিল, তাদের মধ্যে বিপ্লবের প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। কাস্ত্রো ও তার সঙ্গীরা কৃষকদের জন্য ভূমি

সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতিশ্রুতি দেন, যা তাদের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করে।

৩. রেডিও রেবেলডের ভূমিকা

গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি কাস্ত্রো ও তার বিপ্লবীরা নিজেদের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি গোপন রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম ছিল 'রেডিও রেবেলদে'। এই রেডিও স্টেশনটি গেরিলা বাহিনীর বার্তা এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে কিউবা জুড়ে প্রচার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। রেডিও রেবেলদে কিউবার জনগণের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা ছড়ানোর পাশাপাশি বাতিস্তার সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সূচনা করেছিল।

রেডিও রেবেলদে মূলত কিউবা জুড়ে বিপ্লবী বার্তা এবং কাস্ত্রো ও তার সঙ্গীদের কর্মকাণ্ডের সাফল্য সম্পর্কে তথ্য প্রচার করত, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে আরও সমর্থন অর্জন করতে সাহায্য করেছিল। গেরিলা বাহিনীর সাথে রেডিও রেবেলদে বিপ্লবের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে পরিণত হয়েছিল।

পাঁচ. বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায় ও বাতিস্তার পতন

১. চূড়ান্ত লড়াই এবং চে গুয়েভারার নেতৃত্বে সান্তা ক্লারা দখল

১৯৫৮ সালের শেষ দিকে কিউবার বিপ্লবী বাহিনী সরকারি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামল। কাস্ত্রো ও তার সহযোগীরা সিয়েরা মায়েস্ত্রা পর্বত থেকে বেশ কিছু অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। ওই বছর চে গুয়েভারা বিপ্লবী বাহিনীর অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে সান্তা ক্লারার দিকে অগ্রসর হন। চে'র নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী সান্তা ক্লারার যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজয় লাভ করে। এই যুদ্ধে বিপ্লবীরা সরকারি সেনাদের বিরুদ্ধে একটি বড় সাফল্য অর্জন করে, যা কিউবায় বিপ্লবের সমাপ্তির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

চে গুয়েভারার নেতৃত্বে সান্তা ক্লারার দখল কিউবা সরকার এবং বাতিস্তার শাসনকে দুর্বল করে দেয়। কারণ এটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল। সান্তা ক্লারার পতন ও সরকারি বাহিনীর রিজার্ভ ক্ষমতা এবং মূল গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর দখল বিপ্লবীদের বিজয়ের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল।

২. বাতিস্তার দেশত্যাগ ও হাভানা বিজয়

১৯৫৮ সালের শেষে চে গুয়েভারার নেতৃত্বে সান্তা ক্লারা দখল হওয়ার পর কিউবায় বাতিস্তার সরকারের পতন আরেকটি স্তরে পৌঁছায়। তার সেনাবাহিনীর ব্যাপক পরাজয়

এবং জনগণের মধ্যে বিপ্লবের প্রতি সাফল্য ও সমর্থনের মাধ্যমে বাতিস্তা জানিয়ে দেয় যে তার শাসন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ১৯৫৯ সালের শুরুর দিকে বাতিস্তা দেশত্যাগ করে কিউবা ছেড়ে ফ্লোরিডা পালিয়ে যান। তার দেশত্যাগ কিউবার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, যা দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের সূচনা করে।

১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি, কাস্ত্রো ও তার বিপ্লবী বাহিনী হাভানা শহরে প্রবেশ করে। এটি কিউবায় বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় এবং বাতিস্তা শাসনের অবসান ঘটায়। কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতারা হাভানায় প্রবেশ করার পর কিউবার জনগণ তাদের অভিনন্দন জানায় এবং এই দিনটি কিউবায় বিপ্লবের মহান বিজয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে।

ছয়. চে গুয়েভারা : বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও কৌশলী নেতা

১. চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধতত্ত্ব এবং কিউবার বিপ্লবের কৌশলগত গুরুত্ব

চে গুয়েভারা কিউবার বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন। তিনি শুধু একজন যুদ্ধনেতা নন, বরং একজন তাত্ত্বিকও ছিলেন। যার গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখেছিল। গুয়েভারার মতে, গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল স্থানীয় জনগণের সমর্থন অর্জন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি বিপ্লবী শক্তি ছোট আক্রমণাত্মক বাহিনীর মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারবে, যা প্রথাগত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকর হবে। তার এই কৌশল কিউবায় বিপ্লবের সময়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়। কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ২৬ জুলাই আন্দোলনের অংশ হিসেবে গেরিলা বাহিনী ছোট ছোট আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, যা জনগণের ভিতরে চেতনা ও সমর্থন সৃষ্টি করেছিল এবং তা বিপ্লবী শক্তির জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুয়েভারা তার যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেন যে, বিপ্লবী শক্তির সর্বোচ্চ লক্ষ্য হতে হবে শত্রুর শক্তির মূল কেন্দ্রকে আঘাত করা এবং জনগণের মধ্যে একত্রিত সংগ্রামের আহ্বান জানানো। কিউবার বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুয়েভারা তার গেরিলা কৌশল এবং সংগঠনের মাধ্যমে একে সফল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

২. চে'র আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ভূমিকা ও আদর্শ

চে গুয়েভারা কিউবা ছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি কিউবায় সফল বিপ্লবের পর বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন। চে বিশ্বাস করতেন, সমাজতন্ত্র কেবল কিউবাতে প্রতিষ্ঠিত হলে চলবে না, এটি একটি বৈশ্বিক আন্দোলন হতে হবে, যা সব দেশের মানুষের জন্য

মুক্তির পথ দেখাবে। তিনি আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন এবং অন্যত্র এই আদর্শ বিস্তার করার চেষ্টা করেন।

চে'র আদর্শ শুধু কিউবায় নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তোলে। তার আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য অনেক মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং তাকে বিশ্বের অন্যান্য বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বের অন্য সব দেশে দমন-পীড়িত জনগণের মুক্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সাত. বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈরিতা

কিউবার বিপ্লবের পর কিউবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। ফিদেল কাস্ত্রো ও তার বিপ্লবী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা কিউবার জনগণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় কিউবা শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয় এবং কিউবীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার সম্পর্ক কখনোই শান্তিপূর্ণ ছিল না। মার্কিন সরকার কিউবা বিপ্লবের পর তা একটি তাত্ত্বিক ও কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছিল, যার ফলে তারা কিউবাকে তাদের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং কিউবার বিরুদ্ধে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই বৈরিতা ছিল কিউবার জন্য এক কঠিন রাজনৈতিক পরিসরে পড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি, যেখানে তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২. বে অব পিগস আক্রমণ এবং কিউবান মিসাইল সংকট

১৯৬১ সালে বে অব পিগসে (Bay of Pigs) যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কিউবা থেকে বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটানোর জন্য একটি সফল আক্রমণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CIA) কিউবার বিপ্লবী সরকার উৎখাত করার জন্য দেশটির শত্রুদের সমন্বয়ে এই আক্রমণ শুরু করেছিল, কিন্তু কিউবীয় সেনাবাহিনী এবং জনগণের দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে এই হামলা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এর ফলস্বরূপ কিউবা আরও শক্তিশালী হয়, এবং কাস্ত্রোর নেতৃত্বে জনগণের প্রতি সমর্থন আরও জোরালো হয়।

এরপর ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল সংকট (Cuban Missile Crisis)

বিশ্বের সামনে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় পারমাণবিক মিসাইল স্থাপন করে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি সৃষ্টি হয়। এই সংকট একদিকে কিউবা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ায়, অন্যদিকে বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং সোভিয়েত নেতা নিকিতা খ্রুশচেভের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সংকট শেষ হয়, তবে এটি কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের আরও অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আট. কিউবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিপ্লবের অবদান

১. শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা

কিউবা বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে দেশটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। বিপ্লবের আগে কিউবার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল এবং দারিদ্র্যপীড়িত। কিন্তু বিপ্লবের পর কিউবা শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার অভাব দূর করতে শুরু করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ঘটানো হয় এবং বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে কিউবার শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

স্বাস্থ্যখাতেও বিপ্লবী সরকারের অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিউবা একমাত্র দেশ হিসেবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা চালু করে, যেখানে জনগণের জন্য চিকিৎসা সেবা, হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের সেবা ছিল পূর্ণরূপে সরকারি খরচে। স্বাস্থ্যখাতের এই বিপ্লবী পরিবর্তন কিউবাকে বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যসেবায় সেরা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম করে তোলে। কিউবা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর জন্য একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য গভীরভাবে রাষ্ট্র দায়িত্বশীল।

২. আন্তর্জাতিক প্রশংসা এবং বাস্তবায়িত পরিবর্তন

কিউবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। বিশেষ করে কিউবীয় স্বাস্থ্যসেবা মডেলটি বহু উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। কিউবীয় চিকিৎসা সেবায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার কারণে দেশের জনগণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে সক্ষম হয় এবং মৃত্যুর হারও কমে আসে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কিউবা যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোরও নজর কাড়ে। কিউবার শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশ থেকে প্রশংসা পায়, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো কিউবা থেকে

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। কিউবা প্রায় প্রতি বছর পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রদের শিক্ষিত করার জন্য স্কলারশীপ প্রদান করে, যা আন্তর্জাতিকভাবে তার শিক্ষার মান ও সফলতা প্রমাণিত করে।

এসব বিপ্লবী পরিবর্তন কিউবার জনগণের জীবনে মৌলিক উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

নয়. কাস্ত্রোর নেতৃত্ব একনায়কতন্ত্র নাকি স্বাধীনতার রক্ষণ?

১. মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন

ফিদেল কাস্ত্রোর শাসনকাল নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, বিশেষত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনসংক্রান্ত অভিযোগে। কিউবার বিপ্লবের পর কাস্ত্রো সরকারের অধীনে বিরোধী দল ও রাজনৈতিক নেতা, বিশেষত যারা মার্কিন প্রভাবের সমর্থক ছিল, তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা হয়। সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনেককে কারাগারে পাঠানো হয় এবং কয়েকটি সশস্ত্র বিদ্রোহী দলের সদস্যদের ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। কিউবায় মুক্তমনা সাংবাদিকতা এবং রাজনৈতিক মতবিরোধের প্রকাশকে একরকম নিষিদ্ধ করা হয়, যার ফলে দেশটির আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে। যদিও কাস্ত্রো সরকারের পক্ষ থেকে এটি একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাদের দাবি ছিল—'শক্তিশালী বিপ্লবী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা অপরিহার্য'।

২. কাস্ত্রো সমর্থকদের দৃষ্টিতে তার নেতৃত্বের মূল্যায়ন

তবে কাস্ত্রোর সমর্থকরা তার শাসনকালকে একনায়কত্বের চেয়ে বেশি স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে মূল্যায়ন করেন। কাস্ত্রো বিশ্বাস করতেন, কিউবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য তাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে; বিশেষ করে আমেরিকার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে। তার শাসনামলে কিউবা আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দেশটি স্বাধীনভাবে নিজস্ব পথ তৈরি করতে সক্ষম হয়। কাস্ত্রোর নেতৃত্বের মাধ্যমে কিউবা তার আত্মমর্যাদা বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমতার মতো ক্ষেত্রে বড় ধরনের উন্নয়ন সাধন করেছে।

কাস্ত্রো সমর্থকরা তার নেতৃত্বকে একটি বিপ্লবী সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখেন, যা কিউবাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে। তারা বলেন, কাস্ত্রোর কঠোর শাসন এবং সিদ্ধান্তগুলোর মধ্য দিয়েই কিউবা একটি শক্তিশালী জাতীয় পরিচয় পেয়েছে এবং বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

কাস্ত্রোর নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য ছিল কিউবার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা, যা তার সমর্থকরা কৃতিত্বের দৃষ্টিতে দেখেন।

অতএব, কাস্ত্রোর নেতৃত্বের মূল্যায়ন একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণযোগ্য। কিছু পক্ষ তাকে একনায়ক হিসেবে দেখেন, তবে তার সমর্থকেরা তাকে স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করেন, যিনি বিশ্বে কিউবাকে অনন্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক কঠিন পথে এগিয়েছেন।

দশ. বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এবং আজকের কিউবা

১. লাতিন আমেরিকায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা

কিউবা বিপ্লব লাতিন আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে একটি বড় অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। কিউবা বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্রো ও তার সহযোগীরা বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত লাতিন আমেরিকার যেসব দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দারিদ্র্য প্রকট ছিল, সেসব দেশে কিউবা বিপ্লবের প্রভাব ব্যাপক ছিল। কাস্ত্রোর আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক নীতির মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ—যেমন বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, নিকারাগুয়া ও পেরুতে বিপ্লবী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠে। কিউবা এসব বিপ্লবী সংগঠনকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তিগুলোর প্রভাব বিস্তার করেছে।

কিউবার বিপ্লবী আদর্শই ছিল লাতিন আমেরিকার অন্যান্য বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু, যা দেশের মধ্যে এক সামাজিক সমতা, আর্থিক ন্যায্যতা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে। এই অনুপ্রেরণা আজও অনেক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য একটি মূল প্রেরণার উৎস হিসেবে রয়ে গেছে।

২. বর্তমান কিউবার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব

আজকের কিউবা বিশ্ব রাজনীতিতে একটি বিশেষ অবস্থানের অধিকারী, তবে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ জটিল। কিউবা ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে এবং তা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য নানা ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে কিউবা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তবে সে দেশের সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব এখনো শক্তিশালী। কিউবা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকট, বিদেশি বিনিয়োগের অভাব এবং সীমিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কিউবার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে কিউবা এখনো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বা বিপ্লবী আদর্শের প্রতি বিশ্বজনীন আগ্রহের দিক থেকে। দেশটি নানা আন্তর্জাতিক বিষয়ে, বিশেষত সশস্ত্র সংগ্রাম, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং মার্কিন আগ্রাসন বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে। কিউবা একদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে রয়েছে, অন্যদিকে একনায়কত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবাধিকার প্রশ্নগুলোও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে রয়েছে।

অতএব, কিউবা বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষত লাতিন আমেরিকা, কিউবা বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে দেশের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে কিউবা এখনো সংগ্রাম করছে।

এগারো. কিউবা বিপ্লব থেকে শিক্ষা

কিউবা বিপ্লব একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে যে, ছোট ও উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি সংকল্পবদ্ধ হয় এবং একযোগে কাজ করে, তাহলে তারা বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে লড়াই করতে পারে। কিউবা একসময় স্প্যানিশ উপনিবেশ শক্তির অধীনে ছিল এবং পরে মার্কিনির প্রভাবের মধ্যে ছিল, তারা নিজ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিশ্বে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফিদেল কাস্ত্রো ও তার সহযোগীরা বুঝতে পেরেছিলেন, বড় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে শুধু বাহ্যিক শক্তির বিরুদ্ধে নয়, দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। কিউবা বিপ্লবের মাধ্যমে কাস্ত্রো ও তার দলের নেতৃত্ব প্রমাণ করেছেন যে, একটি ছোট দেশও যখন জনগণের শক্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাজে লাগায়, তখন সে তার স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

এ ছাড়া কিউবা বিপ্লব তার জনগণের মধ্যে চরম আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে, যা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ছোট দেশগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রচনার উৎস :

১. বই — Cuba: A New History, রিচার্ড গট। ২. প্রবন্ধ — The Cuban Revolution: Origins, Course, and Legacy, মার্ক টুইন ইনস্টিটিউট। ৩. ব্রিটেনিকা। ৪. উইকিপিডিয়া।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব

যে বিপ্লব বদলে দিয়েছে ইতিহাসের গতিপথ

মূল : হোমা কাটোজিয়ান । অনুবাদ : সুলতান মাহমুদ

❝ ইরানের ইসলামি বিপ্লব ছিল আধুনিক যুগে একটি আদর্শিক বিপ্লবের সর্বোত্তম উদাহরণ, যা ধর্মকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। ❞

— এর্ভান আব্রাহামিয়ান, (A History of Modern Iran)

❝ ইরানের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি প্রমাণ করেছে যে, একটি জাতি নিজেদের পরিচয় বজায় রেখে আন্তর্জাতিক শক্তির বিরুদ্ধে সফল হতে পারে। ❞

— এডওয়ার্ড সাঈদ, (Orientalism)

বিপ্লবের অনন্য বৈশিষ্ট্য

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানে যে বিপ্লব ঘটেছিল, তা ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমাজের এক সম্মিলিত বিদ্রোহ। এই বিপ্লবের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমে ঘটে যাওয়া বিপ্লবগুলোর সাধারণ নিয়মকানুন থেকে বেশ আলাদা ছিল। অবশ্য এর কারণও ছিল—কারণ, তৎকালীন ইরান নামের রাষ্ট্রটি আসলে শুধু একটি সাধারণ স্বৈরাচারী শাসনের অধীনে পিষ্ট কোনো রাষ্ট্র ছিল না; বরং এটি ছিল এক চরম অথর্ব ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র, সমাজের বুকে যার কার্যত কোনো রাজনৈতিক বৈধতা ছিল না। ছিল না কোনো শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তিও।

পশ্চিমের অনেক মানুষের কাছে এটি ছিল এক গভীর ধাঁধার মতো, যার ফলে বিপ্লবের সফলতার প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। আরও সহজ করে বললে, ইরানি বিপ্লব নিয়ে তাদের মোহভঙ্গ হয়। পশ্চিমাদের পাশাপাশি আধুনিক রীতিনীতিতে বিশ্বাসী ইরানি এবং একসময় খামেনাইপন্থী স্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় নামা অনেকের কাছেও এই বিপ্লব হয়ে ওঠে 'রহস্যময়', 'অদ্ভুত' ও 'অকল্পনীয়' কিছু।

এক পশ্চিমা দার্শনিক তো রাখঢাক না রেখে সোজা বলেই বসেছিলে যে, এই বিপ্লব 'বিপথগামী', কারণ এটি একটি ইসলামিক রিপাবলিক বা ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই দার্শনিক আরও বলেন—'সমাজবিজ্ঞানে দেওয়া বিপ্লবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এমন কোনো ঘটনা আসলে ঘটারই কথা ছিল না। বা ঘটলেও অন্তত এই সময়ে এর সংঘটিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।' ঠিক এই মোহভঙ্গের কারণেই বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, অসংখ্য মানুষ ইরানি শাহ ও তার শাসনের অনুগত লোক বা দলগুলোর সঙ্গে যোগ দিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। তাদের আজব আজব অনেক যুক্তিও ছিল। যার মধ্যে মূল যুক্তি ছিল—তেলের দামের ঊর্ধ্বগতিতে লাগাম দিতেই মূলত আমেরিকা ও ব্রিটেন মিলে শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পেছনে কলকাঠি নেড়েছিল। আরও মজার বিষয় হচ্ছে, তারা এমন ধারণাও সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আসলে শাহের অধীনে ইরানে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, তা দ্রুত পশ্চিমা বাজারগুলো কেড়ে নিতে পারে বলে পশ্চিমাবিশ্ব ভীত হয়ে শাহের পতন ঘটিয়েছিল।

শাহের শাসনের পতনের আগে পর্যন্ত, ইরানি বিপ্লবের এই 'রহস্য' পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের চোখে কিছুটা লুকানো ছিল বলা যায়। সব লক্ষণ স্পষ্ট থাকলেও, বিশাল শান্তিপূর্ণ মিছিল, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে শাহকে উৎখাত করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সংহতি, সবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং আত্মত্যাগের কারণে সেগুলো একপ্রকার ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনাইর উপস্থিতি ছিল এক বিশাল প্রভাবক, যার প্রতিটি কথা অধিকাংশ ইরানি—আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী নির্বিশেষে সবাই—ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

পশ্চিমা মানদণ্ডের বাইরে ইরানি বিপ্লবের ব্যাখ্যা

পশ্চিমা বিপ্লবগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের জন্য প্রণীত বা প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ইরানি বিপ্লবকে বোঝা অবশ্যই সম্ভব। তবে, সরাসরি পশ্চিমা ইতিহাসের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এসব কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করলে, তখন আবার ইরানি বিপ্লবকে বোঝার মধ্যে অনিবার্যভাবে ভ্রান্তি দেখা দেবে। মস্তিষ্কে জট পাকিয়ে দেবে অনেক কিছুই। একপ্রকার ধোঁয়াশা তৈরি করবে। কার্ল পপার একবার যেমনটা বলেছিলেন : 'ইতিহাস' বলতে আসলে কিছু নেই; যা আছে তা হচ্ছে 'ইতিহাসসমূহ' বা 'বিভিন্ন ইতিহাস'—অর্থাৎ পপারের মতে, 'ইতিহাস' বলতে এমন কোনো একক ও চূড়ান্ত ঘটনা বা সত্য নেই, যা পুরোপুরি নিরপেক্ষভাবে ধরা সম্ভব। এটি সবসময় নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সমাজ বা সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বহুমাত্রিক ও প্রভাবিত হয়।

সেই হিসেবে বলা যায়—ইরানি বিপ্লব ও পশ্চিমে সংঘটিত বিপ্লবগুলোর মধ্যে

সবচেয়ে স্পষ্ট পার্থক্য হলো, পশ্চিমা বিপ্লবগুলোতে সংশ্লিষ্ট সেসব সমাজ বহু চিন্তা ও মতবাদে বিভক্ত ছিল, আর সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিগুলো সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। এই সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিগুলো আসলে রাষ্ট্রপক্ষের কাছে থেকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন ও সুবিধা পেত। কিন্তু ইরানি বিপ্লবে এ ধরনের কোনো বিভক্তি ও মতভেদ ছিল না। ঐতিহ্যবাহী রক্ষণশীল থেকে শুরু করে আধুনিক ইরানি, ধনী-বিত্তশালী থেকে শুরু করে গরিব-হতদরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র ইরান এক হয়ে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সমাজের কিছু ধনী শ্রেণির স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো আন্দোলনকে অর্থায়ন ও সংগঠিত করা অবশ্যই অযৌক্তিক মনে হতে পারে—বিশেষ করে যেখানে কিছু ব্যক্তি হয়তো নিরপেক্ষ ছিল, নতুবা বিশ্বাস করত যে, এই বিপ্লবের পেছনে মূলত আমেরিকার মতো শক্তিগুলো কলকাঠি নাড়ছে। একইভাবে, পশ্চিমা মানদণ্ডে পুরো রাষ্ট্রীয়যন্ত্রের (সামরিক বাহিনী ছাড়া, যারা শেষ পর্যন্ত সরে গিয়েছিল) অনির্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ ধর্মঘটে যাওয়াও অযৌক্তিক মনে হবে। অথচ ইরানি বিপ্লবে এই ধর্মঘটই বিপ্লবের সফলতার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। এমনিভাবে প্রায় সমগ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং আধুনিক শিক্ষিত গোষ্ঠীগুলোরও আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খামেনাই ও তার ইসলামি সরকারের আহ্বানে সমবেত হওয়াও পশ্চিমা বিচারধারায় অযৌক্তিকই ঠেকতে পারে।

বিপ্লবে ঐক্যের শক্তি ও অভিন্ন স্লোগান

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ছিল চরিত্রগতভাবে একটি খাঁটি ইরানি বিপ্লব—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমগ্র সমাজের এক অভূতপূর্ব জাগরণ। এই বিপ্লবে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল ইসলামি ধারা (যেমন : সাধারণ মুসলিম, মার্কসবাদী-মুসলিম ও গণতান্ত্রিক-মুসলিম) ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারা (যেমন : ফাদাই, তুদেহ, মাওবাদী, ট্রটস্কিবাদী ও অন্যান্য)। ইসলামি ও মার্কসবাদী দলগুলোর মধ্যকার সংঘাত কোনোভাবেই তাদের সম্মিলিত সংঘাতের চেয়ে কম তীব্র ছিল না। তারপরও তারা সকলেই শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং শাহের অনুগত রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত করার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জনসংখ্যার সেই বিশাল অংশ, যারা এই মতাদর্শগুলোর কোনোটি অনুসরণ করত না—এবং যাদের মধ্যে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল গুণগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—তারা পর্যন্ত শাহের শাসন বিলুপ্ত করার এই একক লক্ষ্যের পেছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। আপস ও দফারফা করে নেওয়ার যেকোনো প্রস্তাবকে তখন বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য মনে করা হতো। তখনকার প্রেক্ষাপটে আসলে শাহের পতন ছাড়া যদি অন্য কোনো সমাধানও আনা হতো, তারপরও জনগণ ধরে নিত, উদার

বুর্জোয়া তথা সমাজের এলিট শ্রেণিগুলো বিদেশি শক্তির (যেমন : আমেরিকা ও ব্রিটেন) প্রভাব বা নির্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এতে তারা জনগণের কাছে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক রূপে চিহ্নিত হতো।

বিভিন্ন বিপ্লবী দল ও তাদের বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী এবং নানামুখী কর্মসূচীর ভীড়েও শেষ পর্যন্ত সবার মুখে একটাই স্লোগান ছিল; ঐতিহাসিক ও সবচেয়ে প্রচলিত বহুল ব্যবহৃত স্লোগান: 'আগে তাকে (শাহকে) তাড়াও ... তারপর যা খুশি হোক' (ইঁ বেরাবাদ ... ওয়া হার চেহ্ মিখাহাদ বাশাবাদ)। পরবর্তী বছরগুলোতে অনেকেই তাদের এই মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তখন এমন কোনো কারণ বা প্রেক্ষাপট ছিল না আর, যা তাদের আরেকটু ভিন্নভাবে ভাবতে বাধ্য করবে। তিরিশ বছর পর, আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খামেনাইর প্যারিসের প্রধান সহকারী এবং বিপ্লব-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইবরাহিম ইয়াজদি ওয়াশিংটনে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন : 'তার সময়ে বিপ্লবী প্রজন্ম কীভাবে শাহকে অপসারণের লক্ষ্যের বাইরের সময়টাকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল।' অর্থাৎ ইয়াজদির মতে, শাহকে উৎখাত করা ছাড়া বিপ্লবীরা অন্য কোনো বিকল্প বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেনি। ফলে পরবর্তী সময়ে তারা বুঝতে পারে যে, শুধু শাহকে সরানোই যথেষ্ট ছিল না; ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হবে, সেটা ঠিক করা আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গণ-অংশগ্রহণ ও বিপ্লবের ধারাবাহিকতা

বিপ্লবের পুরো সময়টাজুড়ে বিভিন্ন শহর ও নগরে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তারা নিঃসন্দেহে এই পুরো মহাযজ্ঞে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতো—যদি না তেল খাত থেকে আয় করা লোকেরা এবং অন্যান্য বিত্তশালীরাও এই বিপ্লবে অর্থায়ন করত। এমনিভাবে যদি ন্যাশনাল ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানির কর্মচারী, উচ্চ ও নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিচারক, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, স্কুল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী প্রমুখ একসঙ্গে সাধারণ ধর্মঘটে যোগ না দিত, তাহলেও হয়তো এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়া আশঙ্কা ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, আধুনিক ও রক্ষণশীল, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষ যদি রাস্তায় বিশাল বিশাল মিছিল কিংবা বিক্ষোভ সভাগুলো অংশ না নিত এবং যদি সামরিক বাহিনী একত্রিত হয়ে আন্দোলনকে দমন করার সিদ্ধান্ত নিত, তাহলেও হয়তো পুরো চিত্রটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারত।

১৯০৬-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৯৭৭-১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত বিপ্লবগুলো বহু দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হতে পারে; তবে কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যে সেগুলো বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, এসব সাদৃশ্য আবার সেগুলোর মধ্যেকার অনেক ভিন্নতারও ব্যাখ্যা দিতে সাহায্য করে। সহজ কথায়, দুটি বিপ্লবই ছিল রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে সমাজের বিদ্রোহ, সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। ১৯০৬-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের সাংবিধানিক বিপ্লবে ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও শহুরে জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আরও বড় কথা হচ্ছে, এই সক্রিয়তা থেকে নেতৃস্থানীয় আলিম ও শক্তিশালী জমিদাররাও বাদ যায়নি। তাদের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের সফলতা কল্পনা করাও কঠিন। সমাজের সব মানুষের সম্মিলন দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একটি 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'-র নেতৃত্ব দিচ্ছে! সেই বিপ্লবেও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও এজেন্ডার প্রতিনিধিত্ব ছিল; কিন্তু বাস্তবে তারা সবাই স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রকে (এবং শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ আলি শাহকে) উৎখাত করার লক্ষ্যে একজোট হয়েছিল। যেহেতু রাষ্ট্র ঐতিহ্যবাদের পক্ষে ছিল, তাই বেশিরভাগ ধর্মীয় শক্তিও আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের পেছনে একত্রিত হয়েছিল। তবে এখানে অবশ্য তাদের সবার অংশগ্রহণ ঐক্যবদ্ধ রূপে ছিল না, অনেকটা বিক্ষিপ্তই ছিল বলা যায়।

বিপ্লবের পথে আপসহীনতা

সাংবিধানিক বিপ্লবের (১৯০৬-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) অনেক ঐতিহ্যবাহী সমর্থকও কিন্তু পরে অনুশোচনা করেছিল, ঠিক যেমনটা ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারির বিপ্লবে অংশ নেওয়া অনেক আধুনিকতাবাদী অনুশোচনা করেছিল। দুই শ্রেণির অনুশোচনার কারণ একই ছিল—অর্থাৎ বিপ্লবের ফলাফল তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে না মেলা। তবে সবচেয়ে চমৎকার বিষয় বোধহয় এটাই ছিল যে, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার পতন না ঘটা পর্যন্ত কোনো যুক্তি বা অজুহাতই তাদেরকে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করাতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। দুটি বিপ্লবেই এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যারা বুঝতে পেরেছিলেন—বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয়তো কিছুদিন পরে কিংবা আরও পারে বিপ্লবীদের বড় একটা সংখ্যাকে অনুতপ্ত করাবে; কিন্তু এরপরও তারা প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার সাহস করে উঠতে পারেনি। যেমন সাংবিধানিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে শায়খ ফজলুল্লাহ আর ফেব্রুয়ারি বা ইসলামি বিপ্লবের ক্ষেত্রে শাহপুর বখতিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তারা দুজনই ব্যর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাদের কোনো শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তি বা বিশাল সমর্থন ছিল না। অন্যভাবে বললে, সাধারণ মানুষ মনে করেছিল—তারা রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়েছেন। মুখে অস্বীকার করলেও গোপনে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। আসলে বাস্তবতা যেমনই হোক, যখন কেউ একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জালিম শাসকের পতনের চেয়ে কম কিছুতে আপস করতে রাজি হয়ে যায়, তখন তাকে সবাই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে। এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এমনকি 'আগে তাকে (শাহকে) তাড়াও ... তারপর যা খুশি হোক' (ইঁ বেরাবাদ ... ওয়া হার চেহ মিখাহাদ বাশাবাদ) স্লোগানের পেছনের ঘটনাও কিন্তু ঠিক এমনই।

১৭ ফেব্রুয়ারির বিপ্লব

আরব বসন্তের ঝড়ে গাদ্দাফির পতন

মোজাম্মেল হোসেন তোহা

❝ লিবিয়ার ১৭ ফেব্রুয়ারির বিপ্লব ছিল আরব বসন্তের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ, যা প্রমাণ করে—কোনো জাতি দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হলেও তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কখনো দমন করা যায় না। ❞

— মার্ক লিঞ্চ, (*The Arab Uprisings*)

❝ লিবিয়ার বিপ্লব স্বাধীনতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, কিন্তু তা একই সঙ্গে নতুন সমস্যারও জন্ম দেয়। রাজনীতি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাতিকে পুনর্গঠিত করার কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন। ❞

— জ্যাসন প্যাক, (*The 2011 Libyan Uprisings and the Struggle for the Post-Qaddafi Future*)

২০১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। আরব বসন্তের ধারাবাহিকতায় সেদিন লিবিয়াতেও শুরু হয়েছিল গাদ্দাফির বিরুদ্ধে আন্দোলন, যার ধারাবাহিকতায় আট মাস পর ঘটেছিল ৪২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা লৌহমানব গাদ্দাফির পতন। কিন্তু ঠিক কী কারণে, কীভাবে শুরু হয়েছিল এই বিদ্রোহ? আর ঠিক কীভাবেই বা গাদ্দাফির পতন ঘটেছিল? সেই ইতিহাসই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

এক. যেভাবে বিদ্রোহ দানা বাঁধে

ঘটনার শুরু ১৯৯৬ সালে। আফগানিস্তান ফেরত তিন লিবিয়ান যোদ্ধার স্থান হয় ত্রিপোলির আবু সেলিম কারাগারে। তখন সেই কারাগারে প্রায় ১৭০০ বন্দী ছিল, যাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ছিল—হয় আফগানিস্তানে আল কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদি সংগঠনের হয়ে যুদ্ধ করার অথবা গাদ্দাফির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার। কারাগারে খাবারের করুণ অবস্থা, বন্দীদের উপর গার্ডদের কঠোর নির্যাতন এবং বিচার ছাড়াই বছরের পর বছর আটকে রাখার সংস্কৃতি অনুধাবন করতে পেরে

সেই তিন যোদ্ধা সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক তাদেরকে সেখান থেকে পালাতে হবে।

তাদেরকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। জুন মাসের ২৮ তারিখেই তারা সুযোগ পেয়ে যায়। সেদিন বিকেলে তারা অসতর্ক অবস্থায় থাকা এক গার্ডকে আটকে ফেলে এবং তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে সবগুলো সেলের দরজা খুলে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই শত শত বন্দী তাদের সেল থেকে বেরিয়ে আসে। ছাদের ওপর থাকা গার্ডদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় ৭ জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় খোদ গাদ্দাফির ভগ্নীপতি, গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান আব্দুল্লাহ সেনুসি। তার কঠোর হুমকি ও বিভিন্ন সংস্কারের আশ্বাসে ২৯ তারিখ ভোরের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সকালের দিকে গার্ডরা কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর বন্দীদেরকে বিভিন্ন ব্লক ও সেলে পুনর্বিন্যাস করতে থাকে। যারা কম ঝুঁকিপূর্ণ অপরাধী ছিল এবং যারা সেল থেকে বের হয়নি, তাদেরকে সরিয়ে সিভিল ও মিলিটারি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। আর যারা সেল থেকে বেরিয়ে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল, তাদেরকে পলিটিকাল উইংয়ের ব্লকগুলোর মাঝে অবস্থিত খোলা মাঠে হাঁটাচলার সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর বেলা পৌনে এগারোটার দিকে শুরু হয় পৃথিবীর ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যাগুলোর একটি। ছাদের ওপর থেকে মাঠের বন্দীদের উপর প্রথমে পরপর দুইটি গ্রেনেড চার্জ করা হয়। এরপরই শুরু হয় অবিরাম মেশিনগানের গুলি বর্ষণ। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই আবু সেলিম কারাগারের ১৭০০ বন্দীর মধ্যে ১২৭০ বন্দীকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আবু সেলিম হত্যাকাণ্ডের শিকার ১২৭০ বন্দীর একজন ছিল পূর্বাঞ্চলীয় শহর বেনগাজির আইনজীবী ফাতহি তারবিলের ভাই ইসমাঈল তারবিল—যে কিনা ইসলামপন্থী মৌলবাদীদের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৮৯ সালে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এছাড়াও সেই হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিল তার শ্যালক ও চাচাতো ভাই। অন্য অনেকে ভয়ে চুপ করে থাকলেও ফাতহি ছিল ব্যতিক্রম। সে তার ভাই ও অন্য বন্দীদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল, সেটা জানার চেষ্টা করতে থাকে। বলা বাহুল্য, গাদ্দাফির সরকার তার এই কর্মকাণ্ডকে সুনজরে দেখেনি। ফলে তাকে বারবার গ্রেপ্তার হতে হয়।

২০০৯ সালে সে নিহত বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য 'দ্য অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য মার্টায়ার্স অব দ্য আবু সেলিম ম্যাসাকার' নামে একটি সংগঠন চালু করে। কিন্তু সরকারের চাপে শেষ পর্যন্ত তাকে সেটা বন্ধ করে দিতে হয়। ২০১১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ফাতহিকে মোট পাঁচবার গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে একবার তাকে সর্বোচ্চ দুই বছর বিনা বিচারে বন্দী থাকতে হয়েছিল। সর্বশেষ গ্রেপ্তার হয় সে ২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ঠিক গাদ্দাফি-বিরোধী অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে। আর তার এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় ২০১১ সালের আরব বসন্তের লিবীয় সংস্করণ।

দুই. বিদ্রোহ যখন গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়

২০১১ সালের শুরুর দিকে আরব বসন্তের উষ্ণ বাতাস লিবিয়ার গায়েও দোলা দিতে শুরু করে। প্রথমে তিউনিসিয়া আর তারপর মিসরের সরকারবিরোধী আন্দোলনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লিবিয়ানদের একাংশ—বিশেষ করে গাদ্দাফি সরকারের হাতে নিহত ও নির্যাতিতদের আত্মীয়-স্বজনরা এবং বিদেশে নির্বাসিত অ্যাকটিভিস্টরা লিবিয়াতেও সরকার পতনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জানুয়ারির শেষের দিক থেকেই তারা ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবে গাদ্দাফি-বিরোধী প্রচারণা চালাতে শুরু করে এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার বিভিন্ন সংস্কার ও অধিকতর স্বাধীনতার দাবিতে দেশব্যাপী 'ইয়াওমুল গাজব'—তথা ক্ষোভ দিবস পালনের আহ্বান জানাতে থাকে।

১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখটা নির্বাচনের পেছনেও অবশ্য একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। ২০০৬ সালের এই দিনে একটি ড্যানিশ পত্রিকায় রাসূল সা.-এর ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন ছাপানোর প্রতিবাদে বেনগাজিতে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিলে পুলিশ বাধা দেয়। বাধা পেয়ে বিক্ষোভকারীরা গাদ্দাফি-বিরোধী স্লোগান দিলে পুলিশ গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থলেই অন্তত ১২ জন নিহত হয়।

২০১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আসার আগেই গাদ্দাফির সরকার সতর্ক অবস্থান নেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলের দিকে গোয়েন্দা বিভাগের লোক ফাতহি তারবিলকে তার বাসা থেকে তুলে বেনগাজির হাওয়ারির ইন্টারনাল সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে যায়। ১৭ তারিখে বিক্ষোভের পরিকল্পনা থাকলেও তারবিলের গ্রেপ্তারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই শত শত বিক্ষুব্ধ মানুষ তার মুক্তির দাবিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্টারনাল সিকিউরিটি অফিসের সামনের রাস্তায় জড়ো হতে থাকে।

আবু সেলিম হত্যাকাণ্ডের শিকারদের বৃদ্ধা মায়েরা স্লোগান দিতে থাকে—'নুদি, নুদি, ইয়া বেনগাজি' ... অর্থাৎ জাগো, জাগো, হে বেনগাজি। শুরু হয় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ। পুলিশ নিরস্ত্র মিছিলের উপর লাঠিচার্জ, জল-কামান ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটে।

১৫ তারিখের মিছিলে মাত্র কয়েকশত মানুষ উপস্থিত হলেও পরদিন গ্রেপ্তারকৃত ও আহতদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা যোগ দেওয়ায় মিছিলের আকার বৃদ্ধি পায়। ১৭ তারিখে কয়েক হাজার নিরস্ত্র মানুষ শুধু পাথর ও লাঠি হাতে বেনগাজির 'কাতিবা' তথা মিলিটারি ব্যারাকের সামনে জড়ো হয়ে ভেতরে পাথর নিক্ষেপ করলে, ভেতরে অবস্থিত গাদ্দাফির সেনাবাহিনী মেশিনগান ও অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের ১৪.৫ এবং ২৩ মিলিমিটারের বুলেটের মাধ্যমে তার জবাব দেয়। নিহত হয় প্রচুর সাধারণ মানুষ।

১৭ তারিখ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় শহর দার্‌না, আল-বেইদা, আজদাবিয়া এবং তবরুকেও

সরকার বিরোধী মিছিল বের হয়। বিক্ষোভকারীরা লাঠি এবং পাথর নিক্ষেপ করে এবং পুলিশ স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের গুলিতে শতাধিক বিক্ষোভকারী নিহত হলেও পরবর্তীতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় এবং পূর্বাঞ্চলের জনগণের বড় একটা অংশের সমর্থন বিক্ষোভকারীদের পক্ষে থাকায় ১৮ তারিখের মধ্যেই আল-বেইদা, তবরুক, দারনাসহ বিস্তীর্ণ পূর্বাঞ্চল সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাকি থাকে শুধু বেনগাজির কাতিবা।

১৫ তারিখ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বেনগাজিতে মিছিলগুলো ছিল নিরস্ত্র সাধারণ জনতার, যাদের সম্বল ছিল শুধু লাঠি আর পাথর। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনের সংঘর্ষেই দুই শতাধিক মানুষ নিহত হওয়ায় জনগণ ছিল মরিয়া। অন্যদিকে ২০ তারিখ সকাল থেকে আবার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরাও জনগণের কাতারে যোগ দিতে থাকে। শুরু হয় সশস্ত্র বিদ্রোহ। সরকারের কাছে ভারী মেশিনগান, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান আর পদত্যাগকারী বিদ্রোহী সেনাদের কাছে কালাশনিকভ রাইফেল। সেদিন বিকেলে মাহদি মুহাম্মাদ জিউ নামে এক যুবক তার গাড়িতে দুটো গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে কাতিবার দেয়ালের সামনে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মাহুতি দেয়। ভেঙে পড়ে কাতিবার দেয়াল।

ভেতরে থাকা গাদ্দাফির সেনাদের অধিকাংশই পালিয়ে যায়। অবশ্য পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা ভেতরে থাকা সেনা—যারা বিদ্রোহীদের উপর গুলি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাদেরকে একটা রুমের মধ্যে আটকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় অন্তত আটজন। জিউর আত্মত্যাগের বিনিময়ে বেনগাজি গাদ্দাফির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। বিদ্রোহী জনতা কাতিবার ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের হস্তগত হয় গাদ্দাফির সেনাদের ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র। বেনগাজিসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চল কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক আইনজীবীর মুক্তি, কিছুটা সংস্কার, কিছুটা স্বাধীনতার জন্য; সেই আন্দোলন পুরোদস্তুর গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।

তিন. শকুনের থাবাও যখন এসে পড়ে

ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ শুধুমাত্র পূর্বাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, লিবিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর মিসরাতা, জাওইয়া, পার্বত্য শহর জিনতান, এমনকি রাজধানী ত্রিপোলিতেও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে গাদ্দাফির সরকারের আইনমন্ত্রী মুস্তফা আব্দুল জলিল—যিনি মাত্র কয়েকদিন আগেই বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনা করার জন্য বেনগাজিতে এসেছিলেন—পদত্যাগ করেন। ২২ তারিখে গাদ্দাফি তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল আব্দুল ফাত্তাহ ইউনুসকে বেনগাজিতে পাঠায় বিদ্রোহ দমন করার জন্য। কিন্তু ইউনুসও পদত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়।

একে একে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তেলমন্ত্রীসহ অন্যান্য প্রভাবশালী মন্ত্রীরাও পদত্যাগ করতে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, আমেরিকাসহ দশটি দেশের লিবিয়ান রাষ্ট্রদূতরা একযোগে পদত্যাগ করে। আরব লিগে লিবিয়ার সম্পূর্ণ প্রতিনিধিদল একসঙ্গে পদত্যাগ করে। বিদ্রোহীদের ওপর বোমা বর্ষণের নির্দেশ দিলে সেই নির্দেশ অমান্য করে দুজন লিবিয়ান পাইলট দুটো 'মাইরেজ এফ ওয়ান' ফাইটার জেট নিয়ে মাল্টায় পালিয়ে যায়।

বিদ্রোহের বিপরীত চিত্রও অবশ্য ছিল। গাদ্দাফির জন্মস্থান সিরত, পার্বত্য শহর বানিওয়ালিদ, দক্ষিণের সাবহা ও রাজধানী ত্রিপোলিতে প্রায় প্রতিদিনই গাদ্দাফির পক্ষে বিশাল বিশাল মিছিল বের হতো। মূলত বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ক'দিন পর থেকেই লিবিয়া কার্যত দুই ভাগ হয়ে পড়ে। সিরত ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ পূর্বাঞ্চল ছিল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে মিসরাতা ও জিনতান ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ পশ্চিমাঞ্চল ছিল গাদ্দাফির পক্ষে বা গাদ্দাফির নিয়ন্ত্রণে।

মুস্তফা আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের নবগঠিত এনটিসি সরকার প্রথমদিকে বিদেশি সাহায্য চাইতে অস্বীকার করলেও গাদ্দাফিবাহিনীর প্রবল বিমান আক্রমণের মুখে জাতিসংঘের সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়। পশ্চিমারাও গাদ্দাফিকে সরানোর এই মোক্ষম সুযোগকে লুফে নেয়। ১৭ মার্চ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোনো বিরোধিতা ছাড়াই লিবিয়াতে নো-ফ্লাই জোন কার্যকরের সিদ্ধান্ত এবং নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলিউশন-১৯৭৩ পাশ করা হয়, যার বলে জাতিসংঘ বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯ মার্চ সন্ধ্যায় যখন গাদ্দাফিবাহিনী বেনগাজির উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়, ঠিক তখনই ফ্রান্স লিবিয়াতে বিমান হামলা শুরু করে এবং গাদ্দাফিবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। এর পরপরই আমেরিকা শুরু করে 'অপারেশন অডিসি ডন' নামের বিশেষ অপারেশন, যার মাধ্যমে এক রাতের মধ্যেই ১১০টি টমাহক ক্রুজ মিজাইল নিক্ষেপের মাধ্যমে গাদ্দাফির এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। যার ফলে প্রায় নিশ্চিত পরাজয় এবং সম্ভাব্য গণহত্যা থেকে বেঁচে যায় বিদ্রোহীরা, আর পিছু হটতে বাধ্য হয় গাদ্দাফি বাহিনী।

কিছুদিনের মধ্যেই লিবিয়াতে আক্রমণের মূল দায়িত্ব গ্রহণ করে ন্যাটো। জাতিসংঘের প্রস্তাবে শুধু বেসামরিক লোকজনদেরকে রক্ষা করার কথা থাকলেও বাস্তবে ন্যাটো গাদ্দাফিবাহিনীর ওপর আক্রমণের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে থাকে। বিদ্রোহীরা আবার বেনগাজি থেকে শুরু করে রাসলানুফ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। গাদ্দাফি তার অস্ত্রভান্ডার খুলে দেয় এবং নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও মিলিটারি ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করে। তাদের প্রবল আক্রমণে বিদ্রোহীরা রাসলানুফ থেকে পিছু হটে তেল সমৃদ্ধ শহর ব্রেগায় গিয়ে

স্থির হয়। ব্রেগাতে দুই পক্ষের মধ্যে কয়েকমাস পর্যন্ত এই অচলাবস্থা বিরাজ করে।

চার. ত্রিপোলির শেষ প্রতিরোধ

মে-জুন-জুলাই মাসগুলোতে যুদ্ধ অনেকটা বৈচিত্র্যহীনভাবে চলতে থাকে। বিদ্রোহীরা ন্যাটোর সহযোগিতায় কিছুটা এগোয়, আবার গাদ্দাফির সেনাবাহিনীর আক্রমণে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এপ্রিলের ৩০ তারিখে ন্যাটোর বিমান হামলায় নিহত হয় গাদ্দাফির ছোট ছেলে সাইফুল আরব ও তিন দৌহিত্র; কিন্তু একই ভবনে থেকেও বেঁচে যায় গাদ্দাফি।

মে মাসের ১৫ তারিখে প্রায় তিন মাস ধরে অবরুদ্ধ থাকার পর মুক্ত হয় মিসরাতা। ২৮ জুলাই পার্বত্য এলাকা জাবাল নাফুসার (নাফুসা মাউন্টেইন্স) বিদ্রোহীরা নিজেদের এলাকা মুক্ত করে ত্রিপোলি অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। এই সময় কাতার প্লেনে করে মিসরাতায় আর ফ্রান্স প্যারাসুটের মাধ্যমে নাফুসা মাউন্টেইন্সে বিদ্রোহীদের অস্ত্র দেওয়ার মাধ্যমে তাদের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করে তোলে।

২৮ জুলাই খুবই রহস্যজনকভাবে বিদ্রোহীদের আর্মড ফোর্সের প্রধান কমান্ডার আব্দুল ফাত্তাহ ইউনুস নিহত হয়। ইউনুসের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই বিদ্রোহীরা নবোদ্যমে ব্রেগা আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে মিসরাতা ও জাবাল নাফুসার বিদ্রোহীরা একে একে জিলিতান, গারিয়ান ও জাওইয়া প্রভৃতি শহরের দখল নেওয়ার মাধ্যমে ১৬ আগস্টের মধ্যে ত্রিপোলিকে চারপাশের শহরগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

২০ আগস্ট—রমজান মাসের ২০ তারিখে বিদ্রোহীরা যখন ত্রিপোলিকে চারদিক থেকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে, ঠিক সেদিন ইফতারের পরপরই ত্রিপোলির তাজুরা, ফাশলুম, সুক-আল-জুমাসহ বিভিন্ন এলাকার জনগণ গাদ্দাফির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। ওপর থেকে ন্যাটোর আর ভেতর-বাইর দুদিক থেকেই বিদ্রোহীদের আক্রমণে গাদ্দাফিবাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এক রাতের মধ্যেই ত্রিপোলির অধিকাংশ এলাকা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ২১ তারিখ রাতে বিদ্রোহীরা ত্রিপোলির একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত গ্রিন স্কয়ারের নিয়ন্ত্রণ নেয়, যেটা মাত্র আগের দিন রাতেও গাদ্দাফি সমর্থকদের ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। এনটিসি সরকার গ্রিন স্কয়ারের নাম পরিবর্তন করে 'মাইদান আশ্‌শুহাদা'—তথা মার্টায়ার্স স্কয়ার নামকরণ করে।

তিন দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ২৩ তারিখে বিদ্রোহীদের হাতে গাদ্দাফির বাব আল আজিজিয়া কম্পাউন্ডের পতন ঘটে। ধীরে ধীরে আবু সেলিম, হাদবাসহ অবশিষ্ট এলাকাগুলোতেও বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীরা গাদ্দাফির ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজনদের বাড়িগুলো দখল করতে থাকে। মিডিয়াতে উঠে

আসতে থাকে ৪২ বছর ধরে অপ্রকাশিত গাদ্দাফির পরিবারের অকল্পনীয় বিলাসবহুল জীবনযাপন, মাটির নিচে তৈরি বিভিন্ন টানেল, পারমাণবিক আক্রমণ থেকেও রক্ষা পাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন গোপন আস্তানার চিত্র।

২৭ তারিখে পাঁচটি মার্সিডিজ বেঞ্জে করে গাদ্দাফির দ্বিতীয় স্ত্রী সাফিয়া, মেয়ে আয়েশা এবং দুই ছেলে মুহাম্মাদ ও হানিবাল সপরিবারে বর্ডার পাড়ি দিয়ে আলজেরিয়ার দিকে যাত্রা করে। তাদের সঙ্গে ছিল বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, ক্যাশ টাকা ও সোনার বার। বিভিন্ন রিপোর্টে এটাই উঠে আসে। গাদ্দাফি ও তার চার ছেলে সাইফুল ইসলাম, খামিস, সাদি ও মুতাসিম আত্মগোপনে চলে যায়। পতন ঘটে লৌহমানব হিসেবে পরিচিত গাদ্দাফির ৪২ বছরের শাসনের। গাদ্দাফির সমর্থকদের দখলে থাকে শুধু পার্বত্য এলাকা বানিওয়ালিদ, দক্ষিণের সাবহা, কুফরা ও গাদ্দাফির জন্মস্থান সিরত।

পাঁচ. একনায়ক যখন ইতিহাসের পাতায়

ত্রিপোলিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরপরই বিদ্রোহীরা নজর দেয় গাদ্দাফির দখলে থাকা অবশিষ্ট শহরগুলোর দিকে। এরমধ্যে সিরত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি কোস্টাল হাইওয়ের ওপর অবস্থিত। এ ছাড়া গাদ্দাফির জন্মস্থান হওয়ায় এবং বিদ্রোহের শুরু থেকেই গাদ্দাফির পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নেওয়ায় সিরতের প্রতি বিদ্রোহীদের বিশেষ ক্ষোভ ছিল।

রোজা ঈদের পরপরই, ২ সেপ্টেম্বর বিদ্রোহীরা বানিওয়ালিদ আক্রমণ করে। একইসঙ্গে তারা সিরতের দুদিকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নিয়ে সিরতকে এক প্রকার ঘিরে ফেলে এবং বারবার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে সময় বৃদ্ধি করতে থাকে। সিরতকে গাদ্দাফির সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই বিদ্রোহীরা আলোচনা এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সিরতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একটা নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এর মধ্যেই সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে সিরতে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে পুরো যুদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন এক গতিপথ পায়।

সিরতের রক্কম ওয়াহেদ (ডিস্ট্রিক্ট নাম্বার ওয়ান) নামক এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল মিসরাতি কাবিলার (গোত্রের)। স্বভাবতই তারা ছিল গাদ্দাফি-বিরোধী। কিন্তু সংখ্যালঘু হওয়ায় তারা এতদিন নিশ্চুপ ছিল। তাদের অনেকে এমনকি সবুজ পতাকা নিয়ে গাদ্দাফির পক্ষে মিছিলও করত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অনেকেই গোপনে স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিল।

এমনই এক পরিবার ছিল সাফরুনি পরিবার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে গাদ্দাফিবাহিনী সাফরুনি বড় ছেলেকে গ্রেপ্তারের জন্য তার বাড়ি ঘিরে ফেলে। ধরা

পড়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু—তাই সে ধরা না দিয়ে বিদ্রোহীদের চাঁদ-তারা খচিত তিন বর্ণের পতাকা নিয়ে বেরিয়ে আসে। শুরু হয় গোলাগুলি। সাফরুনিদের পুরো বাড়ি রকেট লঞ্চার দিয়ে ধসিয়ে দেওয়া হয়। সাফরুনি ও তার ছেলে মারা যায়। আর গাদ্দাফির পক্ষের মারা যায় পাঁচজন।

গোলমালটা বাঁধে সাফরুনির ছেলেকে নিয়ে। সে মারা গিয়েছিল ধারণা করে তাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়। কিন্তু লাশ গোসল করানোর জন্য বের করতে গিয়ে দেখা যায়, সে আসলে তখনো মরেনি। এই সংবাদ লোকাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে আর মিডিয়া তার স্বভাব অনুযায়ী ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জীবন্ত মানুষকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখার মতো এই অমানবিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে। এর ফল হিসেবে ক্ষিপ্ত মিসরাতার বিদ্রোহী যোদ্ধারা সিরত আক্রমণের জন্য দলে দলে এসে জমা হতে থাকে এবং সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সিরত আক্রমণ করে বসে।

১৫ সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা মিসরাতার যোদ্ধারা প্রথম সিরতে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রতিরোধের মুখে মূল শহরের ভেতরে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি তারা। এতে বাধ্য হয়ে শহরের বাইরে গিয়ে অবস্থান নিয়ে শহরের ওপর আক্রমণ করে। তাদের প্রবল আক্রমণে এবং ন্যাটোর মুহূর্মুহূ বিমান হামলায় মাত্র দুই ঘণ্টার যুদ্ধেই শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নিহত হয় শতাধিক, যাদের অধিকাংশই ছিল বেসামরিক নাগরিক।

পরদিন সকাল থেকেই সিরতের সাধারণ মানুষ সিরত ছেড়ে পালাতে থাকে। পেছনে রয়ে যায় শুধু গাদ্দাফির সৈন্যরা এবং আগের দিনের আক্রমণে নিহতদের প্রতিশোধপরায়ণ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মিসরাতার যোদ্ধারা সিরতকে চারদিক থেকে ঘিরে মাত্র ১৫ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসা বেনগাজির যোদ্ধারাও। অক্টোবরের ১৭ তারিখের মধ্যে বিদ্রোহীরা সিরতের প্রায় সবটুকু মুক্ত করে ফেলে। ততদিনে বানিওয়ালিদসহ লিবিয়ার সব শহরেই বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সাড়ে ১৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের লিবিয়ার মধ্যে গাদ্দাফির সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে শুধু সিরতের রক্কম এতনিন—তথা ডিস্ট্রিক্ট নাম্বার টু নামের মাত্র দুই বর্গ কিলোমিটারের ক্ষুদ্র একটি এলাকা।

অক্টোবরের ২০ তারিখে সকাল ৮টার দিকে এই রক্কম এতনিনের ভেতর থেকে গাদ্দাফিবাহিনীর প্রায় ৪০টি গাড়ির একটি বহর বের হয়ে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ন্যাটোর বিমান হামলায় সেই বহরের অন্তত ১১টি গাড়ি বিধ্বস্ত হয়। ততক্ষণে বিদ্রোহীরাও চারপাশ থেকে এসে সেখানে আক্রমণ শুরু করে। বেঁচে যাওয়া গাদ্দাফির সৈন্যেরা এদিক-সেদিক পালাতে শুরু করে। অনেকেই ঘটনাস্থলে মারা পড়ে। নিহতদের মধ্যে ছিল গাদ্দাফির

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবু বকর ইউনুস জাবির। আর জীবিত ধরা পড়ে গাদ্দাফির ছেলে মুতাসিম আর গাদ্দাফি নিজে।

ন্যাটোর হামলা ও বিদ্রোহীদের গোলাগুলি থেকে বাঁচতে গাদ্দাফি রাস্তার পাশে নির্মাণাধীন একটি সুয়েজ পাইপের ভেতরে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেই বিদ্রোহীরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে। কিল-ঘুষি-লাথি মেরে, রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতনের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গুলি করে হত্যা করে। তার ছেলে মুতাসিমকেও একইভাবে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। দীর্ঘ আট মাসের গৃহযুদ্ধ আর অন্তত ১০ হাজার মানুষের মৃত্যুর পর গাদ্দাফির ৪২ বছরের শাসনের রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। লিবিয়ায় শুরু হয় নতুন একটি অধ্যায়ে, যেখানে সবার চোখে স্বপ্ন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার; কিন্তু আশঙ্কা গোত্রগত লড়াই, বিভেদ ও বিদেশি শক্তির আগ্রাসনের।

গাদ্দাফির মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত হয়েছে বহু বছর। লিবিয়া স্বৈরশাসকের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে ঠিকই, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তারা গণতন্ত্রের পথে কিছুটা এগিয়েও ছিল। কিন্তু রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা, অনভিজ্ঞতা, অর্থ ও ক্ষমতার মোহ এবং যুদ্ধের সময় মিলিশিয়াদের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়া অস্ত্রের কারণে মানুষ আজও তাদের বিপ্লবের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। বরং বিভিন্ন শহর আর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শিক ও স্বার্থগত দ্বন্দ্ব এত চরম আকার ধারণ করেছে যে, ফেব্রুয়ারির বিপ্লব আদৌ কখনো সাফল্যের মুখ দেখবে কি না—সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

হেফাজতে ইসলামের উত্থান এবং ১৩-এর শাপলা বিপ্লব

মাওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী

❝ হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি করেছে। চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিজয়ের আগে আগে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ দরকার ছিল, হেফাজতে ইসলাম সেটার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছে। ❞

— শায়খ হারুন ইজহার (চিরায়ত : শাপলানামা, ৩৭২ পৃ.)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে 'হেফাজত ইসলাম' বাংলাদেশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১৩ সালের শাপলা বিপ্লব বাদ দিয়ে এই সময়কে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। হেফাজতে ইসলাম অরাজনৈতিক সংগঠন হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর কারণেই অনেক পরিবর্তন এসেছে। যে সময়ের গর্ভে হেফাজতে ইসলামের জন্ম, সেখানে চোখ বুলালে দেখা যায় বাঙালি মুসলমানদের লালিত বিশ্বাস, তাহজিব-তামাদ্দুনের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার মহান দ্বায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয়েছিল হেফাজতের অভিযাত্রা।

হেফাজতের এই উত্থান অনিবার্য ছিল। কারণ, ইসলাম হলো এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস। ইসলামই তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—একাত্তরোত্তর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাংলাদেশে একদল পশ্চিম ও কলকাতাসক্ত এলিট শ্রেণির কালপ্রিটরা ইসলামবিরোধী চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। যার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইসলাম সর্বদাই এ কালপ্রিটদের ষড়যন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছিল। সংবিধান, শিক্ষানীতি, পাঠ্যসূচি, শিল্প-সাহিত্য সবখানেই ধর্মকে উপেক্ষা করা হচ্ছিল। ধর্মকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মোকাবিলা করা হচ্ছিল। শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকেও দেশকে ইসলামহীন করার সমস্ত প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল। ফলে কাদিয়ানিরাও গলা উঁচু করে মানুষকে ঈমানহীন করা শুরু করল। তা-ও আবার ইসলামের নাম ভাঙিয়ে। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বেড়ে গেল

মিশনারিদের খ্রিষ্টান বানানোর অভিযান, তা-ও আবার সেবার নাম বিকিয়ে। মিডিয়া চলে গেল হিন্দুত্ববাদী রাবীন্দ্রিক শক্তির হাতে। আধুনিকতার নামে আমদানি হচ্ছিল নাস্তিক্যবাদ। বস্তুবাদী পশ্চিমাদের নগ্ন সংস্কৃতি দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল দেশের শহর-নগর। এ সময় দেশের মানুষ এমন এক কণ্ঠস্বরকে খুঁজে ফিরছিল, যা মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়াবে। তাদের স্বার্থের কথা বলবে। তাদের শঙ্কিত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করবে। তখন হেফাজতই সেই কণ্ঠস্বরের ভূমিকা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল।

শাপলা বিপ্লবের কারণ

'হেফাজত' উচ্চারণ করলেই শাপলার কথা স্মরণ হয়। হেফাজতের অবদানের প্রশ্ন করা হলে শাপলা দিয়েই জবাব দেওয়া হয়। কারণ, শাপলার জাগরণই ফুঁ দিয়ে নিভিয়েছিল শাহবাগকে।

শাহবাগ! কী ছিল সে শাহবাগ? শুধু ধর্মাবমাননা ও মোমবাতি জ্বালানো! কেবল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি!

না, মূলত শাহবাগ ছিল বিগত চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসা প্রচ্ছন্ন ইসলাম বিরোধিতার চূড়ান্ত এক অধ্যায়। বাংলাদেশে যারা ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কাজ করেন, তাদের পাহাড়প্রতিম আশঙ্কা, অদম্য রোমান্টিকতা, কঠোর ইসলামবিদ্বেষ, চূড়ান্ত মিডিয়াবাজির ওপর ভর করে বাংলাদেশে একটা রাবীন্দ্রিক বামপন্থা এবং চরম সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়েছিল শাহবাগের মাধ্যমে।

শাহবাগের অন্যতম উদ্যোক্তা নাস্তিক ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীন দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন, 'আমরা ধার্মিক মৌলবাদীদের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই ব্লগে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলাম। শাহবাগ সফল হয়েছে। কারণ মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের নির্মমতার ব্যাপারে আবেগাক্রান্ত।' আসিফ মহিউদ্দীনের বক্তব্য অনুসারে এমনটা মনে হয়—যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেবল একটি সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল শাহবাগে। মূলত এটি ছিল সেক্যুলার বাংলাদেশ তৈরির আন্দোলন, ধর্মীয় দলগুলোকে প্রতিহত করার আন্দোলন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় হেফাজত। হেফাজত শাহবাগকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। শাহবাগের বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমানকে জাগিয়ে তুলেছিল। সেই জাগরণের বিরুদ্ধে কুচকাওয়াজ হয়েছিল শাপলা চত্বরে। শাহবাগ পেরে ওঠেনি। জিতে যায় হেফাজত, জিতে যায় বাংলাদেশ, জিতে যায় বাংলাদেশের তাওহিদি জনতা। এই বিজয়ের কারিগর শাপলার জাগরণ। শাপলার রক্ত। তাই সংগত কারণেই বলা হয়ে থাকে, শাপলার জাগরণই হেফাজতের সর্বশ্রেষ্ঠ কারনামা ও অবদান এবং একই কারণে বলা যায়—হেফাজত মানে শাপলা, শাপলাই হেফাজত।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, শাপলা-শাহবাগকে মিটিয়ে দিলেও শাপলাকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে অভিহিত করা কতটুকু সংগত? রক্তের বন্যা, লাশের স্তূপ, গুম, খুন ও জেল-জুলুমের যে অন্তহীন ফিরিস্তি, এসবকে তো কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। এর উত্তরে আমরা শাপলাকে একটু ব্যাখ্যা করব। যদি শাপলা আন্দোলনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়, তবে এটাকে বিপর্যয় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করি, তাহলে শাপলা শুধু বিজয়ী শক্তি নয়—বরং শাপলার সুদূরপ্রসারী প্রভাব জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বত্র যেমনভাবে ছড়িয়ে আছে, তেমনই নতুন প্রজন্মকে পথের দিশা দিচ্ছে। তাতে শাপলাকে বলা যায় আরেকটি 'ফাতহুম মুবিন'।

শাপলা জাগরণের প্রাসঙ্গিকতা

শাপলার আগের সময় ও শাপলাত্তোর সময়কে গভীর দৃষ্টিতে বুঝতে চাইলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে—'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ'। কিন্তু আফসোস, বিষয়গুলো অনেকেই বুঝতে চান না। ফলে শাপলাকে ভুলে যেতে বসেছে শাপলাপক্ষীয় নতুন প্রজন্ম। তারা শাহবাগকে শুধু গণজাগরণ মঞ্চ হিসেবে চেনে আর শাপলা মানে বুঝে ক্ষয়, রক্তের অপচয়। তারা শাপলার তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় বুঝতে চায় না। শাহবাগের পরাজিত শক্তির কপালে পরাজয়ের যে ক্ষতচিহ্ন এখনো ফুটে আছে, সেটা তারা দেখতে চায় না; দেখার চেষ্টাও করে না। তারা শুধু জাতে উঠতে চায় আর শিল্প-সাহিত্যের নামে হীনম্মন্যতার মানচিত্র আঁকে।

মনে রাখতে হবে, শাহবাগই হেফাজতের একমাত্র প্রতিপক্ষ নয়। কেবল শাহবাগের মোকাবিলার জন্যই হেফাজতের জন্ম হয়নি। শাহবাগ আন্দোলনের উত্থানের প্রায় তিন বছর আগেই হেফাজত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শাহবাগপূর্ব সময়ে হেফাজতের কার্যক্রম, কর্মসূচি ও কর্মপন্থাকে কোনোভাবেই ছোট ও গুরুত্বহীন করে দেখার সুযোগ নেই। হেফাজত তার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। এটা বাঙালি মুসলমানদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্ন এবং বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণেই। কিন্তু হেফাজত নিয়ে কথা উঠলে শুধুই শাপলাকেন্দ্রিক জাগরণ ও শাপলাউত্তর কর্মকাণ্ডের বয়ানই শোনা যায়। অথচ সামগ্রিকভাবে হেফাজতকে বুঝতে হলে তার উত্থানকাল থেকে তাকে মূল্যায়ন করতে হবে। তাই আমরা এখানে হেফাজতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের হালচাল, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও কর্মপন্থা দেখার চেষ্টা করব। তাহলে বুঝতে পারব, হেফাজত কীভাবে এবং কোন পথ ধরে এগিয়েছে।

হেফাজত প্রতিষ্ঠার সাতকাহন

ক্যালেন্ডারের পাতায় তখন বড় করে লেখা ২০১০, দেশের আকাশে দেখা দেয় দুঃসময়ের কালো মেঘের ঘনঘটা। সংবিধান থেকে আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস তুলে ফেলার ষড়যন্ত্র, ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন, বিতর্কিত ও ধর্মবিরোধী নারীনীতি পাশকরণ; এসব বিষয় ক্রমেই পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলছিল। ওই সময় চট্টগ্রামের একদল সচেতন আলিম শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তারা এ বিষয়ে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরুব্বি, ইসলামপ্রিয় মানুষের অবিসংবাদিত অভিভাবক, তৎকালীন হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা আহমদ শফীর রাহ.-এর সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনিও উৎকণ্ঠিত হলেন।

আল্লামা আহমদ শফী চট্টগ্রামের সমস্ত মাদরাসার পরিচালক এবং শীর্ষ উলামায়ে কিরামকে হাটহাজারী মাদরাসায় আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯ জানুয়ারি ২০১০ সালে তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই বাঙালি মুসলমানদের ঈমান-আকিদার সুরক্ষা এবং ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের সার্বিক সম্মতিতে একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন করা হয়। নাম নির্বাচন করা হয় 'হেফাজতে ইসলাম'। উপস্থিত উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিতে আল্লামা আহমদ শফীকে আমির ঘোষণা করা হয়। মুফতি আবদুর রহমান রাহ. হন সিনিয়র নায়িবে আমির। আর মাওলানা আবদুল হালীম বুখারি রা. হন নায়িবে আমির। সুলতান যওক নদবি রা. মহাসচিব ও আবদুল মালিক হালীম নির্বাহী মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হন।

আলহামদুলিল্লাহ, হেফাজতের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত থাকার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে আমার। প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মাঠে নেমে আসে হেফাজতে ইসলাম। ধর্মহীন শিক্ষানীতি, বিতর্কিত নারীনীতি, সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বাতিলের প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয় চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে। সমাবেশকে কেন্দ্র করে হেফাজত থেকে বেশ প্রচারণা চালানো হয়। জনসচেতনতার জন্য বিতর্কিত আইন নিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়। চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। উলামায়ে কিরাম ও তাওহিদি জনতার এই জাগরণে সরকার ও প্রশাসন ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সমাবেশের দিন ঘনিয়ে আসে। উত্তর চট্টগ্রাম থেকে সমাবেশমুখী গাড়ির বহর এসে জড়ো হতে থাকে হাটহাজারী মাদরাসার সামনে। এদিকে সমাবেশে যোগদান করার ব্যাপারে তখনো কেন্দ্র থেকে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রশাসনের মারমুখী অবস্থানের কারণে আল্লামা আহমদ শফী বেশ দোটানায় ভুগছিলেন। ছাত্রদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাকে পেরেশান করে তুলছিল। এ সময় আল্লামা জুনায়েদ

বাবুনগরী, মাওলানা সলিমুল্লাহ ও আমি আশরাফ আলী নিজামপুরীসহ কয়েকজন আলিম হজরতের কক্ষে প্রবেশ করি। আমাদের বক্তব্য ছিল—এখন পিছু হটার সুযোগ নেই। এতে আমাদের দুর্বলতাই প্রমাণিত হবে। ধর্মবিরোধী শক্তি দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। তখন চট্টগ্রাম লালদীঘির সমাবেশে যোগদান করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। তারপর শুরু হয় সমাবেশ অভিমুখী সম্মিলিত যাত্রা।

বারুদের আঘাতে বিপ্লবের জন্ম

কাফেলা যখন হাটহাজারী থেকে বালুছড়া নামক স্থানে পৌঁছায়, তখন পুলিশ বাহিনী বাধা প্রদান করে এবং এক পর্যায়ে গোলাগুলি শুরু করে। হামলা করে আল্লামা আহমদ শফীর গাড়িতে। হজরতের গাড়িতে তৎকালীন নাজিরহাট মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইদরিস সাহেব রাহ., আমি (আশরাফ আলী নিজামপুরী), হজরতের খাদেম মাওলানা শফীসহ আরও দুজন ছাত্র ছিল। হজরত ও আমরা নিরাপদ থাকলেও গুলিবিদ্ধ হয় অনেক ছাত্র। গ্রেফতার করা হয় নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ছাত্রকে এবং হাটহাজারী মাদরাসার একজন ছাত্র শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে। 'শহিদ মুহাম্মাদ রফীক'। হেফাজতের শহিদি মিছিলের প্রথম অভিযাত্রী ছিলেন শহিদ রফীক। পরবর্তী সময়ে সেই মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছিল। কবি আল মাহমুদের ভাষায়—'আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি। কেউ পাথরে, কেউ তাবুর ছায়ায়, কেউ মরুভূমির উন্ন বালি, কিংবা সবুজ কোনো ঘাসের দেশে চলছি।' আল্লামা আহমদ শফীর গাড়ি-বহরে হামলার সংবাদ শুনে ফুঁসে উঠে সমগ্র বাংলাদেশ; কারণ বাংলাদেশে এমন কোনো থানা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে হাটহাজারী মাদরাসার শিক্ষার্থী নেই। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় সবখানে। ঢাকা, বি-বাড়িয়া, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী কক্সবাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় এই ঘটনার প্রতিবাদ হতে থাকে। মূলত এই ঘটনার মাধ্যমে দেশের মানুষ হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে। চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে হেফাজতের আবেদন ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে। এর কিছুদিন পরই দেশের পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে হেফাজতকে আঞ্চলিক সংগঠন থেকে সর্বজনীন ও জাতীয় সংগঠন হিসেবে রূপদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ২০১২ সালের জুন মাসে উলামা মাশায়েখ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় দেশের সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হাটহাজারী মাদরাসায়। এই সম্মেলনে নতুন করে ঘোষণা করা হয় হেফাজতে ইসলামের দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ কমিটি।

শাহবাগের উত্থান

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জামায়াত নেতা মরহুম কাদের মোল্লাকে যুদ্ধাপরাধের

অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ সময় 'ইমরান এইচ সরকার' নামক একজন নাস্তিকের নেতৃত্বে একদল ব্লগার অ্যাকটিভিস্ট তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে শাহবাগ মোড়ে আন্দোলনে নামে। রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও মিডিয়ার পূর্ণ সহযোগিতায় অল্প দিনেই জমে ওঠে শাহবাগ আন্দোলন। সরকারের নিকট পেশ করা হয় ছয় দফা দাবি। বলা হয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধপরাধীদের বিচারের মুখোশ লাগিয়ে মূলত শাহবাগ ছিল ধর্মবিরোধী আন্দোলন। কিন্তু অল্পদিনেই তাদের এই মুখোশ খসে পড়ে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবমাননা, ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার, ধর্মীয় প্রতীকসমূহ নিয়ে ব্যঙ্গ ও হাস্যরস করা শাহবাগের নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে পরিণত হয়। এ সময় প্রতিবাদে জেগে ওঠে হেফাজতে ইসলাম। প্রতিবাদ করেন আল্লামা আহমদ শফী। কিন্তু শাহবাগীরা থামছেই না।

ওই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি, হাটহাজারীতে আল্লামা আহমদ শফীর সভাপতিত্বে একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েকদিন পরই সেই চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠির শিরোনাম ছিল 'শাহবাগের ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেগে উঠুন'। এই চিঠিতে শাহবাগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননা, ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও কটূক্তির কথা উল্লেখ করা হয় এবং সরকারকে এসব বন্ধের দাবি জানানো হয়। সবশেষে দেশের তাওহিদি জনতাকে ঈমান-আকিদা এবং ইসলামের প্রতীকসমূহের হেফাজতের পক্ষে সচেতন ও সোচ্চার হওয়া জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি আল্লামা আহমদ শফীর পক্ষ থেকে বলা হয়—দেশের প্রতিটি প্রান্তে নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে দুর্বার ও ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার প্রথম পাতার অর্ধেকজুড়ে ছাপানো হয় এই খোলা চিঠি। দেশের প্রতিটি প্রান্তে, মাদরাসা, মসজিদে পৌঁছে যায় আল্লামা আহমদ শফীর সেই জাগরণী আহ্বান। সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

হেফাজত ঘোষিত কর্মসূচি

ঘটনাপ্রবাহে ৯ মার্চ উলামা-মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশের আলিম সমাজের অংশগ্রহণে ঐতিহাসিক এক সম্মেলনে পারিণত হয় এই আয়োজন। এখানেই ১৩ দফা দাবি উত্থাপিত হয় এবং সরকারের কাছে ১৩ দফা দাবি জানানো হয়। এই সম্মেলনে হেফাজতের পরবর্তী সময়ের কর্মসূচিসমূহ ঘোষিত হয়—

ক. ২ মার্চ প্রতিটি উপজেলায় মানববন্ধন।

খ. ১৫ মার্চ বাদে জুমা বিক্ষোভ মিছিল।

গ. ২২ মার্চ সব মসজিদে ১ ঘণ্টা অবস্থান।

ঘ. ২৫ মার্চ উপজেলা পরিষদ ঘেরাও।

ঙ. সবশেষ ৬ এপ্রিল ঢাকা অভিমুখী লংমার্চ।

১৩ দফার প্রকাশের কিছুদিন পরই বিভিন্ন মহল থেকে ১৩ দফার তীব্র সমালোচনা ও অপব্যাখ্যা করা হয়। এই দাবিগুলোকে মধ্যযুগীয় বলে অভিহিত করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হেফাজত ১৩ দফার ব্যাখ্যা প্রকাশ করে।

১৩ দফা এবং সাধারণ পরিসংখ্যান

মূলত ১৩ দফার মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট। হেফাজত দেশের ধর্মীয় মহলের অভিভাবক হিসেবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি আন্দোলন শুরু করার পর অনেকে গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ১৩ দফার চারটিতেই নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট দাবি জানানো হয়েছে। প্রায় ১৫ শতাংশ দাবি ইসলামবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট। এই ১৫ শতাংশই মূলত হেফাজতের আন্দোলনের মূল ফোকাস। ২৩ শতাংশকে সাংস্কৃতিক ও সহযোগী দাবি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। এতে যদিও সরাসারি নিরাপত্তা, ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিষয়টি হাজির নেই, তবে ২৩ শতাংশ সাংস্কৃতিক দাবির সঙ্গে ইসলামবিদ্বেষ ও মুসলিম রাষ্ট্রের দাবির বিশেষ সম্পর্ক আছে। আর যেহেতু সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ থেকেই নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তাই ফলে এই ২৩ শতাংশকে বিচ্ছিন্ন ভাবলে হবে না। বাকি ত্রিশ শতাংশ মুসলিম রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট দাবি। এগুলো আলিমদের সর্বকালীন দাবি। ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করতে হবে বা অন্তত ইসলামবিরোধী আইন পাশ করা যাবে না, যার অংশ হিসেবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা, খ্রিষ্টান মিশনারিদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পাশাপাশি নারী ও শিক্ষানীতির ধর্মবিরোধী ধারা বাতিলের আহ্বান জানানো হয়।

সতত প্রাসঙ্গিক শাপলা বিপ্লব

২০১৩ সালের মার্চ মাসের ঘোষিত সমস্ত কর্মসূচি সফলভাবে পালন করা হয়। আন্দোলনের সমস্ত সিঁড়ি অতিক্রম করে হেফাজত পৌঁছে যায় ঢাকার দোরগোড়ায়। শাহবাগীদের হরতাল, সরকারের হুমকি ও আস্ফালন সবকিছু উপেক্ষা করে ঢাকায় ঘটে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ গণজাগরণ। সারাবিশ্ব এই দিন নতুন করে জানতে পারে—এ মাটি ইসলামের ও মুসলমানদের। তিতুমীর ও শরীয়তুল্লাহর সন্তানরা আজও বেঁচে আছে। এর পরের ঘটনা সবারই জানা। আমরা শুধু হেফাজতের সূচনা

থেকে শাপলা পর্যন্ত যে ঘটনা-প্রস্থ, তা দেখাতে চেয়েছি। এতে দেখা যায়, কীভাবে একটি মহাজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

হেফাজতের কর্মসূচিগুলোর দিকে যদি খেয়াল করা হয় তাহলে বোঝা যাবে, শাপলা পূর্ববর্তী সময়ের হেফাজতের সাংগঠনিক কৌশল কেমন ছিল। এতে শাপলা পরবর্তী সময়ের হেফাজতের বিপর্যয়ের কারণও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। একটি বাস্তবতা হচ্ছে—শাপলা বিপ্লবের পর হেফাজত আর সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি। শাপলার সেই জাগ্রত হেফাজত ঝিমিয়ে পড়েছে পরবর্তী সময়ে। ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় চাপ ও ভয়াবহ নেতৃত্বশূন্যতা হেফাজতকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, হেফাজত কি টিকে থাকতে পারবে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে—বাংলাদেশে যত দিন মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে, হেফাজত ততদিন প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। হেফাজতের প্রয়োজনীয়তা ফুরাবে না। হেফাজত এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যা করেছে, তা ইতিহাস হয়ে থাকবে শত-সহস্র বছর। হেফাজতের আবির্ভাব যদি না হতো, তাহলে এ দেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত—তা সমাজচিন্তক ও বিজ্ঞমহলই ভালোভাবে অনুধাবন করবেন। কারণ হেফাজত নামক বৃক্ষের গোড়ায় পানি নয়, ঈমানদারের তাজা রক্ত ঢালা হয়েছে।

বুরকিনা ফাসো : বিপ্লব, বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের আঁতুড়ঘর

জমির মাসরুর

❝ ইব্রাহিম ত্রাওরের অভ্যুত্থান বুরকিনা ফাসোর সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক নতুন নেতৃত্বের আগমন নির্দেশ করে, যারা দেশে নিরাপত্তা সংকট মোকাবিলায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে আগ্রহী। ❞

❝ ত্রাওরের নেতৃত্বে বুরকিনা ফাসো সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে বাস্তবতা তো এটাই যে, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য নানামুখী পরিকল্পনা প্রয়োজন। ❞

— আল-জাজিরা, সাংবাদিক প্রতিবেদন : ২০২২

এক. উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা : বুরকিনা ফাসোর আত্মপ্রকাশ

বুরকিনা ফাসো পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। সাউদার্ন ফরেস্ট ও সাহারা মরুভূমির মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। উত্তর ও পশ্চিমে মালি, পূর্ব-উত্তরে নাইজার, দক্ষিণ-পূর্বে বেনিন এবং দক্ষিণে আইভরি কোস্ট—ঘানা ও টোগোর সঙ্গে সীমান্ত ভাগাভাগি দেশটির। রাজধানী উগাদুগুর ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। ইতিহাসপূর্ব কাল থেকেই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপট। আধুনিককালে দেশটিতে উপনিবেশ গেড়ে বসেছিল ফরাসিরা। তখনো অবশ্য দেশটি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করে পারেনি। 'ফুলতা উলয়া' নামেই চলত তার পরিচিতি। পশ্চিম আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশটিতে উপনিবেশ কায়েম করার পেছনে ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল বেশ গভীর। উপকূলীয় অঞ্চলের বেনিন, আইভেরিকোস্টসহ মরু অঞ্চলের মালি ও নাইজারে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখার হাতল ছিল এই বুরকিনা ফাসো। পুরো অঞ্চলে ফরাসি সৈন্যদের যাতায়াতের জন্য সংযোগ সেতু হিসেবেও ব্যাবহার করা হতো দেশটিকে। ১৯৬০ সালে দেশটি ফুলতা উলয়া নামেই ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে বুরকিনা ফাসো নামে। এখনো পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রামাঞ্চলে। বাণিজ্য ও অর্থনীতি

পুরোটাই কৃষিনির্ভর। মরুভূমির মধ্যখানে অবস্থিত হলেও চাষাবাদের জন্য বেশ উপযোগী। জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই মুসলিম ধর্মাবলম্বী। দেশটির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিস্তারিত আলাপ সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধে করা সম্ভব হবে না।

দুই. সামরিক অভ্যুত্থান ও স্বৈরশাসনের দীর্ঘ অধ্যায়

স্বাধীনতার পর থেকেই বুরকিনা ফাসোর রাজনীতি বেশ টালমাটাল। স্বাধীনতার ৬৫ বছরে রাষ্ট্রটি মুখোমুখি হয়েছে কমপক্ষে নয়টি অভ্যুত্থান, বিপ্লব ও বিদ্রোহের। ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু করে ২০২২ সাল পর্যন্ত বুরকিনা ফাসোতে মোট নয়টি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্রথম অভ্যুত্থানে আবু বকর সাঙ্গোলি লামিজানা দেশটির প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মরিস ইয়ামিওজোকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরপর ১৯৮০ সালে সায়ে জেরবো এবং ১৯৮২ সালে গ্যাব্রিয়েল ইয়োরিয়ান সুমি যথাক্রমে ইয়ামিওজো এবং জেরবোকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

১৯৮৩ সালে ব্লেজ কমপাওরে ও থমাস সাঙ্কারা যৌথভাবে জঁ-বাপ্তিস্ট ড্রুয়েকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। কিন্তু মাত্র চার বছর পর ১৯৮৭ সালে কম্পাওরে সাঙ্কারাকে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। ২০১৪ সালে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী কম্পাওরেকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের একটি সামরিক গোষ্ঠী মিশেল কাফান্দোকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সর্বশেষ ২০২২ সালে বুরকিনা ফাসোতে আরও দুটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এই অসংখ্য সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এরমধ্যে ৮৭-এর অভ্যুত্থানে ফসল ওঠে স্বৈরতন্ত্রের ঘরে। বিপ্লবী সরকার হিসেবে গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রের ওপর চেপে বসে দীর্ঘতম স্বৈরাচারী সরকার। ১৯৮৭-২০১৪ পর্যন্ত দীর্ঘ আটাশ বছর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে বুরকিনা ফাসোর ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত স্বৈরশাসক ব্লেজ কমপাওরে। দেশটির বিপ্লব আধুনিক ধারা লাভ করে ১৪-এর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। ১৪, ১৫, ১৬ ও ২২-এর ধারাবাহিক গণ ও সামরিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বুরকিনার রাজনীতি নতুন ধারায় উপনীত হয়েছে। আমাদের প্রবন্ধের মূল আলোচ্য ১৪ ও ২২-এর অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট, পরিক্রমা, ফলাফল ও নেপথ্য কারণ। ১৪-এর অভ্যুত্থানের পরিণতি হিসেবে মধ্যবর্তী অভ্যুত্থানগুলোও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

তিন. কেন হয়েছিল ১৪-এর অভ্যুত্থান?

স্বৈরশাসক ব্লেজ কমপাওরের তিন দশকের শাসনামলে রাষ্ট্রের দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অভ্যান্তরীণ সন্ত্রাস পৌঁছে গিয়েছিল চরমে। একজন জেনারেল থেকে শাসক হয়ে ওঠা কমপাওরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোড়কে নিজের একনায়কতন্ত্রের বৈধতা তৈরির জন্য

এমন কিছু নেই যে করেনি। তার জুলুমের শাসনে এমনিতেও ক্ষোভ জমেছিল জনমনে। এ জন্য তিন দশকের পরও কীভাবে আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকা যায়, তার ফন্দি আঁটছিল সে। সংবিধান অনুযায়ী সেই বছর তার আর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে কমপাওরে চাইলে ভ্লাদিমির পুতিনের পথে হাঁটতে পারত এবং দিমিত্রি মেদভেদেভের মতো একজন পুতুল নেতা তৈরি করে সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে নিজে আবার ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারত। তবে সে ভালো করেই জানত, এমনটি করতে গেলে ১৯৮৭ সালের টোমা সাঙ্কারার সেই পরিণতি নিজের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। এসজন্য তার কাছে মনে হয়েছিল সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ পথ হলো সংবিধান পরিবর্তন করে ফেলা। নিজেকে প্রার্থিতার বৈধতা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ব্লেজ কমপাওরে সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই শুরু হয় তীব্র আন্দোলন।

১. জনতার রোষ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ

২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভোরে জনতার রোষের বিস্ফোরণ ঘটে। বিভিন্ন শহরে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। প্রশাসন কর্তৃক হামলার ফলে হতাহতের ঘটনাও ঘটে বেশ। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ব্লেজ কমপাওরে নিজেকে পুনরায় প্রার্থী করার পরিকল্পনা রুখে দেয় জনগণ। লাখো মানুষ নেমে আসে রাজধানী ওয়াগাদুগুর রাজপথে। প্রথমে তারা সংসদ ভবন দখলে নেয় এবং বেশ কিছু কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর জনতার মিছিল দখল করে রেডিও ভবন। সন্ধ্যার দিকে বেসামরিক এক তরুণ উচ্ছ্বসিত বিক্ষোভকারীদের এক বিশাল জমায়েতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

২. আবারও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা

সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ক্ষমতা রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যায়। সঙ্গ দেয় সেনাবাহিনীও। আফ্রিকান সেনাবাহিনীগুলো এই চক্রান্তে বেশ পটু। কখনো গণঅভ্যুত্থান ঘটলেই তারা সেই সুযোগে সামরিক অভ্যুত্থান করে বসে। জনগণের রক্তের বিজয় নিজেদের পকেটে পুরে নেওয়া এই সেনাবাহিনীগুলোর নিয়মিত অভ্যাস। এখানেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথমে কারফিউ জারি করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও প্রাণহানি থেকে সুরক্ষার অজুহাতে এক বছরের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা চাপানোর চেষ্টা করা হয়। জেনারেল অনোরে নাবিরি ত্রাওরি ঘোষণা করেন, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১২ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশটি পরিচালনা করবে।

৩. স্বৈরশাসনের পতন ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কমপাওরে ঘোষণা করেন যে, তিনি সংবিধান সংশোধনের পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তবে মেয়াদ পূর্ণ

করার অজুহাতে নভেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানান। কিন্তু বুরকিনার সেনাবাহিনী কমপাওরের ক্ষমতায় থাকার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে। শুরু হয় অভ্যুত্থানের নতুন মাত্রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সরকারের ভেতর থেকে চাপ তৈরি হয় কমপাওরের ওপর। শেষমেশ ৩১ অক্টোবর শুক্রবার কমপাওরে ২৭ বছরের শাসনকাল শেষে পদত্যাগ করেন এবং আইভরকোস্টে পালিয়ে যান। ত্রাওরি দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। তবে অনেক ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ত্রাওরির শাসন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন রিপাবলিকান গার্ডের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইসহাক জিদা আরেকটি প্রজ্ঞাপনে নিজেকে দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। কর্নেল ইসহাক জিদাকে সমর্থন জানায় সেনাবাহিনী। তার এই সিদ্ধান্তের ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যেই ফুঁসে ওঠা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তবে বিপ্লবী জনতা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে এবং রাজধানী ওয়াগাদুগুতে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। কারণ এক স্বৈরাচারকে উৎখাত করা এই বিপ্লব আরেক সামরিক স্বৈরাচারের ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হোক, এটা জনগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। বুরকিনার মানুষ নিজেদের চরম দারিদ্র্য এবং দেশের পশ্চাদ্‌পদতার পরও নিজেদের সম্মান ও স্বাধীনতা ধরে রাখতে জনমতের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তারা শুধু গণতন্ত্রের নামে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেই নয়, বরং সেই বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়ে যায়, যা কমপাওরের মতো শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক ছিল।

৪. অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে যাত্রা

সর্বশেষ ৩ নভেম্বর আফ্রিকান ইউনিয়ন থেকে দেশের সামরিক শাসন স্থগিত করতে বুরকিনা ফাসোকে দুই সপ্তাহের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে একটি অন্তর্বর্তী নির্বাহী সরকার আর আইনসভা পরিচালনার জন্য একটি সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন মিশেল কাফানদো আর প্রধানমন্ত্রী হন ইয়াকুব ইসহাক জিদা।

চার. ১৫-এর অভ্যুত্থান

২০১৫ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বরে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। যা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রপতির বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দলের মাধ্যমে। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মিশেল কাফানদো ও প্রধানমন্ত্রী ইয়াকুব ইসহাক জিদাকে অপসারণ করা হয়। সরকার ভেঙে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক পরিষদ গঠন করা হয়। তারপর মিশেল কাফানদো, প্রধানমন্ত্রী ইসহাক জিদা এবং আরও অনেক মন্ত্রীকে রাজধানী ওয়াগাদুগুতে সামরিক বাহিনীর একটি

শিবিরে আটক করে রাখা হয়। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন ও পশ্চিম আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্প্রদায় একটি যৌথ বিবৃতিতে বুরকিনার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট মিশেল কাফানদো ও প্রধানমন্ত্রী ইসহাক জিদার মুক্তি দাবি করে। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট দেশটির সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। এমন কর্মকাণ্ডের জন্য তারা দায়বদ্ধ থাকবে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন কাফানদো ও জিদাকে আটক করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান।

পাঁচ. ১৬-এর অভ্যুত্থান

৮ অক্টোবর ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্টের এলিট গার্ডের (RSP) ৩০ জন সামরিক কর্মকর্তা আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। তিনটি স্থানে তারা আক্রমণের পরিকল্পনা করে : প্রেসিডেন্টের সদর দফতর, একটি সেনা ব্যারাক এবং রাজধানী ওয়াগাদুগুর একটি কারাগার। এই অভ্যুত্থানের চেষ্টায় দুজন নিহত হয় এবং অন্তত দশজনকে আটক করা হয়। অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন গ্যাস্টন কুলিবালি। যিনি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টির একজন প্রাক্তন সদস্য।

ছয়. ২২-এর অভ্যুত্থান

২০২২ সালের ২৩ জানুয়ারি বুরকিনা ফাসোতে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালানো হয়। রাজধানী ওয়াগাদুগুতে প্রেসিডেন্সিয়াল দপ্তর এবং বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। বিদ্রোহী সেনারা রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি দখল করে নেয়। প্রথমদিকে সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং দেশে কোনো অস্থিরতা নেই বলে দাবি করে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানা যায় যে, বিদ্রোহী সেনারা রাষ্ট্রপতি রড মার্ক ক্রিশ্চিয়ান কাবোরেকে আটক করেছে।

পরদিন ২৪ জানুয়ারি, সেনাবাহিনী টেলিভিশনে এক বিবৃতির মাধ্যমে ঘোষণা করে, তারা রাষ্ট্রপতি কাবোরেকে পদচ্যুত করেছে। নতুন সামরিক শাসকরা সংসদ এবং সরকার বিলুপ্ত করে এবং দেশের সংবিধান স্থগিত করে। সেদিন রোচ মার্ক ক্রিশ্চিয়ান কাবোরের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংলাপের এবং বিদ্রোহী সেনাদের অস্ত্র ত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়। তবে তিনি আটক রয়েছেন কি না, সেটা তখনো স্পষ্ট হয়নি। অন্যদিকে বিদ্রোহী সেনারা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আরটিবি (RTB)-কে ঘিরে ফেলে। প্রেসিডেন্টকে অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আটক করা হয়। রাজধানীর কিছু বাসিন্দাকে অভ্যুত্থানের প্রতি সমর্থন জানাতে রাস্তায় নামতে দেখা যায়। তারা টায়ার পুড়িয়ে সেনাবাহিনীর প্রতি সংহতি প্রদর্শন করে। কিছু

যুবকগোষ্ঠী আরটিবি অফিসে প্রবেশ করে সামরিক পরিষদের পক্ষে সমর্থন জানায়।

অন্যদিকে শাসকদল অর্থাৎ পিপলস মুভমেন্ট ফর প্রগ্রেস (এমপিপি) অভ্যুত্থানের নিন্দা করে একে রাষ্ট্রপতি ও সরকারের বিরুদ্ধে একটি হত্যাচেষ্টা বলে অভিহিত করে। ৩১ জানুয়ারি, সামরিক পরিষদ সংবিধানের কার্যকারিতা পুনর্বহাল করার ঘোষণা দেয় এবং অভ্যুত্থানের নেতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল-অঁরি সাঁদাওগো দামিবাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়।

১. ২২-এর অভ্যুত্থানের কারণ

২০২০ সালের সাধারণ নির্বাচনে রোচ মার্ক ক্রিশ্চিয়ান কাবোরে দ্বিতীয়বারের মতো বুরকিনা ফাসোর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তবে, দেশজুড়ে সশস্ত্র হামলার ক্রমবর্ধমান সংকট মোকাবিলায় তার সরকারের ব্যর্থতা জনগণের মধ্যে মারাত্মক ক্ষোভের সঞ্চার করে। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মিত বিক্ষোভ হতে থাকে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফ জোসেফ মেরি ডাবিরকে পদচ্যুত করা হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারি নাগাদ রাজধানীতে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও তীব্রতর হয়। বিক্ষোভকারীরা সারাদেশে সশস্ত্র হামলা বন্ধে সরকারের অক্ষমতা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য রাষ্ট্রপতি কাবোরেকে দায়ী করে। অনেকে তো আবার সরাসরি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিও জানায়। এর পাশাপশি আবার ২০২১ সালের আগস্ট মাসে বুরকিনা ফাসোর সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ১০০ জন সদস্য দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। রাষ্ট্রপতি কাবোরে এবং সরকারের একজন মন্ত্রী একটি ব্যর্থ হত্যাচেষ্টার শিকার হন। সবমিলিয়ে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার চরম বাজে অবস্থা!

২. অভ্যুত্থান পরবর্তী অবস্থা

অভ্যুত্থানের পর ন্যাশনাল মুভমেন্ট ফর সেফগার্ডিং অ্যান্ড রিস্টোরেশন (এমপিএসআর) নামে অভিহিত নতুন সামরিক পরিষদ সরকার ভেঙে সংসদ ও সংবিধান স্থগিত করে দেয়। সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং রাত ৯টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত একটি জাতীয় কারফিউ জারি করা হয়। এরপর সামরিক পরিষদের সরকার ঘোষণা করে যে, তারা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন নির্বাচন আয়োজনের কাজ করবে। জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি লিখিত পদত্যাগপত্র প্রচার করা হয়। বলা হয়, এটি কাবোরের নিজ হাতে লেখা পদত্যাগপত্র। যাতে লেখা ছিল : 'জাতির স্বার্থে এবং গতকালের ঘটনাগুলোর পর আমি বুরকিনা ফাসোর রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজধানী উগাদুগুর জাতীয় চত্বরে জনতার ঢল নামে এবং তারা

সঙ্গীত, কনসার্ট ও শিঙ্গা বাজিয়ে অভ্যুত্থান উদযাপন করে। ৩১ জানুয়ারি সামরিক পরিষদ সংবিধানের কার্যকারিতা পুনর্বহালের ঘোষণা দেয় এবং অভ্যুত্থানের নেতা মেজর পল-অঁরি সাঁদাওগোকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে।

সাত. ২২-এর দ্বিতীয় অভ্যুত্থান

২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। দিনটা ছিল শুক্রবার। বুরকিনা ফাসোতে আবারও একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন দেশের সামরিক পরিষদের প্রধান মেজর পল-অঁরি সাঁদাওগো দামিবা। এর আগে তিনি নিজেও ২০২২ সালের ২৪ জানুয়ারি—মাত্র আট মাস আগে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোচ মার্ক কাবোরেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। এই নতুন অভ্যুত্থান ঘটে মেজর দামিবা ও কিছু তরুণ সেনা কর্মকর্তার মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতবিরোধের প্রেক্ষিতে। সর্বশেষ তারা দামিবাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তার স্থলাভিষিক্ত হন অভ্যুত্থানের নতুন তরুণ নেতা ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ত্রাওরে।

আট. দামিবার বিরুদ্ধে সংঘটিত এই সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ

১. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা

নতুন অভ্যুত্থানের মূল কারণ হিসেবে দেশের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতাকে দায়ী করা হয়। এর আগে ৪১ বছর বয়সী মেজর দামিবা ও তার সহযোগীরাও প্রেসিডেন্ট কাবোরেকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একই কারণ দেখিয়েছিলেন। দামিবার সরকার ক্ষমতায় থাকার আট মাসের মধ্যেও সন্ত্রাসী হামলা রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় জনগণের মধ্যে থাকা ক্ষোভ বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়।

নতুন অভ্যুত্থানের তিন দিন আগে উত্তরাঞ্চলীয় শহর জিবোতে ত্রাণ বহনকারী ১৫০টি যানবাহনের একটি কাফেলায় সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এই কাফেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিল। হামলায় কমপক্ষে ১১ জন সেনা ও ৫০ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়। নিখোঁজ হয় আরও অনেকে। ত্রাণ বহনকারী প্রায় সব যানবাহন আগুনে পুড়ে যায়। এই ঘটনার ফলে সন্ত্রাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ওই অঞ্চলে খাদ্য ও জ্বালানির সংকট আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

২. সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মোকাবিলায় কৌশল নির্ধারণে ব্যর্থতা

পদচ্যুত মেজর দামিবা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর অভিযান আরও তীব্র করে তোলেন। কিন্তু সামরিক সরঞ্জামের অভাবে

সফল হতে পারেননি। দামিবা নিজেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে আরও বেশি ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এসব ব্যবস্থাও সন্ত্রাসী হামলা রোধ করতে ব্যর্থ হয়। সেনাবাহিনীর একাধিক পরাজয়ের কারণে সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বেড়ে যায়। তারা মনে করতে শুরু করে যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে। কারণ, দামিবার শাসনামলে সন্ত্রাসীরা দেশের আরও অনেক অঞ্চলে দখল জোরদার করেছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি।

৩. সামরিক পদবিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

অনেক সৈনিক প্রকাশ্যে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন যে, মেজর দামিবা সামরিক স্কুল Prytanée militaire du Kadiogo-এর স্নাতকদের বিশেষভাবে প্রাধান্য দিচ্ছেন। তিনি ওই স্কুলের স্নাতকদের সামরিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিচ্ছেন, অন্য সামরিক স্নাতকদের তুলনায় তাদের আলাদা সুবিধা প্রদান করছেন। এ ছাড়াও মেজর দামিবার বিরুদ্ধে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়ারও অভিযোগ আনা হয়।

৪. বিশেষ বাহিনী 'কোবরা' ইউনিটের অসন্তোষ

প্রেসিডেন্ট গার্ড ও বিশেষ বাহিনী কোবরার মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন ও দ্বন্দ্ব তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল। 'কোবরা' বাহিনী মনে করেছিল, একজন সামরিক নেতা ক্ষমতায় এলে তাদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ততদিনেও উপেক্ষিত থাকার কারণে তাদের মধ্যে বেশ ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। বিশেষ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কোবরা ইউনিট ছিল এই অভ্যুত্থানের প্রধান চালিকাশক্তি। ২০১৯ সালে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তার জন্য গঠিত হয় বিশেষ এই ইউনিট। কোবরা ইউনিট মেজর দামিবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের কর্মপরিধি ও জীবনোপকরণ নিয়ে অসন্তোষ জানায়। তাদের দাবি ছিল, সন্ত্রাসী হামলার মোকাবিলার জন্য তাদের যথাযথ সরঞ্জাম নেই। আর বেতন-ভাতাও পাচ্ছেন না তারা ঠিকমতো। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ত্রাওরে। এ ছাড়াও দামিবা ও তরুণ কর্মকর্তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। যার কোনো সমাধান না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়।

৫. মেজর ইমানুয়েল জুংগ্রানার বন্দি থাকা এবং বিচার অব্যাহত রাখা

মেজর ইমানুয়েল জুংগ্রানার বন্দিত্ব ছিল দামিবার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ। সেনাবাহিনীর একজন অত্যন্ত দক্ষ ও চৌকষ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও জুংগ্রানা ও তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে ২০১৯ সালের ১০ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করা

হয়। তাদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কাবোরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। দামিবা ক্ষমতা গ্রহণের পরও জুংগ্রানাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। এতে সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়ে অভ্যুত্থান ঘটায়।

৬. সাবেক প্রেসিডেন্ট ব্লেজ কমপাওরের দেশে ফেরার অনুমতি প্রদান

২০২২ সালের জুলাই মাসে মেজর দামিবা বুরকিনা ফাসোর সাবেক প্রেসিডেন্ট ব্লেজ কমপাওরেকে দেশে ফেরার এবং একটি জাতীয় পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। কমপাওরে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশে ফেরেন। তবে, এর আগে ২০২২ সালের এপ্রিলে বুরকিনার সামরিক আদালত ব্লেজ কমপাওরেকে ১৯৮৭ সালে থমাস সাংকারা ও তার সহকর্মীদের হত্যার দায়ে আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। কমপাওরের দেশে ফেরার পরও তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিক্ষুব্ধ জনগণ সরাসরি রাস্তায় নেমে পড়ে। আর তাকে আইন লঙ্ঘন এবং অপরাধীদের দায়মুক্তির চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

তবে দামিবা উল্লেখ করেন যে, এই বৈঠক জাতির ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও যোগ করেন, এই বৈঠক অন্যান্য সাবেক নেতাদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আইনি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে না। অন্যদিকে থমাস সাংকারার পরিবারের আইনজীবীদের একটি দল কমপাওরেকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে কর্তৃপক্ষকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানায়। এসব ঘটনা মেজর দামিবার প্রতি সবার ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলে।

৭. ফরাসিদের পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ

পশ্চিম আফ্রিকায় ফ্রান্সের প্রভাব এবং ফ্রান্স-সমর্থিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমনে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মধ্যেই মেজর দামিবার বিরুদ্ধে ফরাসিদের পক্ষপাতিত্ব এবং তার মিত্রদের প্রতি অনুগত থাকার অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে মালিতে ফ্রান্স-বিরোধী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তার সমর্থন নিয়ে সন্দেহ করা হয়। এই অভিযোগ আরও জোরালো হয়, যখন দামিবা আইভরিকোস্ট ও নাইজার সফর করেন। সেপ্টেম্বরে তিনি আইভরিকোস্টের প্রেসিডেন্ট আলাসানে ওটারা ও নাইজারের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ বাজারুমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই দুই নেতাই ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত।

এই সফরের পর থেকে সন্দেহ বাড়তে থাকে যে, দামিবা আসলে ফ্রান্সের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলছে। যদিও তিনি মালির সামরিক শাসকদের সঙ্গে প্যারিসবিরোধী একাধিক বৈঠকেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার আইভরিকোস্ট ও নাইজারের

সফর তার ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি অপ্রকাশিত জোট প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়। এ ছাড়াও তার আর ফরাসি সেনাপ্রধান অ্যাডমিরাল জন ফিলিপের মধ্যে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বুরকিনা ফাসোর সেনাবাহিনীর প্রধান ডেভিড কাবরি উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠক অনেক সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে দামিবার ফ্রান্সপ্রীতির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়কে আরও ঘনীভূত করে। এর ফলও যা হওয়ার, তা-ই হয়।

৮. রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক-মৈত্রীচুক্তিতে আগ্রহ

নতুন অভ্যুত্থানকারীরা দাবি ছিল, মেজর দামিবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্যান্য দেশের সাহায্য নিতে রাজি ছিলেন না। যদিও তারা কোনো দেশের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর কথা থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। নতুন শাসকরা আগে থেকেই মালির মতো রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সফল হওয়ার আশা প্রকাশ করত। তারা প্রায় সময় ফ্রান্স বিরোধী স্লোগান দিয়ে ফ্রান্সকে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থক বলে অভিযুক্ত করত।

৯. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির অবনতি

ক্যাপ্টেন ত্রাওরে মিডিয়াকে জানান : ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে তিনি এই অভ্যুত্থান ঘটাননি; বরং তার মূল লক্ষ্য হলো দেশের জনগণকে দারিদ্র্য, দুঃখ ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্ত করা। তিনি আরও বলেন, গ্রামাঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার মান খুবই খারাপ। অনেকেই খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ও ঘাস খেতে বাধ্য হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি আগেও কিছু পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি।

বুরকিনা ফাসোর সর্বশেষ সামরিক অভ্যুত্থানটি দেশটির ইতিহাসের নবম অভ্যুত্থান। আফ্রিকার অনেক দেশেই সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের ঘটনা ঘনঘন ঘটে। এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে, আফ্রিকায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে সহজ মনে করতে শুরু করেছে। অনেক সময় জনগণও সামরিক অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায়; বিশেষ করে যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ থাকে।

কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান দীর্ঘমেয়াদে কোনো সমাধান নয়। এটি প্রায় সময় দেশকে আরও অস্থির ও অস্থিতিশীল করে তোলে। বারোটা বাজায় দেশের অর্থনীতির। অবনতি ঘটায় সামাজিক শৃঙ্খলারও। সামরিক শাসন ব্যক্তিস্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় এবং দেশের সংবিধানকে উপেক্ষার পথ তৈরি করে।

রচনার উৎস : ১. আখবারুস সুদান, ১-১১-১৪ খ্রি.। ২. স্কাইনিউজ, ২-১১-১৪। ৩. কিরাআতু ইফরিকা : ড. সাঈদ নিদা। ৪. কিরাআতু ইফরিকা : আ. মুহাম্মাদ আল জাজ্জার। ৫. ড. আব্দুল কারিম মুহাম্মাদ, কিরাআতু ইফরিকা। ৬. উইকিপিডিয়া

শতাব্দীর ইতিহাস বদলে দেওয়া বিপ্লব 'তুফানুল আকসা'

বর্তমান ও ভবিষ্যতের আয়নায়

নাসরুল্লাহ ইবনে ইলিয়াস

❝ হামাসের এই যোদ্ধারা (তুফানুল আকসার মাধ্যমে) ইসরাইলের প্রতিরোধ শক্তির বিভ্রম ও ভয়ের দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। তুফানুল আকসা এমন একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল, যা বিশ্বের কাছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। ❞

— সামির আল-আরাকি, রাজনৈতিক লেখক

❝ তুফানুল আকসা ছিল একটি বীরত্বপূর্ণ ফিলিস্তিনি অপারেশন। এটি ছিল সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম, অপারেশনাল দক্ষতার বিবেচনায় অনন্য আর সাহসিকতার ইতিহাসে এক বিরল উদাহরণ। ❞

— জাসিম আল-শামারি, কাতারভিত্তিক সাংবাদিক

এক. তুফানের পূর্বাভাস

২০২২ সাল। পৃথিবী ডুবে আছে তার নিজস্ব কোলাহলে। ওয়াশিংটনের করিডরে চলছে ক্ষমতার চাল। রিয়াদে আব্রাহাম চুক্তির নতুন এক সূচনার কথা আলোচনা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলে এ নিয়ে চলছে চাপা গুঞ্জন। এদিকে আমেরিকা ইউক্রেনের মাটিতে রুশদে বিরুদ্ধে লড়ছে। অন্যদিকে আবার ইসরাইল ব্যস্ত আরব বিশ্ব থেকে নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে। জাতিসংঘের মঞ্চও অনেক সরব। সবার মুখে শোনা যাচ্ছে একের পর এক মানবতার নামে বস্তাপচা বক্তব্য। অথচ এখান থেকে বেরিয়েই তারা আবারও মেতে ওঠে মানবতাবিরোধী মুসলিম-নিধনে।

সারা পৃথিবী তখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। মেতে আছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের মাতাল জোয়ারে। দৃশ্যত ফিলিস্তিনের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনও কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে বলা যায়। ইসরাইল দম্ভভরে ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে—তারা হামাসকে কার্যত শেষ

করে দিয়েছে। এখন কেবল তাদের আরব বিশ্বের স্বীকৃতি দরকার। যাতে তাদের সমর্থনে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধারা আর কখনো দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু হামাসকে কি আসলেই ইসরাইল শেষ করতে পেরেছিল?

তখন গাজাও এক অদৃশ্য কারাগার। সেখানে আকাশেও মুক্তি নেই, পাখিরাও যেন বন্দি। বিদ্যুতহীন রাতের আঁধার। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, উদ্বাস্তু শিবিরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, কারফিউ ও গণগ্রেপ্তার কিংবা হত্যার ভয় যেখানে প্রতিদিনের বাস্তবতা। রয়েছে ইসরাইলের সার্বক্ষণিক নজরদারিও। এ সবকিছুর মধ্যেও হামাস নিভৃতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল নিজেদের প্রতিশোধের মহাকাব্য রচনার। প্রতিদিনই ঘনীভূত হচ্ছিল ক্ষোভের স্তূপ। জ্বলে উঠছিল আগুন। নাকের ডগায় থাকার পরও যে আগুন দেখতে পাচ্ছিল না ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও শিংবেত। যেন আল্লাহই তাদের চোখে ঢেলে দিয়েছিলেন পর্দা।

২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর। গাজা উপত্যকার গোপন টানেলে বসে দুই মহাযোদ্ধা সাজাচ্ছিলেন শতাব্দীর বিস্ময়কর এই প্রতিশোধ-আক্রমণের পরিকল্পনা। মহাকালের আপসহীন সেই দুই বীরযোদ্ধার নাম ইয়াহইয়া সিনওয়ার ও মুহাম্মাদ আদ-দেইফ। হামাসের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেওয়া বক্তব্যে তিনি একটি বাক্য বলেছিলেন : آتون بطوفان هادر—'এক বিক্ষুব্ধ তুফান আসছে'। কথাটাকে সভ্য পৃথিবী খুব একটা পাত্তা দেয়নি। কিন্তু ঠিক দশ মাস পর দেখা যায়, সত্যিই সেই বিক্ষুব্ধ তুফান এসে গেছে।

দুই. বিক্ষুব্ধ সেই তুফান

৭ অক্টোবর ২০২৩। সিনওয়ার নিজের বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটান। মুহাম্মাদ আদ-দেইফ জন্ম দেন যুদ্ধকৌশলের এক অপার বিস্ময়। কল্পিত ইউটোপিয়ার রাজ্যের দম্ভ নিমিষেই গুড়িয়ে দেন তারা। বিশ্বকে মেনে নিতে বাধ্য করেন ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের লিগ্যাসি। আব্রাহাম অ্যাকর্ডের মাদকতা কেটে যায় পৃথিবীর চোখ থেকে। বিস্ফোরিত চোখগুলো তাকিয়ে থাকে ফিলিস্তিনের আকাশে। ইয়োম কিপুর যুদ্ধের পর এটিই ছিল ইসরাইলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সর্বনাশা হামলা।

ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ফোটেনি। ইসরাইলের তথাকথিত দুর্ভেদ্য আকাশ প্রতিরক্ষা আয়রন ডোমকে ফাঁকি দিয়ে একের পর এক ছুটে যেতে থাকে মিসাইল। শত শত রকেটের প্রলয়ংকরী আওয়াজে কেঁপে ওঠে ইসরাইলের আকাশ-বাতাস। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে প্রায় ৫ হাজার মিসাইল। হামাসের সামরিক নেতা মুহাম্মাদ আদ-দেইফ ঘোষণা দেন—অপারেশন তুফানুল আকসা শুরু হয়ে গেছে। একসঙ্গে ত্রিমুখী আক্রমণ চালায় ফিলিস্তিনের প্রায় ৩ হাজার প্রতিরোধ

যোদ্ধা। আকাশপথে প্যারাগ্লাইডিং করে, স্থলে অবৈধ কংক্রিটের সীমানা প্রাচীর ভেঙে মোটর সাইকেল-পায়দল বা গভীর টানেলের মধ্য দিয়ে, এমনকি সমুদ্রপথেও যোদ্ধারা ঢুকে পড়ে অবৈধ ইসরাইলের সীমানায়। নিজেদের বানানো দুর্বল অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তাব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয় সেদিন।

আকস্মিক আক্রমণে ইসরাইলিরা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে ছিল। বুঝতেই পারছিল না কী হচ্ছে। তাদের কল্পনাতেও ছিল না, হামাস তাদের নাকের ডগায় থেকে এত শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে এক বিক্ষুব্ধ ঝড় তুলেছে। আইডিএফের সবচেয়ে সফিস্টিকেটেড ইউনিট গাজা ব্রিগেডকে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সেদিন প্রতিরোধ যোদ্ধারা নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আক্রমণের এ ধাক্কা বুঝে উঠতেই ইসারাইলি বাহিনীর কয়েকদিন লেগে যায়। ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো প্রফেশনাল ওয়েতে জবাবই দিতে পারছিল না। আসলে তাদের সব নিরাপত্তাব্যবস্থা এত সহজে কলাপস হয়ে যাবে, সম্ভবত হামাসও সেটা ভাবতে পারেনি।

জায়নবাদীদের সব নিরাপত্তাব্যবস্থা কলাপস হওয়ার ব্যাপারে পরবর্তী সময়ে আল-কাসসাম ব্রিগেড বলেছিল : 'আমরা তাদের আনডিফিটেড হওয়ার তকমা ঘুচিয়ে দিয়েছি। আজীবন এমনভাবে চলতে পারে না যে, ইহুদি সেনারা আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করে নিরাপদে ফিরে তেল আবিবের কফিশপে বসে কফিতে চুমুক দেবে। আমরা ৭ অক্টোবর নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছি। যদি জানতে পারতাম, সেখানকার ইসরাইলি বাহিনী এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে কলাপস করবে, তাহলে হয়তো ৩ হাজারের জায়গায় ১০ হাজার সেনা পাঠিয়ে তেল আবিব আক্রমণ করতাম। আমাদের জানা ছিল না, গাজার প্রাচীরের বাইরে মিউজিক ফেস্টিভাল হচ্ছিল। সেখানে সাধারণ মানুষও ছিল, তারাও আমাদের হামলার মুখে পড়ে যাবে। আমরা শুধু আইডিএফের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে আনতে চাচ্ছিলাম। যাতে তাদের বিনিময়ে যত বেশি সম্ভব ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্ত করা যায়।'

তিন. জায়নবাদীদের কিয়ামত

হামলার প্রথম পর্যায়েই ৩৫০ জন আইডিএফ সেনাসহ প্রায় পনেরোশো ইসরাইলি প্রাণ হারায়। বেসামরিক লোকদের অধিকাংশই খোদ ইসরাইলি সেনাদের গুলিতে মারা পড়ে। এসব ঘটেছে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ার কারণে। তাদের একটা ডকট্রিন বা নীতি হচ্ছে—'কাফকাৎ মিশমার', অর্থাৎ ফ্রিজিং বা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রাখার এবং প্রয়োজনে হত্যার নীতি। এই নীতির আলোকে যেকোনো মূল্যে তারা সামরিক-বেসামরিক সদস্যদের অপহরণ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এমনকি বেসামরিক লোকদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে হলেও। আর সেদিন বেসামরিক লোকদের অধিকাংশই এই ডকট্রিনের শিকার হয়েছিল।

তুফানুল আকসার প্রথম দিনই কমপক্ষে ২৫০ জন সামরিক ও বেসামরিক ইহুদি হোস্টেজ হিসেবে পাকড়াও করা হয়। এই হামলায় হামাস কতটুকু সফল, সেটা আমরা আরেকটু পরেই দেখতে পাব। তবে যেকোনো বিবেচনায় এটা যে ইসরাইলের বুকে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ও বিধ্বংসী আক্রমণ ছিল, সেটা অনস্বীকার্য। ইসরাইলি মিডিয়াগুলো এই হামলাকে হলোকাস্টের পর ইসরাইলের ইতিহাসের সবচেয়ে সর্বনাশা বিপদ হিসেবে নিউজ করেছে। এমনকি ইসরাইলের অনেক রাজনীতিবিদকে এ ঘটনাকে 'আমাদের ৯/১১' বলেও প্রচার করতে দেখা গেছে।

ইসরাইল নিজেদের ঘোর কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এরপর হামাস নির্মূলের নামে ওরা স্রেফ গুড়ো করে দেয় পুরো একটি জনপদকে। গাজায় বর্তমানে আর একটি বাড়িও অবশিষ্ট নেই। তারা হামাসের নাগাল না পেয়ে পুরো পাগলা কুকুর হয়ে ওঠে। সমস্ত নীতি-নৈতিকতা, তথাকথিত যুদ্ধ-আইন, মানবাধিকার প্রভৃতি যা কিছু আছে, কোনো কিছুরই তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে বৃষ্টির মতো এয়ার স্ট্রাইক চালিয়ে যায় গাজার নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। নারী ও শিশুদের টার্গেট করে বোম্বিং করা হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় হাসপাতাল। এমনিভাবে ত্রাণকার্যেও নির্বিচারে গুলি করে বাধা দেওয়া হয়। মোটকথা, প্লানড জেনোসাইড চালানো শুরু হয় ফিলিস্তিনের এই অধিবাসীদের ওপর। অপরাধ কী তাদের? বলবেন, তারাই তো আগে আক্রমণ করেছিল! উত্তরটা নোয়াম চমস্কির একটা কবিতা দিয়ে দিই—

তুমি আমার পানি নিয়ে যাও

জ্বালিয়ে দাও আমার জলপাই বাগান

আমার বাড়িও ধ্বংস করে দাও তুমি,

ছিনিয়ে নাও আমার চাকরিখানাও

আমার জমিও দখল করো

কারাগারে দিনের পর দিন আটকে রাখো আমার বাবাকে

নির্মমভাবে হত্যা করো আমার মাকেও,

আমি কোথাও আশ্রয় নিলে সেখানেও তুমি বর্ষণ করো বোমা

আমাকে খেতে দিতে চাও না, রাখো অনাহারে

আর এ সবকিছুর পর, আমাকেই দোষ দাও,

আমি একটা রকেট ছুড়েছি বলে। বাহ!

চার. কেন তুফানুল আকসা, এ সময়েই কেন?

এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কেন হামাস এই আক্রমণ করেছিল? ঘটনার দিকে তাকালে দেখা যায়, হামাস এখানে অফেন্সিভ (আগে আক্রমণ করেছে) আর ইসরাইল ডিফেন্সিভ (আত্মরক্ষা করেছে)। সাধারণত অফেন্সিভ যে পক্ষ, তার আক্রমণের একটা ইডিওলজি থাকে, একটা সেন্টিমেন্ট বা মতবাদ থাকে আর যে পক্ষ ডিফেন্স করে, প্রথমদিকে তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আত্মরক্ষা করা। এখন দেখতে হবে, হামাস যে কারণে আক্রমণ করেছিল, সেসব কারণে তারা কতটা সফল। এখানে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো :

প্রথম কারণ : ইসরাইলের ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে চরমপন্থি সরকারের পিরিয়ড। নেতানিয়াহুর সরকার ক্ষমতাগ্রহণের সময় থেকেই চূড়ান্তভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করে আসছে। অন্য সরকার অন্তত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী ছিল, কিন্তু এই সরকার সেটারও কোনো তোয়াক্কা করছিল না। পুরো অর্থনীতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছিল। জাতিসংঘের দেওয়া ফিলিস্তিনি সীমানার মধ্যেও দখল, উচ্ছেদ ও বসতি স্থাপনের কার্যক্রম এবং উন্মত্ত সামরিক আগ্রাসন দেদারসে চালিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের তত্ত্বও মানছিল না। ২৪-এর জানুয়ারিতে নেতানিয়াহু এক্স একাউন্টে পোস্ট করে—'আমি জর্ডানের (নদীর) পশ্চিমের পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি পুরোপুরি ইসরাইলের হাতে রাখা নিয়ে আপস করব না। এটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।' আল-আকসায় মুসলমানদের জন্য সময় (Temporal Division) ও নির্দিষ্ট স্থান (Spatial Division) বেঁধে দিয়ে ধীরে ধীরে তারা অগ্রসর হচ্ছিল তাদের কল্পিত হাইকাল (টেম্পল মাউন্ট) নির্মাণের দিকে। এটা নির্মাণে বাঁধা দেওয়া এবং আল-আকসার সম্মান রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল ইসরাইলকে অস্থিতিশীল করে তোলা। ইসরাইলকে এমন এক যুদ্ধে টেনে আনা, যেটা তাদের পরিকল্পনায় নয়; বরং প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পরিকল্পনায় হবে। হামাস এই লক্ষ্যে সফল। কতটা সফল, চলুন একটু হিসেব করি।

হামাসের শক্তিশালী হওয়া এবং ক্ষমতায়নের পর ২০০০ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত সময়কালের হিসাব জানাতে গিয়ে ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানায়, এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১ হাজার একশো ৯৪ জন ইসরাইলি ও বিদেশি নাগরিক নিহত হয়েছে, আর আহত হয়েছে ৭ হাজারেরও অধিক।[১১৩] এদিকে ৭ অক্টোবরের একদিনে বিভিন্ন সূত্রমতে ১ হাজার একশো ৯৫ জন নিহত আর আহত হয়েছে প্রায় ছয় হাজার নয়শো জনেরও বেশি। বন্দি হয়েছে আরও কয়েকশো।[১১৪] যার মধ্যে নারী সৈনিকসহ

---

[১১৩] দেখুন উইকিপিডিয়ার নিবন্ধ : Israeli casualties of war

[১১৪] বিস্তারিত দেখুন : এবিসি নিউজ—Israel-Hamas War: Timeline and key developments

আছে উচ্চপদস্থ অনেক সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাও। আরও যদি তুলনা করি, ১৯৬৭ সালের জুন মাসের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে নিহত হয়েছে মাত্র ৬৫০ জন ইসরাইলি। ১৯৮২ সালেও এমনই। অর্থাৎ ইসরাইলের ইতিহাসে ৭ অক্টোবরের তুফান তার আগের সব যুদ্ধের দিনগুলো থেকে ভয়াবহ সাব্যস্ত হয়। আর নিঃসন্দেহে এই তুফান তাদের জন্য বিভীষিকার কাল হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন। তা ছাড়া এই হামলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ইসরাইল তো চরম অস্থিতিশীল হয়েছেই; পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যেও কমে গেছে চরমপন্থি নেতানিয়াহুর সমর্থন।

দ্বিতীয় কারণ : ইসরাইলের কঠোর অবরোধ গাজাবাসীকে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি আটকে রেখেছিল। ইসরাইল শর্ত দিয়েছিল, 'শান্তি বজায় রাখলে অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়া হবে।' কিন্তু কোনোরকমের বিশৃঙ্খলা না থাকার পরও নানা ছলচাতুরীতে ইসরাইল এই অঞ্চলে আরোপ করে যাচ্ছিল একের পর এক অবরোধ। ফিলিস্তিনের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থনে বিজয়ী হামাসকেও তারা স্বীকৃতি দিচ্ছিল না। কখনো লোকদেখানোর নিমিত্তে অবরোধ একটু শিথিল করলেও দুয়েকদিনের মাথায় আবারও তা কঠোর করে ফেলা হতো। গাজা দিনদিন বাঁচা-মরার খাদের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এ যুদ্ধ শুরু না করলে তারা ফিলিস্তিন আর তার ভূমিপুত্রদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার পায়তারা করতেই থাকত।

এ প্রসঙ্গে হামাসের দাবি—তাদের কাছে তথ্য ছিল, ইসরাইল কিছুদিন পরই গাজায় ফুলস্কেল ওয়ারের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। হামাসের দৃষ্টিতে গাজাবাসীর সামনে কেবল দুটি পথই খোলা ছিল : ধুকে ধুকে কাপুরুষের মতো লাঞ্ছনার মৃত্যু কিংবা আক্রমণাত্মক হামলা করে নিজেদের দাবি আদায় করা আর শাহাদাত লাভে ধন্য হওয়া। হামাস দ্বিতীয়টাকেই বেছে নিতে চায়। কিন্তু শঙ্কার বিষয় ছিল জনগণের সমর্থনের ব্যাপারটা। কারণ, গেরিলা লড়াইয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সেন্টিমেন্ট গঠন বা পাবলিক এনগেজমেন্ট। দেখা যায়, হামাস এ লক্ষ্যেও সফল হয়। গাজার যুদ্ধ প্রায় দুই বছর হওয়ার মুখে, কিন্তু আজও সেখানকার মানুষ হামাস কিংবা তাদের এই লড়াইয়ে নিরাশ বা বিরক্ত হয়েছে বলে জানা যায় না। বরং তারা নিজেদের সন্তানদের এই অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে হাসিমুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

তৃতীয় কারণ : ফিলিস্তিনি বন্দিদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। ইসরাইলের বর্ণবাদী আইন প্রণয়ন এবং বন্দিদের ওপর দমন-পীড়ন দিনদিন বেড়েই চলছিল। বিশেষ করে ইসরাইলের উগ্র ডানপন্থি মন্ত্রী ইতামার বেন গেভির (Itamar Ben Gvir)-এর নেতৃত্বে এই দমন-পীড়নের কাজ আরও তীব্র হচ্ছিল। প্রশাসনিকভাবে গ্রেপ্তারকৃতদের সংখ্যা বারোশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদের অনেকেই ছিল বেশ দীর্ঘ একটা সময় ধরে বন্দি। এ ছাড়া ইসরাইলি সরকার নয় বছর ধরে (২০১৪ সাল থেকে)

নতুন কোনো বন্দিবিনিময় চুক্তি সম্পন্ন না করে কৌশলে সময়ক্ষেপণ করে আসছিল।[১১৫]

এই 'তৃতীয় কারণ'-টির পটভূমি বুঝতে হলে এটা মাথায় রাখতে হবে যে, হামাসের অনেক প্রভাবশালী নেতা—যারা সংগঠনের সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন—তারা আগের কয়েকটা বন্দিবিনিময় চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছিলেন। যেমন : ২০১১ সালে 'ওয়াফাউল আহরার' বন্দিবিনিময় চুক্তির আওতায় ইয়াহইয়া সিনওয়ার, রাউহি মুশতাহা, হাসান সালাহ ও তাওফিক আবু নাইম মুক্তি পান। মুক্তির সময় তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাকি বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করবেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে হামাসের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনেও হামাস নেতৃবৃন্দ বন্দিদের মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি খুব দ্রুত বাস্তবায়ন হবে বলে ঘোষণা দেন। এই প্রলয়ংকরী ঝড়-তুফানের পর ইসরাইলের সাথে যেকোনো চুক্তিতে হামাস এই ধারাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আর সময় ও ইতিহাস সাক্ষী, হামাস তাদের এ লক্ষ্যেও সফল।

চতুর্থ কারণ : এখানে যে কারণটা উল্লেখ করা হচ্ছে, তা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' ও 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডে'-র কারণে। আব্রাহাম অ্যাকর্ড ফিলিস্তিনকে পুরোপুরি একা করে দেওয়ার নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। ২০২০ সালে এটি শুরু হলে কয়েকটি আরব দেশ এই নরমালাইজেশন প্রকল্পে সাইন করে। এটা ছিল ফিলিস্তিনি স্বার্থ ও জনগণকে পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করে। এসব চুক্তি যে কেবল সময়ক্ষেপণ এবং ইসরাইলের নৃশংসতা ও অমানবিক অন্যায়ের বৈধতা দেওয়া, এটা হামাস খুব ভালোভাবেই জানত। মুসলিম উম্মাহর প্রাণের ভূমি হারামাইনের নিকৃষ্ট শাসকগোষ্ঠীও এই প্রকল্পে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করছিল। এই চুক্তি ইসরাইলকে আন্তর্জাতিকভাবে যেমন শক্তিশালী করে তুলছিল, তেমনিভাবে মধ্যপ্রাচ্যেও করে তুলছিল প্রভাবশালী। জায়নবাদীরা ফিলিস্তিন ইস্যুকে সবার মন থেকে বিস্মৃত করার কৌশল হিসেবে এসব চুক্তি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছিল। যার ফলে হামাসের সামনেও আর কোনো পথ খোলা থাকেনি—'তুফানুল আকসা'-র এই সারপ্রাইজিং অ্যাটাক চালিয়ে তারা আবারও সবাইকে মনে করিয়ে দেয় : ফিলিস্তিন মরে যায়নি এবং ফিলিস্তিনের ভূমিপুত্ররাও হারিয়ে যায়নি। হামাস চেয়েছিল, এই নরমালাইজেশন প্রকল্প সমূলে বিনষ্ট করে তাদের রক্ত ও সংগ্রামের লিগ্যাসি পুরো দুনিয়াকে মেনে নিতে বাধ্য করতে। হামাস তাদের এই উদ্দেশ্যেও সফল।

আর যেহেতু হামাস এখনো পর্যন্ত তার সব উদ্দেশ্যেই সফল হয়েছে, সেই হিসেবে দুঃখজনকভাবে ফিলিস্তিনের শহিদদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও, বাস্তবে কৌশলগতভাবে হামাসই এই যুদ্ধে বিজয়ী।

---

[১১৫] বিস্তারিত দেখুন : Gilad Shalit prisoner exchange, আর Palestinian rights group blast Israeli official's 'confession' of harsh detainee treatment

পাঁচ. ইসরাইলি অলঙ্ঘনীয় মিথের ধস

এই যুদ্ধের আল্টিমেট ফলাফল কী হবে, সেটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে চূড়ান্ত বিজয় তো মুসলিমদেরই। তবে নিকট ভবিষ্যতে এই যুদ্ধের ফলাফল কী হবে—সেটা এখনো পর্যন্ত বোঝা না গেলেও, এই যুদ্ধের মাধ্যমে হামাস যে শুধু নিজেদের লক্ষ্যই বাস্তবায়ন করেনি; বরং ইসরাইলের তথাকথিত আনডিফিটেড হওয়ার তকমাও ঘুচিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়াও এই আক্রমণে ইসরাইলের মূল ৫টি যুদ্ধনীতির পতন ঘটেছে :

১. যুদ্ধ ও আগ্রাসনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু এবার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে তাদের প্রতিপক্ষ ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

২. শত্রুর অভ্যন্তরীণ সীমান্তে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখা। কিন্তু তুফানুল আকসা অপারেশনের প্রধান ক্ষেত্র এবং সূচনাই হয় ইসরাইলের অভ্যন্তরে। আর ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসরাইলর তাদের এই নীতিতে পুরোপুরি ব্যর্থ একটি রাষ্ট্র সাব্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধের মূলনীতি বদলে গেছে। এখন থেকে যুদ্ধ হবে ইসরাইলের সীমান্তে।

৩. যুদ্ধের সমাপ্তি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। কিন্তু এই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশভাবে ইসরাইল তার হাতে রাখতে পারছে না।

৪. দ্রুত যুদ্ধ শেষ করা। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইসরাইল ও তার অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই যুদ্ধ দুই বছরে গড়াতে চলেছে। ইসরাইল প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছে বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির। আর সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ তো যেন এই ক্ষতির পারদকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

৫. যুদ্ধে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে—ইসরাইলের পক্ষে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, তাদের প্রথম লক্ষ্য তো সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু ইসরাইল এখন থেকে তা করতে শতভাগ সক্ষম হবে না আর। অন্তত ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের পর এই কথা তো আরও বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে। ইসরাইলের জনগণও আতঙ্কে ঠিকমতো ঘুমাতে পারবে না কখনো।

তুফানুল আকসার মধ্য দিয়ে হামাস তাদের আক্রমণের ধরন আমূল পালটে ফেলেছে। অন্তত ইসরাইলের স্থলবাহিনীর সেনাদের মৃত্যুর সংখ্যা তো সেটাই জানান দিচ্ছে। আল-কাসসাম ব্রিগেডের মুজাহিদরা তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে হারানোর পরও গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে যেভাবে স্থলযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে, সেটা পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে সত্যিই বিরল। কৌশলগত আক্রমণ তো বটেই, শত্রুপক্ষের গতিবিধি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে তারা নিখুঁত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে গেরিলা

অভিযানের মাধ্যমে যুদ্ধকে দীর্ঘ করার মধ্য দিয়ে হামাস ইসরাইলকে এক চোরাবালিতে নিক্ষেপ করতে সফল হয়েছে। যা ইসরাইলের সামরিক গৌরব, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও অর্থনীতিতে সবসময় ধাক্কা দিতেই থাকবে।

ছয়. ৭ অক্টোবরের পর আরববিশ্ব কী করছে?

প্রথমত আমরা ফিলিস্তিন-ইসরাইলের সীমান্তসংলগ্ন আরব রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব। ফিলিস্তিন-ইসরাইলের সঙ্গে লাগোয়া রাষ্ট্র চারটি : মিসর, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডান। আরবের বিষফোঁড়া ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে দুটি আরব রাষ্ট্র সবার আগে একে স্বীকৃতি দিয়েছিল—তারা ছিল মিসর ও জর্ডান। ক্ষমতার পালাবদল না হলে এরা ইসরাইলের পক্ষেই কাজ করে যাবে, এটা বলা বাহুল্য।

১. মিসর : ইসরাইলের প্রতি আনুগত্য ও সংকট এড়িয়ে চলার কৌশল

মিসরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ্ আল সিসি তার ক্ষমতা ও দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার অজুহাতে ফিলিস্তিন সংকটকে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। ইসরাইলের সঙ্গে ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি বজায় রাখাই যেন তার মূল অগ্রাধিকার। এই নীতির ফলে মিসরের ভূমিকায় ইসরাইলের প্রতি অন্ধ সমর্থন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সীমিত সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক. প্রতিবাদের অভিনয় ও যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষিতা

রাফা শরণার্থী শিবিরে হামলার পর মিসর শক্তিশালী বিবৃতি দিলেও মিসরের সেনা নিহতের ঘটনায় সিসি সরকার কার্যত নীরব থেকেছে। এটি ইসরাইলকে আরও বেপরোয়া হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ১৩০ কোটি ডলার সহায়তা মিসরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার কারণে মিসর ইসরাইলের প্রতি নতজানু নীতিতে অবিচল থাকে। আইএমএফ ও অন্যান্য পশ্চিমাশক্তির অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য মিসরকে ইসরাইলের মিত্রতা বজায় রাখতে বাধ্য করছে।

খ. ইসরাইলের যত সুবিধা

মিসরের নিরপেক্ষ অবস্থান এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে কার্যত নিষ্ক্রিয়তা ইসরাইলকে দুটি বড় সুবিধা দিয়েছে :

১. মিসরকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত না রেখে আরব বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশকে নিরপেক্ষ রাখা।

২. নিজেদের জনগণের কাছে মিসরকে 'অনুগত মিত্র' হিসেবে উপস্থাপন করা।

গ. নেতিবাচক মধ্যস্থতা

মিসর সংঘাত বন্ধে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকলেও এটি বাস্তবিক অর্থে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর ক্ষতি করেছে। মিসরের মূল ভয় হলো, সিনাই উপত্যকায় যদি ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তর করতে হয়, তবে তা ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তিকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

মিসরের এই কৌশল তার নিজস্ব নিরাপত্তা এবং আর্থিক স্বার্থে সীমাবদ্ধ, যা ফিলিস্তিনিদের বিপদকে আরও গভীরতর করেছে এবং ইসরাইলের দখলদারিকে কার্যত সমর্থন দিয়েছে। আর আজ পর্যন্ত মিসর তার এই সুবিধাবাদী অবস্থান থেকে সরে আসতে পারেনি।

২. জর্ডান : ইসরাইলের সঙ্গে সহযোগিতা ও ফিলিস্তিনি ইস্যুতে নিষ্ক্রিয়তা

জর্ডান ও ইসরাইলের সম্পর্ক ১৯৯৪ সালের 'ওয়াদি আরাবা চুক্তি'-র মাধ্যমে এক নতুন মাত্রা পায়। এই চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা তৈরি করেছে, যা জর্ডানের নীতি-নৈতিকতাকে নিশ্চুপ এবং ফিলিস্তিনি ইস্যুতে তাদের নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য করেছে।

ক. ইসরাইলের প্রতি নির্ভরতা ও সহযোগিতা

'ওয়াদি আরাবা চুক্তি'-র অধীনে জর্ডান ইসরাইল থেকে পানি ও গ্যাস পায়, যা তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জর্ডান ও ইসরাইল পারস্পরিক সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা চালিয়ে যাচ্ছে। আল-আকসা মসজিদের কম্পাউন্ড তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জর্ডানের হাতে থাকলেও এই দায়িত্ব ধরে রাখতে ইসরাইলের তোষামোদ করাই তাদের অন্যতম কৌশল কিংবা কাজে পরিণত হয়েছে।

খ. ফিলিস্তিনের পক্ষে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

জর্ডান ফিলিস্তিন ইস্যুতে কোনো জোরালো অবস্থান নেয়নি এবং নিচ্ছেও না। এমনকি ৭ অক্টোবরের সংঘাতের পর—বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত ইরান-ইসরাইল যুদ্ধে ইরান থেকে ছোড়া ড্রোন ও মিসাইলগুলো পর্যন্ত জর্ডান তার আকাশসীমার মধ্যে ভূপাতিত করে। এটি ইসরাইলের প্রতি তাদের সহযোগিতার এবং ফিলিস্তিনের প্রতি নিষ্ক্রিয়তার অন্যতম উদাহরণ।

জর্ডানের এই ভূমিকা ইসরাইলের জন্য একদিকে সহায়ক, অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের জন্য আরও বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপও দেখাচ্ছে, জর্ডান নিজের কৌশলগত স্বার্থে ইসরাইলের সহযোগিতায় সমর্থনশীল অবস্থানে রয়েছে।

৩. লেবানন : হিজবুল্লাহর সক্রিয়তা থেকে স্থবিরতার দিকে যাত্রা

লেবানন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধে যুক্ত না হলেও, দক্ষিণাঞ্চলে ইরান সমর্থিত শিয়া সংগঠন হিজবুল্লাহ শুরু থেকেই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর তারা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে মিসাইল নিক্ষেপ এবং স্থলপথে সীমিত পরিসরে বিভিন্ন আক্রমণও চালায়। যদিও স্থলপথে হিজবুল্লাহ ও ইসরাইল কেউই সাফল্য পায়নি। তবে হিজবুল্লাহর স্থল-প্রতিরোধ প্রশংসনীয় ছিল নিঃসন্দেহে। সর্বাবস্থায় তাদের সামরিক কার্যক্রম ইসরাইলের জন্য একটি গুরুতর হুমকি ছিল।

ক. পেজার বিস্ফোরণ ও নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড

স্থল-অভিযানে মারাত্মক ব্যর্থতার পর বরাবরের মতোই ইসরাইল তার আসল বীভৎস রূপে আবির্ভূত হয়। ২০২৪ সালের মে মাসে হিজবুল্লাহর কর্মীদের ব্যবহৃত পেজার নামের একটি ডিভাইস বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মীরা হতাহত হয় এবং হিজবুল্লাহর সামরিক কার্যক্রমে বড় ধাক্কা লাগে। এই বিস্ফোরণ তাদের অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তায়ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর কয়েক মাস পরই বলা যায় হিজবুল্লাহর ওপর সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসে। সেপ্টেম্বরে, ইসরাইল উন্নত বাঙ্কার ব্লাস্টার মিসাইল ব্যবহার করে হিজবুল্লাহ প্রধান সাইয়িদ হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করে।

খ. গোপন চুক্তি এবং হিজবুল্লাহর স্থবিরতা

পেজার বিস্ফোরণে ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দের হত্যাকাণ্ডের পর লেবানন সরকার এবং ইসরাইলের মধ্যে গোপন আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ফিলিস্তিনের পক্ষে হিজবুল্লাহর আক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, আবার ইসরাইলও বড় ধরনের হামলা বন্ধ করে দেয়।

হিজবুল্লাহ বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হলেও, তাদের প্রভাব যে লেবাননে কমেনি—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. সিরিয়া : আসাদ সরকারের পতন ও নতুন সরকারের অবস্থান

ইসরাইলের উত্তর-পূর্বে সিরিয়ার সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সীমান্ত রয়েছে। দীর্ঘ ৫৪ বছর আসাদ পরিবারের দমনমূলক স্বৈরতন্ত্রের শাসন অবসানের পর ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর, সিরিয়ার বিদ্রোহী দল 'হাইআতু তাহরিরিশ শাম' (HTS) ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। নতুন সরকারের প্রধান আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়ালানি (আহমাদ আশ-শাররা') সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

ক. আসাদ-যুগে ইসরাইল-সিরিয়া সম্পর্ক

আসাদের শাসনামলে সিরিয়া কখনোই ইসরাইলের জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি। ইসরাইল গোলান মালভূমি দখল করে রেখেছে বহু বছর ধরে, কিন্তু আসাদ সরকার তা পুনরুদ্ধারের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা করেনি। ইসরাইলও আসাদ সরকারকে নিয়ে কোনো বিশেষ শঙ্কা বোধ করেনি। এই সময়টা ইসরাইলের জন্য সুবিধাজনক ছিল—কারণ তারা ভালো করেই জানত, আসাদ সরকার তাদের জন্য হুমকি নয়।

খ. নতুন সরকার এবং ইসরাইলের প্রতিক্রিয়া

আসাদ সরকারের পতনের পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। নতুন সরকারকে ইসরাইল দেখতে শুরু করে এক হুমকি হিসেবে। গোলান চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে ইসরাইল গোলান মালভূমিতে সেনা মোতায়েন বৃদ্ধি করে এবং সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় আগ্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। তবে ইসরাইলের এই পদক্ষেপ সিরিয়ার তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, ইসরাইলের সেই জনবল বা সামর্থ্য নেই, যা দিয়ে তারা সিরিয়াকে পুরোপুরি দখল করবে। ইসরাইলের মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন সরকারকে চাপে রাখা।

গ. ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতে সিরিয়ার অবস্থান

সিরিয়া কি ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতে সরাসরি জড়াবে? নতুন প্রেসিডেন্ট আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়ালানি স্পষ্ট করে বলেছেন, তার সরকার ইসরাইলের সঙ্গে সংঘাতে জড়াবে না। এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিকও—কারণ সিরিয়া একটি দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বর্তমানে তাদের সামরিক সক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো যেকোনো বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়।

যুদ্ধ-বিগ্রহকে পাশে রেখে নতুন সরকার তিনটি লক্ষ্যে মনোনিবেশ করতে চাচ্ছে : ১. সামরিক শক্তির পুনর্গঠন : আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা। ২. অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়ন : যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা। ৩. জনমত ও সেন্টিমেন্ট গঠন : জনগণের মধ্যে ঐক্যের মানসিকতা তৈরি এবং নতুন সরকারকে দৃঢ় পাটাতনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা।

ইসরাইলের সাথে সীমান্ত সম্পর্ক না থাকলেও এই লড়াইয়ে প্রাসঙ্গিক কয়েকটা দেশ হলো ইরান, তুরস্ক, ইয়েমেন, কাতার ও সৌদি আরব।

৫. ইয়েমেন : হুথিদের আক্রমণ ও কৌশলগত প্রভাব

ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আরব উপদ্বীপের দেশ ইয়েমেন ইসরাইল থেকে এক সমুদ্র দূরে। কিন্তু ইরান সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠন হুথি (হাওসি) যোদ্ধারা

ইয়েমেনের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ 'বাব আল-মানদাব' প্রণালিতে রয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণ। এই প্রণালি দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০% তেল রপ্তানি হয়।

ক. আঞ্চলিক বাণিজ্যে হুথিদের প্রভাব

হুথিরা প্রণালিটি কার্যত বন্ধ করে দিয়ে ইসরাইলি ও মার্কিন জাহাজে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সফল হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ইসরাইলের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বিশেষ কারে হাইফা বন্দর তো এমনকি ইউরোপে তেল রপ্তানির একটা বড় অংশও হুমকির মুখে পড়েছে।

খ. ইসরাইলের অভ্যন্তরে হুথিদের হামলা

২০২৫ সালের শুরুতে হুথিরা ব্যালিস্টিক ও হাইপারসনিক মিসাইল ব্যবহার করে তেল আবিবে হামলা চালায়। এতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। খোদ ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম থেকে জানায়, হামলার কারণে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ শেল্টার বা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়। এরচেয়েও বড় কথা, ইসরাইলের বেন গুরিয়ান বিমানবন্দর পর্যন্ত সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গত দুই সপ্তাহে এটি ছিল ইসরাইলের ওপর হুথিদের সপ্তম আক্রমণ। লেবাননের হিজবুল্লাহ্ যুদ্ধবিরতির চুক্তির মাধ্যমে পিছু হটলেও ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ হুথি ইসরাইলকে চাপে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য ইয়েমেনে ইসরাইল ও আমেরিকা-ব্রিটেন জোটের হামলার পর হুথিরাও যে কিছুটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়নি—এমনটা নয়। তারপরও ইয়েমেনের মানুষ অদম্য। তারা ফিলিস্তিনকে ভালোবাসে এবং ফিলিস্তিনও তাদের ভালোবাসে।

৬. সৌদি ও কাতার : দায়িত্বহীন নির্লিপ্ততা

ক. সৌদি আরব : কার্যকর পদক্ষেপের অভাব

২৬ মে রাফাহ্ শরণার্থী শিবিরে হামলার পর 'ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব ইসরাইলকে মেনে নিতে হবে' বলে সৌদি সরকার তাদের তথাকথিত ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। এরপর তারা মাঝেমধ্যে তারা আরও 'গভীর উদ্বেগ' জাতীয় কিছু বিবৃতি দিলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

১৯ নভেম্বর আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, সৌদি আরব ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির শর্তে ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজি। যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান এ শর্তে অনড়। তবে বাস্তবে ফিলিস্তিনের জন্য সৌদি সরকারের ভূমিকা কেবল দায়িত্বহীন নির্লিপ্ততার আরেকটি উদাহরণ।[১১৬]

---

[১১৬] AGBI-এর প্রতিবেদন : Blinken says Saudi-Israeli deal 'much closer' in final speech

খ. কাতার : মধ্যস্থতার ব্যর্থ চেষ্টা

কাতার ধারাবাহিকভাবে মধ্যস্থতার অনেক চেষ্টা করলেও একসময় তারা এই কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়ায়। অবশ্য, এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ছোট এ দেশটির সামনে আর কোনো উপায়ও নেই। দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা তো এটাই যে—বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোর মতো কাতারও সংঘাতের সময় শুধুমাত্র কূটনৈতিক ও ত্রাণকেন্দ্রিক সহযোগিতা ছাড়া অন্য কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

৭. তুরস্ক : ফিলিস্তিন ইস্যুতে দ্বৈত ভূমিকা ও সর্বশেষ পরিস্থিতি

ক. ইতিহাসের শিকড়

তুরস্ক প্রথম মুসলিমপ্রধান দেশ, যারা ১৯৪৯ সালে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়। এটি ছিল ইসরাইলের স্বাধীনতার পর মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেক বড় এক ধাক্কা। যদিও এটি তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল,কিন্তু বর্তমান সময়েও প্রশ্ন উঠে : তুরস্ক ফিলিস্তিনের জন্য কী করেছে বা করতে পেরেছে?

খ. কৌশলগত সম্পর্ক ও দ্বৈত নীতি

ইসরাইলের সঙ্গে তুরস্কের কৌশলগত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ২০১৮ সালে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ ছয় বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।[১১৭] ন্যাটোর সদস্য হিসেবে তুরস্কের সেনাবাহিনী ইসরাইলের সেনাদের যৌথ মহড়াও চালিয়েছে। যদিও তুরস্ক হামাসের কিছু নেতাকে কূটনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে মাঝে মাঝে বেশ জোরালেও বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে, তবে বাস্তবতা তো এটাই যে, তারা ফিলিস্তিনিদের জন্য কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

গ. সর্বশেষ অবস্থা : কূটনীতি ও প্রতীকী সমর্থন

২০২৫ সালের শুরুতে তুরস্ক ইসরাইলি পণ্য আমদানি বন্ধের ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে তাদের অবস্থানকে আরও জোরালো করার চেষ্টা করে। যদিও অনেক ফাঁকফোকরের কারণে এই নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি, তারপরও এটি যে একটি প্রতীকী সমর্থন, এটা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। এরচেয়েও বড় কথা, তুর্কি জনতা ফিলিস্তিনকে ভালোবাসে, হামাসকে ভালোবাসে। হয়তো ফিলিস্তিনও তুর্কিদের ভালোবাসে। হয়তো কোনো দিন তুরস্ক তার কূটনীতি খেলার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সত্যিকার অর্থেই ফিলিস্তিনের জন্য কিছু করতে পারবে!

---

[১১৭] দেখুন এ প্রতিবেদনটি : Rebuilding Israeli-Turkish Relations: A Marriage of Convenience

৮. ইরান: মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিধর খেলোয়াড়

মধ্যপ্রাচ্যের লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হচ্ছে ইরান। আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইরান শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাগুলো সমাধান করার কথা বলে আসছে। আর মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা—ফিলিস্তিন-ইসরাইল ইস্যু। তাই এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইরানের বিরাট প্ল্যান-প্রোগাম আছে। ইরান এই লড়াইয়ে সরাসরি ফ্রন্টে না থাকলেও বেশিরভাগ সময় সে প্রক্সি ওয়ারের মাধ্যমে নিজের ভূমিকা রেখে এসেছে।

ইরানের হাতে আছে আমেরিকা ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ এক ট্রাম্পকার্ড, যেটা একবার মোটামুটি শক্তভাবে আটকে দিলে আমেরিকা-ইউরোপের নাভিশ্বাস উঠে যাবে। পারস্য সাগরে ইরান নিয়ন্ত্রিত হরমুজ প্রণালি ও গালফ অব ওমান রুট দুটি দিয়ে দুনিয়ার ২৫% তেল রপ্তানি হয়। কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরব, দুবাই, ওমান এই পথ দিয়েই তেল রপ্তানি করে। একবার ইরান এই পথ বন্ধ করে দিলে, পুরো বিশ্বে তেল-সংকট তীব্র আকার ধারণ করবে এবং চরম অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে। ধস নামতে পারে বৈশ্বিক শেয়ার বাজারেও। এ জন্য ইসরাইল ও আমেরিকা খুব সতর্কভাবে ইরানের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধে যেতে চায় না আপাতত।

ক. সিরিয়ার দামেশকে বিমান হামলা ও পরবর্তী সংঘর্ষ

১ এপ্রিল ইসরাইল সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে ইরানি দূতাবাসে বিমান হামলা চালায়। এ ঘটনায় ১৬ জন নিহত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৩ এপ্রিল ইরানের ইসলামি বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী (আইআরজিসি) এবং তাদের মিত্ররা ইসরাইল ও দখলকৃত গোলান মালভূমিতে ড্রোন, ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল ব্যবহার করে হামলা শুরু করে। থেমে থেমে হামলা-পাল্টা হামলা চলতে থাকে দুই দেশের মধ্যে।[১১৮] এর বাইরে লেবাননে হিজবুল্লাহ আর ইয়েমেনে হুথিরা তো আছেই। এরচেয়েও বড় কথা হচ্ছে, হামাস কিন্তু বেশি ইকুইপমেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট ও ট্রেনিং সহায়তা পায় ইরান থেকেই। ফিলিস্তিন-ইসরাইল ইস্যু ইরানের রাজনীতিতে সার্বক্ষণিক জড়িয়ে থাকবে, এখন পর্যন্ত এমনটাই বোঝা যাচ্ছে। অন্তত ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ তো সেটাই বলছে। সম্ভবত ইসরাইলি সাংবাদিক অ্যামোস হোরেলও ঠিকই বলেছেন যে : 'সিনওয়ার এমন এক আঘাত হেনে গেছেন, যার প্রতিঘাতে এমন কিছু ঘটনার সূচনা হয়েছে—যা এখন পুরো মধ্যপ্রাচ্যের চেহারাই বদলে দিচ্ছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজার এই হামাস নেতা গাজা সীমান্তে যে আঘাত হেনেছিলেন, তা আরও অনেক বড় পরিবর্তনের কারণ হতে যাচ্ছে। এসব পরিবর্তন আগে থেকে অনুমান করা কঠিন ছিল। এখন এসব ঘটনা শুধু ঘটনা নয়, বরং বড় বড় ভূমিকম্প হয়ে মধ্যপ্রাচ্যকে প্রকম্পিত করতে থাকবে।'

---

[১১৮] দেখুন : Israeli airstrike on the Iranian consulate in Damascus

খ. সর্বশেষ ইরান-ইসরাইল যুদ্ধবিরতি : উচ্চপদস্থ নেতাদের ক্ষতি

এ তো কিছুদিন আগে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে ১২ দিনের তীব্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে, যেখানে ইরানের তিরিশের বেশি সিনিয়র জেনারেল ও পরমাণু বিজ্ঞানী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তারা। এই যুদ্ধে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী (আইআরজিসি)-এর যেমন ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, ইসরাইলেরও ব্যাপক পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের 'ডানপিটে সন্তান'-কে রক্ষা করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রভাব খাটিয়ে একটি যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন।

সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনার পর এটা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, এই যুদ্ধবিরতি ইরানের সাম্প্রতিক কৌশলগত শক্তি প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নতুন পরিস্থিতির সূচনা করেছে। ইরান তার শক্তি ও সক্ষমতার সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে।

সাত. জায়নবাদ : মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার

আচ্ছা, ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধান কী? দ্বিরাষ্ট্র প্রকল্প কি ফিলিস্তিনের সংঘাত থামাতে পারবে? এর সহজ উত্তর—না, পারবে না। কেন পারবে না, সেটা ৭ অক্টোবরের পর একেবারে স্পষ্ট। নেতানিয়াহু বা জায়নবাদে ঠিকঠাক বিশ্বাসী কেউই সত্যিকারার্থে দ্বিরাষ্ট্র-তত্ত্ব মানবে না। নেতানিয়াহু তো সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেওয়া দ্বিরাষ্ট্র প্রস্তাব মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। এমনকি গর্বভরে নেতানিয়াহু এটা পর্যন্ত বলেছেন যে, 'আমার জেদের কারণেই বছরের পর বছর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঠেকানো গেছে, যা ইসরাইলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি তৈরি করতে পারত। যতদিন আমি প্রধানমন্ত্রী আছি, বিষয়টির ওপর অব্যাহতভাবে জোর দিয়ে যাব।'[১১৯] মোদ্দাকথা, ফিলিস্তিনের সংঘাত থামবে না, যতদিন না দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ বিলুপ্ত হবে।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—ইসরাইলের এ আগ্রাসনকে কেন মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার বলা হয়ে থাকে। অন্য দেশ আগ বাড়িয়ে হস্তক্ষেপ না করলেও এ আগ্রাসন কি ফিলিস্তিনকে ছাড়িয়ে যাবে? উত্তরটা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উৎস থেকেই পাওয়া যাবে। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মিথের ওপর ভিত্তি করে, যার নাম জায়নবাদ। জায়নবাদ অনুযায়ী তাদের প্রতিশ্রুত ভূমির প্রথম ধাপ মাত্র তারা পার করেছে। তাদের লক্ষ্য হলো, 'গ্রেটার ইসরাইল (Eretz Yisrael HaShlema)'

---

[১১৯] নেতানিয়াহুর দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান প্রত্যাখ্যানের খবর : ১. BBC News: Netanyahu rules out Palestinian state (2021)। ২. The Guardian: Netanyahu says no Palestinian state under his government.

প্রতিষ্ঠা করা। তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি বা গ্রেটার ইসরাইলের সীমানা হচ্ছে নীলনদ থেকে ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী পর্যন্ত। এই 'গ্রেটার ইসরাইল' প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইসরাইলকে মোট সাতটি দেশের ভূখণ্ড দখল করতে হবে—

১. বর্তমান দখলকৃত ফিলিস্তিন (ইসরাইল) ভূখণ্ডের সঙ্গে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা,

২. সমগ্র জর্ডান,

৩. দক্ষিণ লেবানন, বিশেষ করে লিতানি নদী পর্যন্ত,

৪. দক্ষিণ সিরিয়ার একটি বড় অংশ,

৫. ইরাকের পশ্চিম অংশ (ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত),

৬. মিসরের সিনাই উপদ্বীপ এবং

৭. উত্তর সৌদি আরবের কিছু অংশ।[১২০]

ইসরাইল কেবল নিজেদের আবাসভূমি দরকার বলেই ফিলিস্তিন দখল করেছে এমন নয়। এই দখলদারিত্বের পেছনে জায়নবাদী সেন্টিমেন্ট শক্ত ভিত গেড়ে আছে। এ কারণেই ইসরাইল মিসরের সিনাই উপত্যকা এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি ছিনিয়ে নিয়েছিল। ইসরাইলের হালচাল থেকে এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, তারা তাদের স্বপ্নের 'গ্রেটার ইসরাইল' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই হাঁটবে। তাই আগে হোক বা পরে—না চাইলেও এই যুদ্ধে জড়াতে হবে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে। কারণ ইসরাইল ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে দেবে তার সংক্রামক বিষ, একে একে গিলে খেতে চাইবে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সব মুসলিম রাষ্ট্রকে।

সে যাইহোক—শেষ কথা তো এটাই যে, ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে যাবে, এটা বলাটা এখনো অনেক মুশকিল। তবে আল্লাহর রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আশার কথা হচ্ছে, একসময় পুরো ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে, বিইজনিল্লাহ।[১২১]

---

[১২০] গ্রেটার ইসরাইলের ম্যাপ— https://tinyurl.com/bdz83xp8

[১২১] দেখুন—সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩৫; সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৪; মুসনাদু আহমদ : ২২৩২০

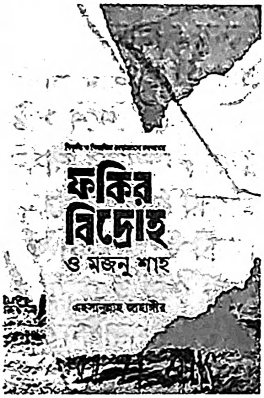

১৭৬০ সালে তৈরি হওয়া একটি বিদ্রোহী বাহিনী, ১৭৬৩ সালে সর্বপ্রথম আক্রমণ করে—বাংলায় উড়ে এসে জুড়ে বসা ইংরেজদের ওপর। একযোগে বহু জায়গায় আক্রমণ। দেখে দেখে ইংরেজদের ঘাঁটিতে, ইংরেজঘেঁষা জমিদারদের কাছারিতে।

১৭৮৩ সাল। একে একে তাদের উচ্চপদস্থ বিজ্ঞ ছয়জন অফিসার তাদের হাতে প্রাণ দিলো। কে এত নিপুণভাবে তাদের পরিচালনা করছে! কে গোটা বাংলা—বিশেষত উত্তরবঙ্গকে বিদ্রোহে উজ্জীবিত করছে! কে সেই মহানায়ক? প্রচলিত বিভিন্ন ধারণা ও মিথ্যে ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলে আনা হয়েছে ইতিহাসের এই মহান নায়ক—নবাব নূরুদ্দীন মুহাম্মদ বাকের জং-কে।

বই : ফকির বিদ্রোহ ও মজনু শাহ

লেখক : এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশনা : বাতায়ন পাবলিকেশন

পৃষ্ঠা : ১৯২

ধরন : বোর্ডবাঁধাই

মুদ্রিত মূল্য : ৩০০ টাকা

জুলাই বিপ্লব : ১

জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ও ঘটনাপ্রবাহ

আরিফ খান সাদ

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে টানা ৩৬ দিনের গণআন্দোলনে পতন ঘটে ১৬ বছরের স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের। প্রায় দুই হাজার শহিদ এবং ৩০ হাজার আহত ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে টানা দেড় দশকের শাসনামলে দেশ জুড়ে জুলুম-নির্যাতন, দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচার, ত্রাস ও গ্রাসের রাজত্ব কায়েম করা নিষ্ঠুর জালিম গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তমূলক পতন ঘটে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। জুলাইয়ে শুরু হওয়া ছাত্র-জনতার সম্মিলিত আন্দোলন ৫ আগস্টে শেষ হওয়ায় সে দিনটিকে আন্দোলনকারীরা ঘোষণা করে '৩৬ জুলাই'। স্বাধীন দেশে পরাধীনতার জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণ সেদিন দ্বিতীয়বার ফিরে পায় স্বাধীনতার স্বাদ। সমগ্র দেশের মানুষ সেদিন একযোগে রাজপথে নেমে আসে এবং দখলে নেয় শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন 'গণভবন', 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়', 'আওয়ামীলীগের কার্যালয়' ও 'সংসদ ভবন'। দখলমুক্ত থাকে কেবল প্রেসিডেন্টের 'বঙ্গভবন'। দেশের মানুষ রাজপথে উদযাপন করে বিজয়ের আনন্দ। ভারত প্রভাবিত আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর দেশের মানুষ বুক ভরা আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের। সাধারণ মানুষের রক্তভেজা অভ্যুত্থানই জুলাই বিপ্লবের ইশতেহার।

বিপ্লবের পটভূমি

জুলাই বিপ্লব শুরু হয় সরকারি চাকরিতে 'কোটা' ব্যবস্থা বিলোপের দাবি থেকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 'কোটা' ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে নিয়োগ হবে এভাবে—প্রতি ১০০ আসনের মধ্যে ২০টি আসন মেধার ভিত্তিতে, ৪০টি আসন জেলা ভিত্তিক, ৩০টি আসন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য এবং ১০টি আসন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার এই কোটাব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সবশেষে ২৪-এর

জুলাই আন্দোলনের সময় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোটায় বরাদ্দ ছিল ৫৫ শতাংশের বেশি আসন; যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০ শতাংশ, জেলাভিত্তিক কোটা ১০ শতাংশ, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ। ফলস্বরূপ, প্রতি ১০০ জন চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৪৪ জন মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে আসন নিশ্চিত করতে সক্ষম হতো, বাকি ৫৬টি আসন চলে যেতো বিভিন্ন কোটায়। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, কারণ দেখা যায় অনেক পরীক্ষায় তারা কোটার অধীনে থাকা প্রার্থীদের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েও বঞ্চিত। ফলে বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীরা এই কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করেন। ২০১৩ সালে একবার আন্দোলন হয়। তারপর ২০১৮ সালে আরেকবার আন্দোলন হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর সরকারের মন্ত্রীসভা থেকে সরকারি চাকরিতে ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করা হয়।

তারপর ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি আগের পরিপত্র বহাল রেখে ৮ম গ্রেডে এবং তার উপরের পদেও কোটাব্যবস্থা বাতিল করে আরেকটি পরিপত্র জারি করা হয়। তবে এই পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে সাতজন মুক্তিযাদ্ধা সন্তান উচ্চ আদালতে আবেদন করেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই পূর্ণাঙ্গ পরিপত্রটি ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট থেকে বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং কোটাব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হয়। এর ফলে দেশ জুড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবারও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৪ সালের ৫ জুন শুরু হওয়া সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগস্ট সরকার পতন হয়। প্রায় দুই হাজার মানুষ হত্যা এবং ৩০ হাজার মানুষ আহত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে ৫ আগস্ট দুপুরে প্রায় পনেরো বছর ধরে দেশ শাসন করা স্বৈরাচার শাসক শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। সেদিন বিকেলে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা দেন এবং সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে সকল হত্যার তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। তিন দিন পর ৮৪ বছর বয়সী দেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

'জুলাই বিপ্লব' নাম যেভাবে

আন্দোলন চলাকালে ৩ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা এখনও আগস্টে যাইনি। এই জুলাই হত্যার বিচার করেই আমরা আগস্টে যাব।' ফলে আন্দোলনটি 'জুলাই বিপ্লব' বলে অভিহিত হয়। তারপর ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এই

অভ্যুত্থানকে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস 'জুলাই বিপ্লব' এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'ছাত্র–শ্রমিক–জনতার অভ্যুত্থান' বলে অভিহিত করেন।

আওয়ামীলীগের যত অপরাধ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানের পর ১৯৭২-৭৫, ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০২৪ তিন দফায় মোট ২৬ বছর দেশ শাসন করে আওয়ামীলীগ। ২০০৬ সালে বিএনপি ক্ষমতা থেকে নামলে ৯০ দিনের কথা বলে দুই বছর ক্ষমতা ধরে রাখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অবশেষে নির্বাচনের মাধ্যমে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরে নির্বাচনে জয় লাভ করে আওয়ামীলীগ। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসার পর আদালতের মাধ্যমে সংবিধান থেকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা' বাতিল করে দেয়। তারপর ৫ বছর পরপর আওয়ামীলীগের অধীনে জাতীয় নির্বাচন হতে থাকে এবং যথারীতি প্রতিবছরই একচ্ছত্রভাবে জয়ী হতে থাকে। এভাবে ২০১৪ সালের নির্বাচন, ২০১৮ সালের নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন একচ্ছত্রভাবে আওয়ামীলীগ বিজয়ী হয়। এভাবে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা ১৬ বছর দেশ শাসন করে আওয়ামীলীগ। এই সাড়ে পনেরো বছরের শাসনামলে দেশে যেমন দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে অনেক জুলুম-অত্যাচারের দাস্তান, রক্তস্নাত স্মৃতি। ৬ জানুয়ারি ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার শপথগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসার ৫০ দিন পরেই ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি দেশের মানুষ সাক্ষী হয় এক অবর্ণনীয় মৃত্যুযজ্ঞের। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাহিনীর (তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস) হেডকোয়ার্টার পিলখানায় ৫৭ জন আর্মি অফিসার ও ১৭জন বেসামরিক লোকসহ ৭৪ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

তারপর ২০১৩ সালে দেশ ব্যাপী মাওলানা সাঈদির অর্ধশতাধিক ভক্ত-অনুরাগীকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় এবং ৫ মে শাপলা চত্বরে কওমি মাদরাসা ভিত্তিক সংগঠন হেফাজতের ইসলামের ওপর হামলা চালিয়ে প্রায় শতাধিক আলেম, মাদরাসার শিক্ষার্থী ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে হত্যা করা হয়। তারপর ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে হেফাজতে ইসলামের প্রায় ১৭ জন নেতাকর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়, এমনকি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভেতরেও জুতা পায়ে প্রবেশ করে চালানো হয় গুলি ও হত্যাযজ্ঞ। অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার বুকে তাক করা হয় বন্দুকের নল এবং এতে প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত এবং প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ আহত হন। এসব ছাড়াও ২০১২ সালে নিহত হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, পেশাজীবি পথচারী বিশ্বজিৎ দাস, ২০১৯ সালে নিহত হন বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ এবং আরও

অনেকে। এসব হত্যা-গণহত্যা ছাড়াও ১৬ বছরে গুমের শিকার হয়েছেন অসংখ্যা মানুষ। আয়নাঘর নামক ভয়ংকর টর্চার সেলের কথাও দেশবাসীর সামনে এসেছে। দেড় যুগের শাসনামলে দৃশ্যমান উন্নয়নের কপালে কালো তিলকের পাশে লেগে আছে এমন অনেক লাল দগদগে অনিরাময়ে ক্ষত।

রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সমাধানের আশা

আওয়ামীলীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় বসে দিন বদলের শ্লোগান নিয়ে এবং ১০ টাকা কেজি চাল খাওয়ানোর আশ্বাস দিয়ে। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পর দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। চলতে থাকে ব্যাংক ডাকাতি এবং বিদেশে অর্থ পাচার। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ২৫০ টাকা বাজার মূল্যের একটি বালিশের বাজেট দেখানো হয় ৫৯৫৭ টাকা। চলতে থাকে গুম-খুন। জনগণের নাভিশ্বাস উঠে যায়। যেকোনো আন্দোলন দমন করা হয় কঠোর হাতে। তবে একসময় ধীরে ধীরে বহির্বিশ্ব থেকে শুরু হয় কূটনৈতিক চাপ। এরমধ্যে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আল-জাযিরা প্রকাশ করে 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান' (ওরা প্রধানমন্ত্রীর লোক)। প্রায় এক ঘন্টার চাঞ্চল্যকর প্রামাণ্যচিত্রটি দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। এতে বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে থাকা লোকদের দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয় এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের পরিবারের সদস্যদের আন্ডারওয়ার্ল্ড সন্ত্রাসবাদের তথ্য তুলে ধরা হয়। প্রামাণ্যচিত্রটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য অ্যামনেস্টি মিডিয়া পুরস্কারের একটি বিভাগে সেরা প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার অর্জন করে। আওয়ামীলীগের উপরে আসে বিশাল এক চাপ। প্রতিবেদন প্রকাশের পর জেনারেল আজিজকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

একইসঙ্গে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, ক্রসফায়ার এবং আরও কিছু অভিযোগ তোলে এবং ছয়জন র‍্যাব অফিসারের ওপর স্যাংশন আরোপ করে। সরকারের ভাগ্য মূলত তখন থেকেই আমেরিকা ও রাশিয়া দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। এর সূচনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য রাশিয়া থেকে বাংলাদেশের পথে যাত্রা করা একটি জাহাজকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রাশিয়ার জাহাজ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয় আমেরিকা। এভাবে দুই পরাশক্তির মধ্যখানে বেশ বেকায়দায় পড়ে যায় তৎকালীন সরকার। অপরদিকে ভারত-চায়না দ্বন্দ্বেরও মধ্যে পড়ে যায় ক্ষমতাশীল দলটি। বহির্বিশ্বের এসব চতুর্মুখী চাপে এবং দেশের ভেতরের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের চাপে ভেতরে ভেতরে পিষ্ট হতে থাকে আওয়ামীলীগ। একইসঙ্গে দীর্ঘ দিন বিরোধী দল ছাড়া এককভাবে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামীলীগের বিভিন্ন সংগঠনের

মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোন্দল। এভাবেই আওয়ামীলীগ ভেতর থেকে শক্তি হারাতে থাকে। এসব চতুর্মুখী চাপের সুযোগে ২০২৩ সালের ২৮ আক্টোবর প্রকাশ্যে জনসমাবেশ করে বিএনপি। একইসঙ্গে প্রকাশ্যে রাজপথে নামে জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামীলীগ ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারিতে নির্বাচন ঘোষণা করলেও বিএনপি নির্বাচন বর্জন ও বয়কটের ঘোষণা দেয়। ২০২৩ সালের শেষ এবং ২০২৫ সালের শুরুভাগে নির্বাচন বর্জন করে দেশ ব্যাপী লিফলেট বিতরণ করে বিএনপি। এতে দেশের মানুষের মধ্যে আশা জাগে, বিগত নির্বাচনগুলো এককভাবে সম্পন্ন করতে পারলেও দানব হয়ে ওঠা দলটির সব জুলমের হয়তো এবার অবসান হতে যাচ্ছে।

আগুনে পোড়ানো নতুন বছর

২০২৪ সাল, নতুন বছরটি শুরু হয় আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে। বরাবরের মতোই পহেলা জানুয়ারির আগের রাতে দেশ জুড়ে চলে 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' উদযাপন এবং আগুনের ফানুস ওড়ানো উল্লাস। বিভীষিকাময় উৎসবে মেতে ওঠে শহরের মানুষ। থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন করতে গিয়ে সাউন্ড বক্সে বিদ্যুৎসংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় মানুষ। বাসার ছাদে ফানুস ওড়াতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয় মানুষ। মেট্রোরেলের তারে ফানুস পড়ে বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো চলাচল। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের আগের দিনের রাতে। নির্বাচন বয়কট ঘোষণা করে বিএনপি ৪৮ ঘন্টার হরতাল ডাক দেয়, হরতালের সময় শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে রাত নয়টার দিকে রাজধানী গোপীবাগে একটি চলন্ত ট্রেনে আগুন ধরানো হয়। এতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায় ৪ জন মানুষ, আহত হয় আরও অনেক মানুষ। ৩০ বছর বয়সী এক চিকিৎসক গ্রাম থেকে ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফেরার পথে চোখের সামনে স্ত্রী মারা যায়। আরেকজনের স্ত্রী-সন্তান চোখের সামনে জ্বলে পুড়তে দেখে তিনিও বগির ভেতর আগুনে পুড়তে থাকেন এবং জানালার বাইরে মাথা বের করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বাহির থেকে লোকজন উদ্ধার করতে গেলে তিনি বলেন, চোখের সামনে স্ত্রী-সন্তান পুড়ে গেল, আমার শরীরের ৯০ ভাগ পুড়ে গেছে, বের হয়ে কী করব? এ ঘটনায় বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয় এবং আওয়ালীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২০টি ভোটকেন্দ্র পোড়ানো, ট্রেনে আগুন দেওয়াসহ সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়ে বিএনপি।' আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়, ২৮ অক্টোবরের পর থেকে 'বিএনপি-জামায়াত' ৬৫৮টির বেশি যাত্রীবাহী বাসে আগুন ও যানবাহন ভাঙচুর করেছে। রেলে নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে ২১টি। ১৭টি ট্রেনে আগুন দিয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিএনপি-জামাতের অগ্নিসন্ত্রাস রোধে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হতে থাকে এবং একইসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড ঘটতে থাকে। নির্বাচনের আগে দেশে সৃষ্টি হয় চরম ভীতিকর পরিবেশ।

আদালতের কাঠগড়ায় দেশের কিংবদন্তি

১ জানুয়ারি ২০২৪। বছরের প্রথম কর্মদিবস শুরু হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের একমাত্র নোবেল জয়ী এবং বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে। ৮৪ বছর বয়সী এই বরেণ্য ব্যক্তি আদালতে হাজির হলে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং লিফট বন্ধ থাকায় আদালত ভবনের ৮ তলা পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করেন। আদালতের রায়ের পর ড. ইউনূসসহ ৪ জনের জামিন আবেদন করা হলে বিচারক ৫ হাজার টাকা মুচলেকায় তাদের জামিন দেন। সেদিন আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'যে দোষ করিনি, সেই দোষে শাস্তি পেলাম। এই দুঃখ মনে রয়ে গেল।' এ ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয় যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। শ্রম আদালতের এই রায়কে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন এবং 'রাজনৈতিক প্রতিশোধ' আখ্যা দিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলে, 'নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দোষী সাব্যস্ত করা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবরুদ্ধ দশার প্রতীক। বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিক গতিতে বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছে, তা বাংলাদেশের অন্যান্য শ্রম অধিকার-সম্পর্কিত আদালতের মামলার সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় শ্রম আইন ও বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন। দেওয়ানি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য মুহাম্মদ ইউনূসসহ তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম শুরু করা শ্রম আইন ও বিচারব্যবস্থার একটি স্পষ্ট অপব্যবহার। ইউনূসের কাজ ও ভিন্নমতের জন্য তার প্রতি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি দৃষ্টান্ত এটি।' (ইউনূসের দোষী সাব্যস্ত হওয়া বাংলাদেশের অবরুদ্ধ দশার প্রতীক, দৈনিক সময়ের আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)। এরপর ফেব্রুয়ারিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ কার্যালয় দখলে নেওয়া হয় এবং বিশ্বে সমালোচনার জন্ম দেয়।

বিভীষিকাময় নির্বাচনি পরিবেশ

২০২৪ এর ৭ জানুয়ারি ১২তম জাতীয় নির্বাচন ছিল একেবারে একতরফা। দেশের মানুষ এবং বিশ্বের মানুষ বিস্মিত চোখে দেখছিল শুধু। দেশের প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে। ফলে আওয়ামীলীগ এবং মিত্র ও অনুগত দল নিজেদের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করে। নির্বাচন উপলক্ষে দেশে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনী নামানো হয়। মোটরসাইকেল, স্পিডবোটসহ বেশকিছু যানবাহনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয় ৬ জানুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত

১২টা থেকে ৭ জানুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত ট্যাক্সি, পিক আপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। একদিকে একরফা নির্বাচন আয়োজন, অপরদিকে চলতে থাকে বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে প্রচারণা; একইসঙ্গে সরকারের গণগ্রেফতার এবং দমন-পীড়ন। ভোটের দিন দেশের সবগুলো ভোটকেন্দ্র ফাঁকা পড়ে থাকে, জনগণ নিজ ঘরে সময় কাটায়। গণ-অসন্তোষের মুখে এককভাবে নির্বাচন দিয়ে ২৯৮টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে আওয়ামীলীগ নিজেদের জয় দেখায় এবং সরকার গঠন করে। এই নির্বাচন আন্তর্জাতিক মহলেও ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকার থেকে বলা হয়, '১৯৭৫ সালের পর দেশের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে'। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নিজেদের বিজয়ী মনে করলেও জনগণের মধ্য চাপা অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়। ছাত্র-জনতার মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দেয়। জনগণ একটি অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু অভ্যুত্থান কোন দিক থেকে বিস্ফোরিত হবে, সেটা তখনও ছিল সবার অজানা।

পতনের আগের অবস্থা

আওয়ামীলীগ সফলভাবে নির্বাচন মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হলেও দলের ভেতর দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও ভাঙন। দেশের বিভিন্ন জেলায় আওয়ামীলীগের দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এরমধ্যে শুরু হয় মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ। মিয়ানমার থেকে পলায়নপর সৈনিক-নাগরিক দেশের সীমান্তে ঢুকে পড়ে, একইসঙ্গে মিয়ানমারের গুলি ও গোলা এসে পড়তে থাকে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষেরর ঘরের ভেতর। ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের একটি জাহাজ হাইজেক করে যায় জলদস্যুরা। বাজারেও দ্রব্যমূল্যে আগুন ধরে যায়, রোজার আগে যে বেগুন ছিল কেজিতে ৬০ টাকা, সেটা হয়ে যায় ১৬০ টাকা। টিসিবির লাইন দীর্ঘ হতে থাকে এবং শ্রম মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক লুটপাটের খবর গণমাধ্যমে আসতে থাকে। মার্চের শেষ দিকে বুয়েটে শুরু ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের আন্দোলন। ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বুয়েট ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। আওয়ামীলীগের দেড় যুগের একচ্ছত্র আধিপত্যের সময় এই প্রথম এমন বড় ধরনের বাঁধার মুখে পড়ে ছাত্রলীগ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ফাঁস করতে থাকে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের চালানো রোমহর্ষক সব ঘটনা। একদিকে তীব্র গরম আরেকদিকে বাড়তে থাকে সীমাহীন লোডশেডিং, কমতে থাকে গ্যাস, দেউলিয়া হতে থাকে ব্যাংক, বাড়তে থাকে ডলারের দাম, তলানিতে নামতে থাকে রিজার্ভ, পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নজিরবিহীন দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আসে; এরমধ্যে জুন মাসে কুরবানির ঈদে '১৫ লক্ষ টাকার একটি ছাগল' পা দিয়ে

খুড়ে বের করে আনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তা ড. মতিউর রহমান এবং তার পরিবারের সীমাহীন দুর্নীতি ও অঢেল সম্পদের গুপ্তভাণ্ডার। আরও প্রকাশ হয় মেডিক্যাল ভর্তিপরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসসহ বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে ড্রাইভার আবেদ আলীসহ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির পিলে চমকানো খবর। এরমধ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে দুইবার ভারত সফর করেন এবং রেল ট্রানজিটসহ অনেক বিতর্কিত চুক্তি করে আসেন। এমন নানাবিধ খবরে দেশ যখন সরগরম এবং দেশের মানুষ যখন নানা সংকটে অতিশয় অতিষ্ঠ; ঠিক তখনই দেশে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন।

দুই বৈরী দেশে সফর, আওয়ামীলীগের নৌকাডুবি

৫ জুন কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়ে ৫ আগস্ট পতনের আগে মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে তিন-তিনবার দুই বৈরী দেশ ভারত-চীন সফর করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রথমে ৮-১০ জুন নরেন্দ্র মোদির শপথগ্রহণ উপলক্ষে ভারত সফর করেন, তারপর মাত্র দুই সপ্তাহের কম সময়ের ব্যবধানে মোদির বিশেষ আহ্বানে ২১-২২ জুন ভারত সফর করেন, তারপর ৮-১০ জুলাই সফর করেন চীন। মোদির শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হওয়া সফরটি কূটনৈতিক শিষ্টাচার হিসেবে দেশের মানুষ মেনে নিলেও দ্বিতীয় সফরটি দেশে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। বিশেষ করে এই সফরে ঢাকা-দিল্লি ১০টি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করে, যার মধ্যে ছিল রেল ট্রানজিট, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সমুদ্র অর্থনীতি ও সমুদ্র সহযোগিতা এবং এমন সব বিষয়, যাতে দেশের স্বার্থ দৃশ্যমান ছিল না। এই সফরের পর ভারত-চীনের মধ্যকার তিস্তার পানি নিয়ে শীতল যুদ্ধ অমীমাংসিত রেখেই চীন সফরে যান তৎকালীন প্রধানন্ত্রী। ভারতকে দুই হাত ভরে সহযোগিতা দিয়ে আসার পর চীনে গেলে চীনের পক্ষ থেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

চীন থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার সহযোগিতা পাওয়ার কথা থাকলেও নামমাত্র এক বিলিয়ন ডলার সহযোগিতার কথা বলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চার দিনের সফরের উদ্দেশ্যে ৮ জুলাই চীনে গেলেও প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পেয়ে সফর সংক্ষিপ্ত করে ১০ জুলাই দেশে ফিরে আসেন। এই অপ্রত্যাশিত বিষয়টি বিশেষ মহলে অস্বস্তিকর ও বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও এতে এমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন যে, রাষ্ট্রীয় সফর পরবর্তী আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ও সংবাদ সম্মেলন করতে দীর্ঘ সময় নেন; দীর্ঘ বিলম্বের পর ১৪ জুলাই সফরের বিষয়ে মুখ খোলেন এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদেরকে 'রাজাকারের নাতি-পুতি' অভিহিত করে আগুনে ঘি ঢেলে দেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজপথে নেমে আসে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। সেদিন রাজপথে শ্লোগান ওঠে—'তুমি কে আমি কে? রাজাকার, রাজাকার। কে

বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার'। এই এক শ্লোগানে তাসের তুরুপের মতো ভেঙে পড়ে অর্ধ শতাব্দির স্বাধীনতার চেতনার ফানুস। তারপর আন্দোলন ছড়িয়ে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে তার বুকে গুলি ছোড়ে পুলিশ। এতে পুরো দেশ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। রক্তরাঙা পথ মাড়িয়ে নিয়ে আসে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

৫ আগস্ট হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার তিন দিন পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসসহ মোট ১৭ সদস্যের উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত হয় এ সরকার। বঙ্গভবনের দরবার হলে ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন ও গোপনীয়তার শপথ নেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। পরে রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে অভিনন্দন জানান। এরপর ১৬ উপদেষ্টার নাম ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। তাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১৩ জন একসঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শপথ নেন। শপথ গ্রহণের পর নিয়ম অনুযায়ী তারা শপথ বইয়ে সই করেন। বিধান রঞ্জন রায়, ফারুক-ই-আজম ও সুপ্রদিপ চাকমা এই তিনজন ঢাকার বাইরে থাকায় শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। শপথ নেওয়া অন্য ১৩ উপদেষ্টা হলেন—বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ড. আসিফ নজরুল, মানবাধিকারকর্মী আদিলুর রহমান খান, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন, পরিবেশ আইনজীবী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, নির্বাচন পর্যবেক্ষক শারমিন মুর্শিদ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন, ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, উন্নয়নকর্মী ফরিদা আখতার, গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরজাহান বেগম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম এবং আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। শপথ অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সহধর্মিণী অধ্যাপক আফরোজী ইউনুসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও কূটনীতিকরা দরবার হলে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) সদস্যদের প্রটোকলে রাত ৮টা ২৫ মিনিটে বঙ্গভবনে প্রবেশ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। তিনি বঙ্গভবনে

এলে বাইরে অপেক্ষমাণ জনতা তাকে অভিবাদন জানান ও স্লোগান দেন। বিকাল থেকেই বঙ্গভবনে হাজারো উৎসুক জনতা ভিড় করতে থাকেন।

শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন উৎসবের মুহূর্তে এ স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা দেশে একটি অরাজকতা ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অরাজকতা আমাদের শত্রু। একে দ্রুত পরাজিত করতে হবে। স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস যেন প্রত্যেকে বুক ভরে নিতে পারে এই নিশ্চয়তা দানই আমাদের সরকারের প্রথম প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও তার সদস্যরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে উপভোগ করবেন। দেশকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন এবং দেশবাসী ও জগদ্বাসীকে উপভোগ করার সুযোগ করে দেবেন। দেশের সব মানুষকে আজ স্বাধীন, নির্ভয়, নিরুদ্বেগ থাকার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আমাদের ছাত্র শহিদরা প্রাণ দিয়েছেন। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট সরকার দেশের প্রত্যেকের সরকার। এখানে থাকবে সবার আকাঙ্ক্ষা পূরণের অধিকার। সারা বিশ্ব আজ অবাক হয়ে বলছে শাবাশ বাংলাদেশ। শাবাশ বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা। আমরা এই অর্জনটাকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিতে চাই।'

জুলাই বিপ্লব : তত্ত্ব, দর্শন ও ডিসকোর্স

মুমিতুল মিম্মা

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন রাজনৈতিক দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এটি শুধু একটি স্বৈরাচারী সরকারের পতন নয়, বরং রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোর ওপর জনগণের সরাসরি চ্যালেঞ্জ। শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ সাড়ে পনেরো বছরের শাসনের অবসান ঘটেছে এক গণজাগরণের মাধ্যমে, যার মূল নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষার্থীরা। তবে এটি শুধুই ছাত্রদের আন্দোলন ছিল না; সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, নারী ও সংখ্যালঘুরাও এই বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে গণআন্দোলনের দৃষ্টান্ত আগেও রয়েছে, বিশেষত ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৯০-র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৯৬-র রাজনৈতিক সংকট। তবে ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের বিশেষত্ব হলো—এটি কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন আনেনি, বরং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কাঠামো নিয়ে নতুনভাবে চিন্তার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। একদিকে এটি ক্ষমতার কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যদিকে এটি রাজনৈতিক ভাবধারার একটি পুনঃসংজ্ঞায়নও বটে। এই বিপ্লবকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হলে আমাদের বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের তত্ত্ব বিবেচনায় আনতে হবে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বুঝতে হবে, জুলাই বিপ্লব শুধুমাত্র একটি সরকার পতনের ঘটনা নাকি এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপান্তরের সূচনা।

অভ্যুত্থান নয়, বিপ্লব

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতির বাস্তববাদী বিশ্লেষকদের অন্যতম, যিনি মনে করতেন যে শাসনের মূল লক্ষ্য হলো ক্ষমতা দখল এবং তা ধরে রাখা। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যগুলোর একটি হলো—একজন শাসকের জন্য ভালোবাসার চেয়ে ভয় সৃষ্টি করাই উত্তম। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, ভয় যেন ঘৃণায় পরিণত না হয়। যদি জনগণ একসময় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে সেই শাসকের পতন অনিবার্য। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য প্রিন্স-এ উল্লেখ করেন যে, 'ক্ষমতা টিকে থাকে কৌশলের মাধ্যমে, নৈতিকতার মাধ্যমে নয়।' শেখ হাসিনার

সরকার শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ধরে তারা জনগণকে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে পক্ষে রাখতে চেয়েছিল, যেমন—অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, এবং রিজার্ভ বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির গল্প প্রচার। এই কৌশলগুলো প্রথমদিকে সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে সহায়তা করলেও, শেষ পর্যন্ত জনগণের মনে সরকারবিরোধী ক্ষোভ জমতে থাকে। তবে শেখ হাসিনার সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল বদলাতে পারেনি। তারা আন্দোলনের সূচনা পর্যায়ে ছাত্রদের ক্ষোভকে গুরুত্ব দেয়নি। পরিস্থিতি জটিল হওয়ার পরও তারা সহিংস দমননীতি গ্রহণ করেছিলেন, যা জনগণের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়। সরকার নিজেকে অপরিহার্য মনে করেছিল, কিন্তু জনগণ বুঝতে পারে, তারা নতুন নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত। এখানেই ছিল শেখ হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড় কৌশলগত ব্যর্থতা, যা শেষ পর্যন্ত তাদের পতনের কারণ হয়।

থমাস হবস বিশ্বাস করতেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর, বিশৃঙ্খল এবং সহিংস। তাই সমাজে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তার মতে, মানুষ যদি রাষ্ট্রের বিধিবিধান না মানে, তবে সমাজ বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হবে। এজন্য মানুষ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract) থাকতে হবে—যেখানে জনগণ কিছু স্বাধীনতা ছেড়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দেবে, যাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে। এ ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রকে তিনি লেভিয়াথান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শেখ হাসিনা সরকার একটি লেভিয়াথান রাষ্ট্রের মতো আচরণ করেছিল। প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রকে জনগণের ওপর কঠোরভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'জনগণের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য'—এই অজুহাতে নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা কঠোর আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের ওপর ভয়ভীতি প্রদর্শনের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

জুলাই বিপ্লবের বীজ

কিন্তু হবসের তত্ত্ব অনুসারেই, শক্তিশালী রাষ্ট্র তখনই বৈধ থাকে, যদি তা জনগণের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। রাষ্ট্র যদি চরমভাবে ব্যর্থ হয় এবং জনগণের সুরক্ষা দিতে না পারে, তাহলে জনগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। ইমানুয়েল কান্টও একই ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র কেবল শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নয়, বরং এটি জনগণের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তার *পারপেচুয়াল পিস* বইয়ে বলেছেন—'যদি কোনো রাষ্ট্র জনগণের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে সেটি জনগণের জন্য বৈধ রাষ্ট্র হতে পারে না।' বাংলাদেশের ক্ষেত্রে,

শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, এর ফলে জনগণ তাদের প্রকৃত মতপ্রকাশ করতে পারেনি। ভিন্নমতের প্রকাশে বাঁধা দেওয়ার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দমন করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে। এই পরিস্থিতিতে জনগণ বুঝতে পারে যে, তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে না এবং সরকার তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। কান্টের মতে, এই ধরনের সরকার একটি অবৈধ সরকার, এবং জনগণের উচিত এ ধরনের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। রাষ্ট্র যখন স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে জনমনে ক্ষোভ জমতে থাকে।

স্বৈরাচারের ফাঁকা বুলি

মিশেল ফুকো ক্ষমতার গঠন ও প্রভাব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন, ক্ষমতা কেবল শাসকদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে থাকে এবং জনগণের চিন্তাভাবনা, আচরণ ও দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফুকো দুই ধরনের ক্ষমতা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমত, শাস্তিমূলক ক্ষমতা যা মূলত জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল হিসেবে খ্যাত। শেখ হাসিনার শাসনামলে রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের ওপর নজরদারি, শাস্তি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে, যা ফুকোর শাস্তিমূলক ক্ষমতার ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। আর দ্বিতীয়ত, বায়োপাওয়ার বা জনগণের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল। ফুকো দেখিয়েছেন রাষ্ট্র শুধু বাহ্যিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, বরং জনগণের জীবন ও চিন্তাভাবনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে তারা নিজেরাই রাষ্ট্রের পক্ষে থাকতে বাধ্য হয়। শেখ হাসিনার সরকার বায়োপাওয়ার ব্যবহার করে জনগণের চিন্তাভাবনা ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল। টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে একতরফা সরকারি প্রচার চালিয়ে জনগণের মন গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সরকার প্রচার করেছিল যে, 'বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে,' 'শেখ হাসিনা না থাকলে দেশ পিছিয়ে যাবে,' 'এই মেট্রোরেল, এই ইন্টারনেট কে দিয়েছে' ইত্যাদি। সরকার দাবি করেছিল যে, বিরোধীদের ক্ষমতায় এলে দেশে আবার অস্থিরতা দেখা দেবে, সুতরাং জনগণের নিরাপত্তার জন্য সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে হবে। পাঠ্যবই ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার নিয়মিতভাবে তার আদর্শ প্রচার করে যাচ্ছিল, যাতে নতুন প্রজন্ম সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে।

জুলাইয়ে আসলে কী হয়েছে

ফুকোর মতে, এই সমস্ত ব্যবস্থা আসলে জনগণের শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করার

জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে তারা কখনোই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে। তবে তিনি মনে করতেন, ক্ষমতা ও প্রতিরোধ (Resistance) একে অপরের পরিপূরক। যেখানে ক্ষমতা থাকে, সেখানে প্রতিরোধও জন্ম নেয়। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব ফুকোর এই ধারণার বাস্তব উদাহরণ। আবার জ্যাক দেরিদার তত্ত্ব অনুযায়ী, ক্ষমতার ভাষা সবসময় নিরপেক্ষ থাকে না, বরং এটি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। আওয়ামী লীগ সরকার 'উন্নয়ন', 'স্থিতিশীলতা' এবং 'অগ্রগতি' শব্দগুলো ব্যবহার করে জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, তাদের ছাড়া দেশ চলতে পারবে না। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণ এই বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আপামর জনতার কাছে রাজাকার শব্দটি গালাগাল হিসেবে স্বীকৃত হলেও যখন রাজপথে থাকা অসংখ্য শিক্ষার্থীরা কোটার বিপক্ষে 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' বলে স্লোগান দেয় সেখানে 'রাজাকার' শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়। রাজাকার হয়ে ওঠে উপহাস ও বক্রোক্তির নামান্তর। আর দেরিদার মতে, 'যখন ভাষার অর্থ পরিবর্তিত হয়, তখন ক্ষমতার কাঠামোও পরিবর্তিত হয়।' জনগণ যখন বুঝতে পারল যে 'উন্নয়ন' আসলে একটি শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার অস্ত্র, তখন তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

একই কথা বলেছেন আন্তোনিও গ্রামসি। তিনি মনে করেন, কোনো শাসনব্যবস্থা শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে টিকে থাকে না, বরং এটি সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত আধিপত্য (Hegemony) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, শাসকশ্রেণি শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহ্যিক শক্তির (Force) মাধ্যমে শাসন করে না; বরং প্রচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। শেখ হাসিনা সরকার ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একটানা ক্ষমতায় ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে তারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের প্রচার ছিল এ শাসনব্যবস্থার একটি কৌশল। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ সরকার-সমর্থিত ছিল। যেসব মিডিয়া সরকারের সমালোচনা করত, তাদের ওপর সেন্সরশিপ, আইনি বাধা ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হতো। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগকে সরকার তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করত, যাতে বিরোধীদের ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করা যায়। ক্ষমতাসীন দলের ব্যবসায়িক সহযোগীদের জন্য সুবিধাজনক নীতিমালা প্রণয়ন করা হতো, যাতে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকে এবং সাধারণ জনগণ তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে বিক্ষোভ দমন, গ্রেফতার, নির্যাতন ও গুমের মাধ্যমে জনগণকে ভয় দেখানো হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেই গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা ও দীর্ঘ কারাবাসের শাস্তি দেওয়া ছিল নিত্যদিনের

ঘটনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে গ্রেফতার ও হয়রানির ভয় দেখিয়ে জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিণ করা হয়।

বিপ্লবের পথ যখন নির্মাণ হয়

গ্রামসি বলেছেন, 'যখন শাসক শ্রেণির আদর্শিক আধিপত্য দুর্বল হয়ে যায়, তখনই বিপ্লবের পথ তৈরি হয়।' ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক বৃহৎ গণপ্রতিরোধের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একত্রিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যে আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা ছাত্রসমাজ প্রত্যাখ্যান করেছে। শ্রেণি ও পেশা নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল। বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথমবারের মতো এত বড় পরিসরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে। যেহেতু প্রচলিত গণমাধ্যম ছিল সরকার-নিয়ন্ত্রিত, তাই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ও টেলিগ্রামের মতো সামাজিক প্ল্যাটফর্ম। তরুণ সমাজ এই প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে নিজেদের বার্তা ছড়িয়ে দেয় এবং সরকারবিরোধী চেতনা তৈরি করে। এটি গ্রামসির হেজেমনির বিরুদ্ধে কাউন্টার হেজেমনি বা পাল্টা আধিপত্য তৈরি করার একটি বড় উদাহরণ।

শেখ হাসিনা সরকার প্রথমদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের মাধ্যমে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সরকারের দমন-পীড়ন নীতি কার্যকর হয়নি। বরং দমননীতিতে একহাত দেখে নিতে জনগণ আরও সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামে। মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনের ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে সরকারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ম্যাকিয়াভেলি মনে করতেন, শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা সহজ, কিন্তু তা ধরে রাখা কঠিন। শেখ হাসিনার সরকার প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে যতই ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল, জনগণের সম্মিলিত শক্তির সামনে সেই কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

জুলাই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ

কিন্তু, এ বিপ্লবের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। বিপ্লবের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। তবে, বিপ্লবোত্তর সময়ে বাংলাদেশ অনেকটাই হবসিয় সমাজে পরিণত হয়েছে। সরকারের পতনের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা এবং নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট দিকনির্দেশনার অভাবে বিভিন্নস্থানে বিশৃঙ্খলা

দেখা দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, যার ফলে মব বা গণউন্মাদনার বেড়েছে বহুলাংশে। এ সময়ে লুটপাট, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে হামলা এবং সম্পত্তি ধ্বংসের মতো ঘটনাও ঘটছে অহরহ। বিপ্লবোত্তর সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিভিন্নস্থানে নারীর ওপর সংঘবদ্ধ সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে। ধর্মীয় স্থাপনা, বিশেষ করে মাজার ও দরগাহগুলোয় হামলা ও ভাংচুর নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয়তার ফলে এই ধরনের ঘটনা বেড়েছে। এতে অন্যান্য ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্বের কারণে বেড়েছে ছিনতাই ও ডাকাতি। এতে শহরাঞ্চলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত হয়েছে নতুন উপাদান- নিরাপত্তাহীনতা।

রাজনৈতিক দুর্বলতা এবং অনেকক্ষেত্রে অনীহার কারণে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। নেতৃত্বের অভাব, দুর্নীতি এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে প্রশাসনিক কার্যক্রমে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। ফলে, অপরাধ দমন ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। বিপ্লব পরবর্তী সমন্বয়ক ও স্থানীয় নেতারা তাদের ক্ষমতা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার শুরু করেছেন। এতে সরকারি সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে জনগণের আস্থা বাড়ার বদলে বহুলাংশে কমেছে।

গ্রামসি মনে করতেন, 'প্রকৃত বিপ্লব তখনই ঘটে, যখন কেবল সরকার নয়, পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি পাল্টে দেওয়া হয়।' ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচার পতন ঘটালেও রাজনৈতিক কাঠামো ছিল অপরিবর্তিত। কিন্তু ২০২৪ সালের আন্দোলন ক্ষমতার প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। এ কারণে জুলাই বিপ্লবকে কেবল সরকার পতনের লক্ষে একটি রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলা যাবে না; বরং এটি ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীরে থাকা আদর্শিক আধিপত্য ভেঙে ফেলার একটি প্রচেষ্টামাত্র। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এটি শুধু একটি শাসকের পতন নয়, বরং রাষ্ট্রকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার আন্দোলন। কিন্তু, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করছে বিপ্লব পরবর্তী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর। জনগণের প্রকৃত মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্র কেবল ক্ষমতার হাতবদল নয়, বরং কাঠামোগত পরিবর্তন আনবে।

জুলাই বিপ্লব : ৩
নতুন বন্দোবস্ত কি পুরানো বোতলে টিকবে?

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রতিটি গণআন্দোলনের পরই একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে : এবার কি সত্যিই কিছু বদলাবে? নাকি শুধু নাম বদলাবে, গন্তব্য সেই পুরানো জায়গাতেই ফিরে যাবে? ২০২৪ সালের জুলাইয়ে যে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার জাগরণ দেখা গেল, তাতেও এই প্রশ্নটা আবার নতুন করে সামনে এসেছে। এই আন্দোলনের পর 'নতুন বন্দোবস্ত' শব্দবন্ধটি হয়ে উঠেছে প্রায় এক রাজনৈতিক দর্শনের নাম। অনেকেই বলছেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের এক নতুন সামাজিক চুক্তি দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই নতুন বন্দোবস্ত কি পুরানো বোতলের ভেতরই ধরা থাকবে? নাকি সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্রের কোনো কাঠামোগত রূপান্তর ঘটবে?

রাষ্ট্রের গণবিচ্ছিন্নতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

বাংলাদেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকটাই একতরফা এক নির্দেশনার কাঠামোতে পরিণত হয়েছে। সরকার চলে নির্বাচনের বাইরেও, প্রশাসন চলে জবাবদিহিতার বাইরেও, আইন চলে ক্ষমতার যুক্তিতে। ফলে একসময় এসে নাগরিকের কাছে রাষ্ট্র এক প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে করুণ দিক হলো গণহত্যা ও সহিংসতার বিচারহীনতা। হোক সেটা ২০১৩ সালের শাপলা চত্বর, ২০১৮ সালের কোটা ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কিংবা ২০২৪ সালের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত তরুণেরা—প্রতিবারই রাষ্ট্র নিজেকে দায়মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছে। তদন্ত হয়নি, বিচার হয়নি, কেউ দায় স্বীকার করেনি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও বিচারের প্রতিশ্রুতি দিলেও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। এই বিচারহীনতা একটি চক্র তৈরি করেছে—রাষ্ট্রের অবৈধ ব্যবহারে মানুষ হতাহত হবে, মানুষ পথে নামবে, রাষ্ট্র আবার তা দমন করবে। এই দমন, বিচারহীনতা এবং আবার দমন—এই চক্রের ভেতরই আমাদের রাজনীতি আটকে গেছে।

নতুন বন্দোবস্তের কথা তখনই সামনে আসে, যখন পুরানো ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরেই। দেড়

দশকের বেশি সময় ধরে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়নি, বিরোধীদলীয় রাজনীতি প্রায় নিশ্চিহ্ন, সংসদ বিতর্কহীন, এবং আদালত পক্ষপাতের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ। রাষ্ট্র যখন আর গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারাটুকু দেখানোর প্রয়োজনও বোধ করে না, তখন নাগরিকেরা বাধ্য হয় রাস্তায় নামতে। কিন্তু সেখানেও যদি তারা গুলিবিদ্ধ হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের 'আইনি বৈধতা'-র ধারণাটাও ধসে পড়ে। তখন আর তা রাষ্ট্র থাকে না, হয়ে ওঠে এক ক্ষমতা কাঠামোর বাহ্যিক খোলস মাত্র।

নতুন বন্দোবস্ত বলতে অনেকে বোঝাতে চাচ্ছেন একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আয়োজন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষীকরণ, এবং প্রশাসনিক সংস্কার। অন্তর্বর্তী সরকার কি শুধু নির্বাচনই আয়োজন করবে, নাকি কাঠামোগত সংস্কারের দায়ও নেবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমাদের বুঝতে হবে, এই 'নতুন বন্দোবস্ত' কী। এটি কেবল একটি সরকার বদলের ইচ্ছা নয়। এটি রাষ্ট্রের ভেতরকার সম্পর্ক, দায়বদ্ধতা ও ক্ষমতার কাঠামোর রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা। জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে ভাঙনের মুখে, তা বহুদিন ধরেই স্পষ্ট। কিন্তু জুলাইয়ের আন্দোলন সেই ভাঙনকে আরও দৃশ্যমান করে তোলে। এখন প্রশ্ন, এই জনঅসন্তোষ কেবল একটি মুহূর্তিক আবেগ ছিল, নাকি এটি একটি প্রক্রিয়ার সূচনা?

নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন

'নতুন বন্দোবস্ত' ছিল এক ধরনের অলিখিত ইশতেহার—যেখানে মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল একটি ভিন্ন বাংলাদেশ গড়ার। এই স্বপ্নের কেন্দ্রে ছিল ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, সুশাসন, এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের নতুন সম্পর্ক। কিন্তু এই নতুন বন্দোবস্ত কি বাস্তবতার মাটি ছুঁয়েছে, নাকি কেবল কিছু দিনের উত্তেজনায় জন্ম নেওয়া এক আবেগ ছিল?

বাংলাদেশের ইতিহাসে জনতার জাগরণ নতুন নয়। কিন্তু প্রায় প্রতিবারই দেখা গেছে, সেই জাগরণে জন্ম নেওয়া আশা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কখনো তা রাজনৈতিক আপসের ফাঁদে, কখনো নেতৃত্বের বিভ্রান্তিতে। ফলে প্রশ্ন ওঠে—এবার কি আলাদা?

এবারের কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয়—প্রথমত, নেতৃত্ব ছিল বিকেন্দ্রীকৃত। কোনো একক ব্যক্তি বা দল নয়, বরং একটি সচেতন তরুণ প্রজন্ম এই আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের ধরন ছিল শান্তিপূর্ণ এবং আত্মমর্যাদায় ভরপুর। এটা ছিল ভাঙচুর নয়, চিন্তার প্রতিবাদ। তৃতীয়ত, এই আন্দোলনের ভাষা ছিল নিজস্ব—ফেসবুক পোস্ট, ইনস্টাগ্রাম স্টোরি, ক্যাম্পাসের প্ল্যাকার্ড—সবই বলছিল, একটা নতুন চিন্তার জন্ম হয়েছে।

তবে কেবল ইচ্ছা থাকলেই পরিবর্তন আসে না। নতুন বন্দোবস্ত মানে কেবল ক্ষমতা বদল নয়, বরং রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে বদল—বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—সবকিছুর পুনর্বিন্যাস। এর জন্য দরকার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক রূপরেখা, যা এখন আলোচনায় অনুপস্থিত হয়ে পড়েছে।

তারপরও, জুলাই আন্দোলন আমাদের সামনে যে দরজাটা খুলে দিয়েছে, তা একেবারে নতুন কিছু নয়; কিন্তু সেই পুরানো স্বপ্নকে নতুন প্রজন্মের ভাষায় বলা। নতুন বন্দোবস্ত যদি কেবল 'একটি নির্বাচনের দাবি'-তে আটকে যায়, তবে তা ব্যর্থ হবে। কিন্তু যদি এটি হয় একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক চুক্তি—যেখানে মানুষ ও রাষ্ট্র, তরুণ ও প্রবীণ, শহর ও গ্রাম, নারী ও পুরুষ—সবার জন্য সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার নাম, তবে সেটিই হবে প্রকৃত পরিবর্তনের শুরু।

সংস্কার উদ্যোগ ও রাজনৈতিক বিরোধিতা

জুলাইয়ের পর গঠিত অন্তর্বর্তী প্রশাসন কিছু সংস্কারমূলক উদ্যোগ নিয়েছে—নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নির্দলীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিশ্চিতকরণের ঘোষণা, কিছু গুম-খুনের ঘটনার পুনঃতদন্তের ঘোষণা। এসব পদক্ষেপ দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক মহলে কিছুটা আশাবাদ তৈরি করলেও তা খুব দ্রুত রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়ে। বিশেষ করে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাকে 'অগণতান্ত্রিক', 'নির্বাচন ঠেকানোর কৌশল' কিংবা 'সংবিধানবিরোধী' বলে দাবি করে আসছে। তারা দ্রুত নির্দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করছে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষমতায় যেতে চায়। তাদের যুক্তি হচ্ছে—এই সরকারের নাকি জনগণের ম্যান্ডেট নেই, তাই তার সংস্কার কর্মসূচিও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের চেয়ে বড় ম্যান্ডেট আর কী আছে?

প্রশ্ন হলো, যে রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ ছিল এবং যাদের সময়ে দমন-পীড়ন, বিচারহীনতা ও প্রশাসনিক দলীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ ছিল—তাদের হাতে নতুন বন্দোবস্ত কতটা নিরাপদ? তারা যদি ক্ষমতায় ফিরে আসে, তাহলে কি সত্যিই কাঠামোগত সংস্কার ঘটবে, নাকি আগের চেনা বলয়ের মধ্যেই আমরা ঘুরপাক খেতে থাকব?

অতীত অভিজ্ঞতা বলে, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যখনই ক্ষমতায় আসে, তখন তাদের প্রথম লক্ষ্য হয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করা। বিরোধী দল হলে তারা গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু ক্ষমতায় গেলে দমননীতিকেই প্রধান অস্ত্র বানায়।

এই বাস্তবতায়, নতুন বন্দোবস্তের পথ রচনা করতে হলে কেবল একটি নির্বাচনের আয়োজন যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন এক নতুন রাজনৈতিক কল্পনা, যেখানে গণতন্ত্র মানে কেবল ভোট নয়, বরং জবাবদিহি, অংশগ্রহণ এবং মতানৈক্যের সম্মান। সে কল্পনা বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কতটা আছে, সেটি নিয়েই এখন সবচেয়ে বড় সন্দেহ।

কাঠামোগত সংস্কারের চ্যালেঞ্জ

নতুন বন্দোবস্ত যদি সত্যিই হয়, তাহলে সেটি হতে হবে ন্যায্যতা, অন্তর্ভুক্তি, ও জবাবদিহির ভিত্তিতে। এর মানে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গ—বিচার, প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন—পুনর্বিন্যাস করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে, নাগরিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে, এবং দলীয়করণমুক্ত নিয়োগ ও মেধা-যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

শুধু রাজনৈতিক কাঠামো নয়, সামাজিক কাঠামোতেও পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থায় দলীয় প্রভাব দূর করা, ধর্ম ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা, ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করা, নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়ানো—এ সবকিছুই নতুন বন্দোবস্তের অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এত বড় একটি রূপান্তর সাধনের জন্য যে ঐকমত্য প্রয়োজন, তা কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিদ্যমান? দলগুলোর সেই উদারতা বা পরিপক্বতা কি আছে?

যদি এই নতুন বন্দোবস্ত পুরানো কাঠামোর ভেতরে চালু করতে চাওয়া হয়, তাহলে তা কেবল নতুন মোড়কে পুরানো খেলাই হবে। একটি নির্বাচন করে যদি আবার সেই একই ধাঁচের শাসন ফেরে, যদি আবার একই ধরনের দমন-পীড়ন দেখা দেয়, যদি আবার দলীয় বিবেচনায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়—তাহলে এই নতুন বন্দোবস্ত এক বিভ্রম হয়ে থাকবে। সেই একই আমলাতন্ত্র, একই প্রশাসনিক মানসিকতা, একই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। যদি সে সংস্কৃতিই না বদলায়, তাহলে মুখ বদলালেও মুখোশ থাকবে একই।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

তাহলে কী হবে এই 'নতুন বন্দোবস্ত'-এর ভবিষ্যৎ? সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দিকটি হলো—নতুন প্রজন্মের একটি অংশ এখন দলীয় রাজনীতির বাইরে গিয়ে গণতন্ত্র ও ন্যায্যতার কথা বলছে। তারা দলীয় পরিচয় নয়, বরং নাগরিক অধিকারকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ভেতরেই জনগণ ভবিষ্যতের আশা দেখছিল। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া সেই ছাত্রনেতাদের প্রতিও জনগণের আগ্রহ ক্রমেই কমে আসছে। তাদের অনেকেই চাঁদাবাজি, অবৈধ প্রভাব খাটানো ও মব মাস্তানিতে জড়িয়ে

পড়ছে। জাতির জন্য এটা দুঃখজনক।

গণআকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর রাজনৈতিক কাঠামোতে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত চাপ। দরকার বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব—যারা কেবল প্রতিবাদে নয়, প্রস্তাবনাতেও সক্ষম। আরও দরকার আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা, যারা স্বার্থ নয়, নীতি-নৈতিকতা ও সুশাসনকেই অগ্রাধিকার দেবে।

সবশেষে, প্রশ্নটা শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিকও। আমরা কি এমন এক রাষ্ট্র চাই—যেখানে প্রতিবাদ মানে মৃত্যু, প্রশ্ন মানে শত্রুতা, আর ভিন্নমত মানে রাষ্ট্রদ্রোহ? যদি উত্তর হয় 'না', তাহলে এই নতুন বন্দোবস্ত কেবল একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি মূল্যবোধের লড়াই। এই লড়াইয়ে জয় পেতে হলে পুরানো বোতল ভাঙতেই হবে। কারণ নতুন চিন্তা পুরানো কাঠামোয় কেবল বন্দি হয়—জীবন্ত হয় না।

বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসের সূচনা হয় প্রবল আত্মবিশ্বাসী একজন যুবকের নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। তিনি পৃথিবীবিখ্যাত বিজয়ী জাতি তুর্কি বংশোদ্ভূত বখতিয়ার খলজি। ইতিহাস যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রাথমিক জীবনের ছন্নছাড়া এক যুবক হিসেবে। বর্তমান আফগান থেকে তিনি শুরু করেন স্বপ্নের যাত্রা।

সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির দরবারে চাকরিতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছুটে আসেন দিল্লির শাসক কুতুব আইবেকের নিকট। এখানেও প্রত্যাখ্যাত হন। বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও দমে যাননি। জীবনযুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখে একটা পর্যায়ে এসে সফলতা অর্জন করেন। সাধারণ সেনার চাকরিজীবন থেকে ক্রমান্বয়ে বিশাল এক অঞ্চলের শাসকে পরিণত হন। অধিকার করেন বিহার ও বিস্তৃত বাংলাভূমি। তারপরও অভিযানযাত্রা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যান তিব্বতের দিকে।

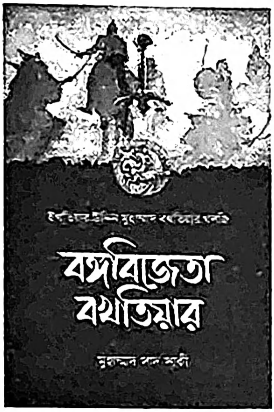

বই : বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার

লেখক : মুহাম্মাদ সাদ সাকী

প্রকাশনা : বাতায়ন পাবলিকেশন

পৃষ্ঠা : ২০০

ধরন : পেপারব্যাক

মুদ্রিত মূল্য : ২৩০

সিরিয়া বিপ্লব : আহমাদ আল-শারার নেতৃত্বে এক নতুন যুগের সূচনা

রাইয়ান আবদুল্লাহ মাকতুম

❝ সিরিয়ার বিপ্লব কেবল একটি দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের চেষ্টাই নয়; বরং এটি ছিল এক অনন্য সংগ্রাম—যেখানে জনগণ স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে শাসকগোষ্ঠীর সব নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করেছিল। এই বিপ্লব বিশ্বকে শেখায়, স্বাধীনতার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা কখনো থামানো যায় না। ❞

— ড. মারওয়ান বিশারা, (আল-জাজিরার আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক)

❝ যখন ইতিহাস লেখা হবে, সিরিয়ার বিপ্লবকে মনে রাখা হবে একটি নিষ্পেষিত মানুষের জেগে ওঠার গল্প হিসেবে। আহমাদ আল-শারা (জুওয়ালানি) ছিলেন সেই কণ্ঠস্বর—যিনি বলেছিলেন : 'আমরা পিছু হটব না, আমরা আমাদের ভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না। ❞

— মুহাম্মাদ আল-শালাফ, (আল-জাজিরা : *The Frontlines of Syria - 2018*)

এক. সিরিয়ার বিপ্লব : পরিবর্তনের সূচনা যেখানে

সিরিয়ার বিপ্লব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা শুধু সিরিয়ার রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাই নয়; বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোতেও পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চরিত্র ছিলেন আহমাদ আল-শারা,[১২২] যার নেতৃত্বে সিরিয়ার জনগণ দীর্ঘদিনের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। আল-শারা শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাননি, বরং তার নেতৃত্বে এই বিপ্লব এমন এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন সাব্যস্ত হতে যাচ্ছে, যেখানে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি এক নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত হবে বলে সবাই আশাবাদী।

আল-জাজিরার সংবাদ বিশ্লেষক মাদিস আল-আল্লামা বলেছেন : 'এই বিপ্লব

---

[১২২] সিরিয়ার বিশুদ্ধভাষী আরবরা যদিও 'আশ-শারা' উচ্চারণ করে থাকেন, তবে আমরা এখানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনুসরণে 'আল-শারা' লিখছি।

শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল না, বরং এটা সিরিয়ার জনগণের মধ্যে একটি নতুন সচেতনতার উন্মেষও ঘটিয়েছে। আহমাদ আল-শারার নেতৃত্বে এই বিপ্লবকে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের অন্যতম মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।'

বিপ্লবের গুরুত্ব বোঝাতে পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবগুলোর নিয়ে গবেষণা করা গবেষক থিওডোর রেনার দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে লেখা তার এক প্রবন্ধে বলেন : 'সিরিয়ার বিপ্লব মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। এই বিপ্লব আমাদের দেখিয়েছে—কীভাবে একটি জনগোষ্ঠী দমনপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, আর আন্দোলন করতে বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের জন্য।'

সিরিয়ার বিপ্লবের পটভূমি একাধিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট। আরব বসন্তের ঢেউ যখন মধ্যপ্রাচ্যে এক এক করে পতন ঘটাচ্ছিল স্বৈরাচারী শাসকদের, তখন সিরিয়াতেও তার স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা একসময় শাসন-পরিবর্তনের দাবিতে পরিণত হয়। এই অভ্যুত্থান নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করা আরেক বিশ্লেষক ফ্রান্সিস হ্যারল্ড দ্য গার্ডিয়ানে লেখা তার এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন : 'সিরিয়ার বিপ্লব আরব বসন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর একটি। এটি কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ছিল না; বরং এটি ন্যায়বিচারের জন্য তোলা বিশাল একটি দাবির প্রতিফলন ছিল। বলাবাহুল্য, এটি গোটা অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।'

বহুমুখী সংকটের এই সময়টাতেই আহমাদ আল-শারা নিজের দীর্ঘ দিনের কৌশল ও সুদক্ষ নেতৃত্বে সিরিয়ার নিপীড়িত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান। একইসঙ্গে এই আন্দোলনের মুখপাত্রও হয়ে ওঠেন। বাস্তবতা তো এটাই যে, তাঁর নেতৃত্বে সিরিয়ার জনগণ এক নতুন যুগের সূচনা করতে চেয়েছিল—যেখানে মানুষজনের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। সবমিলিয়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক নাটকীয় পরিবর্তন আসে। তবে এই বিপ্লবের মধ্যে একাধিক চ্যালেঞ্জ ছিল : একদিকে, জনগণের আস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে প্রচলিত রেজিমকে উৎখাত করার লক্ষ্য ছিল, অন্যদিকে এর মাধ্যমে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংকট ও ধকল সামলানোও চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে—তুরস্ক, আরব লিগ ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও এই বিপ্লবের গতি ও ফলাফল নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে, প্রথমে সিরিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দিকে ফিরে তাকাতে হবে। কেন এই বিপ্লবের জন্ম হলো? কোন কারণে সিরিয়ার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রেজিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যুক্ত হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সিরিয়ার

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাতে হবে—যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রভাবও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দুই. ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

১. সিরিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

সিরিয়া একটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র—যেখানে বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের নানা পরিক্রমা রয়েছে। সিরিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস শুরু হয় আরব শাসনামল থেকে, যখন বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী দেশটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল উমাইয়া ও আব্বাসি খিলাফত; যাদের শাসন সিরিয়াকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। তবে আধুনিক সিরিয়ার রাজনীতি সেদিন থেকে অনেকটাই বদলে যায়, যখন ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী শাসন সিরিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৪৬ সালে সিরিয়া স্বাধীন হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই সিরিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপট অস্থিরতার মধ্যে ডুবে থাকে। একাধিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসনামল হয়ে ওঠে শাসন ও শাসকদের ইতিহাস। বিশেষ করে, ১৯৭০ সালের পর হাফেজ আল-আসাদ সিরিয়ার ক্ষমতায় এসে এক দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তারই পুত্র বাশার আল আসাদ ২০০০ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পরও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় একই রকম থেকে যায়। উল্টো আসাদের শাসনামলে দেশে নাগরিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যাচারের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা ২০১১ সালের বিপ্লবের একটি মুখ্য কারণ ছিল বলা যায়।

সিরিয়ার সামাজিক কাঠামোও চরমভাবে প্রভাবিত হয়। দেশটির সমাজ ধর্ম, জাতি ও রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। সুন্নি মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হলেও সিরিয়ায় শিয়া, আলাবি, কুর্দি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর প্রভাবও কম নয়। রাজনৈতিক শাসনের অধীনে আলাবি গোষ্ঠীর প্রতি আসাদ-সরকারের বিশেষ সমর্থন থাকায় অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হয়। আর সেই ক্ষোভেই একসময় সিরিয়ায় আরব বসন্তের ঢেউ আছড়ে পড়ে।

২. বিপ্লবের সূচনার প্রেক্ষাপট

২০১১ সালের আরব বসন্তের ঢেউ যখন সিরিয়ায় আছড়ে পড়ে, তখন জনগণ আরও জোরালো গলায় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। তুরস্ক, তিউনিসিয়া ও মিশরের পর সিরিয়ার জনগণও বিক্ষোভ শুরু হয়। শুরুতে আন্দোলনটি ছিল শান্তিপূর্ণ, তবে দ্রুতই তা সহিংসতায় রূপ নেয়। বাশার আল আসাদের সরকার তখন আন্দোলনকারীদের

বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে ওঠে। প্রতিবাদকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর হামলা, গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে আরও বেড়ে যায় ক্ষোভ ও উত্তেজনা।

আসলে সিরিয়ায় আসাদের শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সূচনা ছিল দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফল। এই ক্ষোভ জনতার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ও অসন্তোষ তৈরি করেছিল, যা আরব বসন্তের অনুপ্রেরণায় এক বিক্ষুব্ধ বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে দামেশকে ২০১১ সালে শুরু হওয়া বিক্ষোভগুলো, বিপ্লবের প্রথম ধাপ সাব্যস্ত হয়। আলেপ্পো, হামা, হোমস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশগুলোতে পর্যন্ত সরকারের নৃশংস দমন-পীড়ন ও ধর-পাকড় চালায়। এর পর থেকে শুরু হওয়া সিরিয়ার এই বিপ্লব আসলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছিল না শুধু; বরং এটি ছিল একটি বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান—যেখানে সরকার পরিবর্তন, নাগরিক স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছিল জনগণের হৃদয়ের দাবি। তবে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ একসময় সশস্ত্র সংঘাতের দিকে চলে যায়, যার পরিণামও বিপুল জনশক্তি ও দেশের অবকাঠামোগত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

তিন. বিপ্লবের প্রধান দুটি কারণ

১. গণমানুষের বঞ্চনা ও শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন

সিরিয়া বিপ্লবের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি ছিল দীর্ঘদিনের শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন এবং গণমানুষের বঞ্চনা। বাশার আল আসাদের শাসনামলে সিরিয়ার জনগণ মূলত রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। যদিও আসাদ পরিবারের শাসনকালে দেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখেছিল, তবে তা জনগণের জন্য ছিল সামান্য। এই উন্নয়ন শুধু শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকদের জন্য লাভজনক ছিল, আর সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল আগের মতোই, করুণ।

শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যাচারের যে চিত্র তুলে ধরেছিল, তাতে বিরোধী দলের নেতাদের জেল, নির্যাতন ও নির্বাসনের ঘটনা ছিল নিতান্ত সাধারণ বিষয়। বিশেষ করে, ২০০০ সালে বাশার আল আসাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর তখনকার মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েও আসাদ প্রশাসন রাজনৈতিক মুক্তির কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো জনগণের ওপর নিপীড়ন আরও তীব্র হয়। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার ব্যবস্থায় উন্নতির পরিবর্তে জনগণের প্রতি শাসকগোষ্ঠী অবহেলা আরও গাঢ় হয়।

এ ছাড়া অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সাধারণ মানুষ বঞ্চনার শিকার ছিল। চরম

দুর্নীতি, বেকারত্ব ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অভাব, সবমিলিয়ে উন্নতি ও সমৃদ্ধির চিন্তা করার পরিবর্তে সমর্থকরা শুধু নিজেদের প্রমোদ ও অবাধ সুবিধার চিন্তায় তাড়িত ছিল। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি দিনদিন আরও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছিল। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষও বাড়তে থাকে—যা একসময় বিক্ষোভ থেকে বিপ্লবের রূপ নেয়।

২. আরব বসন্তের প্রভাব

আরব বসন্ত ২০১১ সালে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভের ঢেউ, যা সিরিয়া বিপ্লবেরও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত—যখন একে একে তিউনিসিয়া, মিশর ও লিবিয়ার মতো দেশগুলোতে জনগণ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। তিউনিসিয়ার জানুয়ারী বিপ্লব ও মিশরের তাহরির স্কয়ারে সরকারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ এক ধরনের দাবানলের মতো কাজ করে। সিরিয়ার জনগণও এই বসন্ত প্রতিবাদের অংশ হয়, যা বিস্তার লাভ করে সারা দেশে।

আরব বসন্ত সিরিয়ার জনগণের কাছে একটি নতুন দিশার আলো হয়ে ওঠে, যা তাদের অগ্রগতি ও মুক্তির সম্ভাবনা দেখায়। সেই সময় সিরিয়ার প্রতিবাদকারীরা একই দাবির সাথে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করছিল, যেমন—গণতন্ত্র, মুক্ত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের চেতনা। যদিও এটি শুরুর দিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ছিল, পরে তা সহিংস রূপ নেয়, যখন শাসকগোষ্ঠী তাকে দমন করতে শুরু করে।

বিশ্ব রাজনীতির আলোচনায়, বিশেষত আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে—আরব বসন্ত সিরিয়ার গণঅভ্যুত্থানের একটি মূল প্রেরণা হিসেবে দেখা যায়। আল-জাজিরার বিশ্লেষকরা এই মতকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যে, আরব বসন্তের প্রভাব দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। আল-জাজিরার সাংবাদিক মুহাম্মাদ আল-ফাসি বলেছিলেন, 'সিরিয়া, আরব বসন্তের অনুপ্রেরণায় যেমন একটি মুক্তির মিছিল শুরু করেছিল, তা বাস্তবে সরকারের দমন-পীড়ন ও সহিংসতার মুখে পড়েছিল।'

তবে আরব বসন্তের উপস্থাপনাটি শুধুমাত্র সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না, এটি ছিল জনগণের চাহিদার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ—যেখানে মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও প্রগতির তাগিদ ছিল। আর সেই কারণেই সিরিয়ার বিপ্লব আরব বসন্তের পরিণতি হিসেবে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করে।

চার. বিপ্লবের ধাপ এবং সংঘাতের প্রতিধাপ

১. গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সংঘর্ষের ধাপ

সিরিয়ার বিপ্লব শুরু হয়েছিল ২০১১ সালের মার্চ মাসে, যখন দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহরে কয়েকজন কিশোরকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়। কিশোররা সরকারের বিরুদ্ধে একটি গ্রাফিতি লিখেছিল। এই ঘটনা ছিল সিরিয়ার জনগণের জন্য একটি নিদর্শন যে, তারাও সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। এর পরপরই অন্যান্য শহরগুলোতে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়।

ক. প্রথম ধাপ : শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ

প্রথমে সিরিয়ার জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবি পেশ করতে শুরু করে। তারা রাজনৈতিক মুক্তি, মৌলিক মানবাধিকার এবং সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চায়। তবে বাশার আল আসাদ সরকার তাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করতে শুরু করে। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের ওপর গুলি চালায়, আটক করে নির্যাতন চালায়। এই দমন-ভীতি প্রতিবাদকারীদের আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে আর আন্দোলন হয়ে ওঠে আরও তীব্র।

খ. দ্বিতীয় ধাপ : সহিংসতা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ

প্রথম ধাপের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পরবর্তী সময়ে সহিংসতায় রূপ নেয়, যখন সরকার জনগণের ওপর বেশি চাপ সৃষ্টি করে। এতে জনগণও বাধ্য হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। এই সময় থেকেই সিরিয়ার বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে ধাবিত হয়। বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠী—যেমন ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (FSA) সংগঠিত হতে শুরু করে এবং তারা সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গ. তৃতীয় ধাপ : বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ

যতই সংঘর্ষ বাড়তে থাকে, ততই আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে নিজেদের হাত গলাতে শুরু করে। তুরস্ক, সৌদি আরব ও কাতারের মতো দেশগুলো বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেয়। আর রাশিয়া ও ইরান বাশার আল আসাদ সরকারের পাশে দাঁড়ায়। এ ধাপেই সিরিয়া একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, যেখানে একদিকে পশ্চিমা শক্তি ও আরব দেশগুলো আর অন্যদিকে রাশিয়া, ইরান ও হিজবুল্লাহর মতো শক্তিগুলো কাতারবদ্ধ ছিল। আল-জাজিরার বিশ্লেষক ড. মুরাদ আল-জান্দালি বলেন : 'বিপ্লবের এই তৃতীয় ধাপে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে যায়—যেখানে বিভিন্ন দেশ জড়িয়ে পড়ে তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার তাড়নায়।

ঘ. চতুর্থ ধাপ : যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায় এবং সিরিয়ার বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে

ব্যাপক লড়াই শুরু হয়। আলেপ্পো, দামেশক, হোমসসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে গুলিবর্ষণ, বিমান হামলা ও স্থলযুদ্ধ বৃদ্ধি পায়। সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সহিংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, লাখ লাখ মানুষ নিজভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায়, বহু পরিবার তাদের ঘরবাড়ি হারায় আর সারাবিশ্বে সিরিয়ার শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়।

ঙ. পঞ্চম ধাপ : রাজনৈতিক আশ্বাস এবং যুদ্ধের সাময়িক অবসান

বেশ কিছু বছর পর, ২০১৫ সালে সিরিয়ায় যুদ্ধের গতিপথে কিছুটা পরিবর্তন আসে—বিশেষ করে সেটা হয় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের কারণে। সিরিয়ার প্রধান মিত্র রাশিয়া সরকারি বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করে এবং তারা বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর দখলে চলে যাওয়া এলাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সিরিয়ার বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠীও চাপে পড়ে এবং একসময় তারা শান্তির জন্য আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য হয়। তবে যুদ্ধের পুরোপুরি অবসান হয়নি তখনো এবং পরিস্থিতি অস্থিতিশীল রয়ে গেছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল-হাদ্দাদি তার এক প্রবন্ধে লেখেন : 'সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এক কঠিন বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে—যেখানে দেশটির জনগণের জীবন কঠিন হয়ে পড়েছে। যদিও কিছু জায়গায় যুদ্ধ থেমে গেছে, তবে সেখানে শাসন ও শান্তির স্থায়ী সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি।'

২. জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

সিরিয়ার বিপ্লবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সাধারণ জনগণ একযোগে প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। শুরুতে ছাত্র, কর্মজীবী মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি এগিয়ে আসে এবং তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে প্রতিবাদে অংশ নেয়। তবুও শুরুতে এর কোনো সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব ছিল না, এটি ছিল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের পথচলা—যেখানে একসঙ্গে অনেক সাধারণ নাগরিক দাবি তুলেছিল।

যতই সময় গড়িয়েছে, ততই জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে, সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণরা বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তারা সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সব শহরে ছড়িয়ে পড়ে। আলেপ্পো, দামেশক, হোমসসহ অন্যান্য শহরগুলোতে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষার্থী ও যুবক শ্রেণি। এদের মধ্যে ছিল অনেক নারীও—যারা বীরাঙ্গনার মতো এসব প্রতিবাদে অংশ নেয়। যদিও এই অংশগ্রহণ শাসকগোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল, কিন্তু কিছুদিন পর তারা আবারও হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই প্রতিবাদকারীদের ওপর।

হামলা ও গ্রেপ্তার চলতে থাকে। বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন সরকারপন্থী মিলিশিয়া বাহিনী জনগণের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে।

সিরিয়ার বিপ্লবের শেষ ধাপে যখন গৃহযুদ্ধ অবধি পৌঁছায়, তখন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ যুদ্ধশক্তি গড়ে ওঠে। এই শক্তিগুলো সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়। এমনকি অনেক শহর ও গ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে জনগণও সরাসরি যুক্ত হয়ে যায়। জাতিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিপ্লবীরা তাদের স্বাধীনতা এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করতে থাকে।

বিপ্লবের এই ধাপগুলোর মধ্যে জনগণের অংশগ্রহণে দেখা যায়, তারা কখনো শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করে, কখনো সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু সর্বদা তাদের একটাই চাওয়া ছিল—স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও স্বৈরাচারী শাসনের পতন।

পাঁচ. এইচটিএসের নেতৃত্বে দামেশক দখলের অভিযান

১. বিপ্লবের চূড়ান্ত ধাপ

সিরিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিপ্লবের ফলাফল নির্ধারণকারী চূড়ান্ত ধাপ ছিল—হাইআত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)-এর নেতৃত্বে দামেশক দখলের অভিযান। এটি শুধুমাত্র বাশার আল আসাদের স্বৈরাচারী শাসনের পতনের সূচনা করেনি, বরং সিরিয়ার জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাধীনতার প্রতি তাদের অবিচল সংকল্পেরও প্রতীক হয়ে ওঠে।

২. অভিযান শুরুর পটভূমি

২০২৪ সালের শেষ প্রান্তে সিরিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি ক্রমশ বাশার আল আসাদের প্রতিকূলে চলে যায়। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলিত শক্তি এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের অভ্যন্তরীণ চাপে বাশারের বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তার মিত্র রাশিয়ার ইউক্রেনের চোরাবালিতে ফেঁসে যাওয়াটা তাকে আরও দুর্বল করে তোলে। এই সময় আহমাদ আল-শারা তার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে দামেশক দখলের জন্য একটি সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু করেন।

— **কৌশলগত দিক :** বিদ্রোহী বাহিনী দামেশকের বিভিন্ন দিক থেকে প্রবেশের পরিকল্পনা নেয়। উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণের মাধ্যমে শাসকের বাহিনীকে বিভ্রান্ত করা হয়।

— **রাজনৈতিক সহযোগিতা :** স্থানীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও আন্তর্জাতিক মিত্রদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এই অভিযানের ভিত্তি দৃঢ় করে।

৩. অভিযান ও তার ধাপ-পরিধাপ

এইচটিএসের নেতৃত্বে অভিযানটি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং ধাপে ধাপে পরিচালিত। এখানে আমরা সংক্ষেপে ধাপগুলো উল্লেখ করছি :

প্রথম ধাপ : ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে দামেশকের উপকণ্ঠে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রবেশ। স্থানীয় জনগণ বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় ধাপ : ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দামেশকের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল; বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা। এই ধাপে জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় ধাপ : ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্রোহী বাহিনী দামেশকের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করে এবং শেষ প্রতিরোধও ভেঙে দেয়।

৪. আহমাদ আল-শারার নেতৃত্ব : পরিবর্তনের এক নতুন সূচনা

আহমাদ আল-শারা এই অভিযানের শুধু সামরিক নেতৃত্বই দেননি, বরং কৌশলগত ও রাজনৈতিক দিক থেকেও তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। তার নেতৃত্বে বিদ্রোহী বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে এবং সিরিয়ার জনগণের আস্থা অর্জন করে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক রবার্ট স্টোন বলেছেন : 'আহমাদ আল-শারা নিজের নেতৃত্বে একটি অনুপ্রেরণাদায়ক বিপ্লব পরিচালনা করেছেন। দামেশক দখল করার মাধ্যমে তিনি সিরিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।'

৫. স্থানীয় জনগণের ভূমিকা

এই অভিযানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল স্থানীয় জনগণের ভূমিকা। তারা বিদ্রোহী বাহিনীকে খাদ্য, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা দিয়ে সাহায্য করেছিল। শাসকের দীর্ঘদিনের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনগণের এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ তাদের আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৬. দামেশক দখলের গুরুত্ব

দামেশক দখলের মাধ্যমে সিরিয়ার জনগণের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের একটি পূর্ণতা আসে। বাশার আল আসাদ সরকারকে উৎখাত করার মাধ্যমে তারা একটি নতুন শাসনব্যবস্থার সূচনা করে। আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্লেষক লায়লা হাসান এই বিষয়ে বলেন : 'দামেশক দখল ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যা সিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয়ের নতুন সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হবে।'

ছয়. তুরস্কের প্রভাব

১. বিপ্লবী সরকারের প্রতি প্রতিবেশীর ইতিবাচক ভূমিকা

সিরিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্কের ভূমিকা এক আলোকিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই বিপ্লবের প্রতিটি ধাপে তুরস্ক এক বিশ্বস্ত প্রতিবেশীর মতো পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক, কৌশলগত ও রাজনৈতিকভাবে বিপ্লবীদের সহযোগিতা করেছে। অতিশয়োক্তি না হলে বলা যায়—সত্যিকার অর্থেই সিরিয়ার জন্য তুরস্ক তাদের পূর্বপুরুষ উসমানিদের মতোই অসাধারণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

২. তুরস্কের ভূরাজনৈতিক অবস্থান ও অটুট সমর্থন

তুরস্ক ও সিরিয়ার মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে—যা বিপ্লবের সময় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বিপ্লবের শুরুর দিকে সিরিয়ার শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে তুরস্ক এক নজিরবিহীন মানবিক সহায়তা প্রদর্শন করে। আজও ৩০ লাখের বেশি সিরীয় শরণার্থী তুরস্কে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। আল-জাজিরার বিশ্লেষক মাইসুন হান্না বলেন : 'তুরস্ক শুধুমাত্র একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, বরং এটি সিরিয়ার বিপ্লবীদের জন্য শক্তি ও সাহসের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিপ্লবের পুরো সময়টাতে তারা মানবিকতার যে নজির স্থাপন করেছে, তা ইতিহাসে বিরল।'

৩. বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন

আহমাদ আল-শারা নেতৃত্বে সিরিয়ার বিপ্লবী সরকারকে তুরস্ক কৌশলগতভাবে সমর্থন দিয়েছে। বিভিন্ন সময় সরাসরি সামরিক সাহায্যের অভিযোগ উঠলেও তুরস্ক বরাবরই তার ভূখণ্ড থেকে সিরিয়ার বিপ্লবীদের আশ্রয় ও সামরিক পরিকল্পনায় সহায়তা দিয়ে এসেছে। বিশেষত এইচটিএসের নেতৃত্বে দামেশক অভিযানের সময় তুরস্ক বিপ্লবীদের সামরিক প্রস্তুতির জন্য লজিস্টিক ও কূটনৈতিক সহায়তা প্রদান করেছে।

৪. মানবিক সহায়তায় তুরস্কের দৃষ্টান্ত

তুরস্কের সরকার সিরিয়ার বিপ্লবীদের জন্য যে ধরনের মানবিক সহায়তা দিয়ে এসেছে, তা আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় শিবির তৈরি, চিকিৎসা সহায়তা এবং শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তুরস্ক দেখিয়েছে, মানবিকতার শক্তি কীভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

৫. তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতিতে নতুন এক অধ্যায়

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান সিরিয়ার বিপ্লবী সরকারের প্রতি

তার দৃঢ় অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তার বক্তব্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে—সিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকারে থাকবে। আল-জাজিরার বিখ্যাত সাংবাদিক সাফওয়াত সালিম এই বিষয়ে উল্লেখ করেন : 'তুরস্কের সমর্থন ছাড়া সিরিয়ার বিপ্লব এতদূর আসতে পারত না। এরদোয়ানের নেতৃত্বে তুরস্ক সিরিয়ার বিপ্লবী সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাধীনতার লড়াইকে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করেছে।'

৬. ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

তুরস্কের এই মানবিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা ভবিষ্যতে সিরিয়ার পুনর্গঠন এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সিরিয়ার জনগণ তুরস্ককে তাদের প্রকৃত মিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এই সম্পর্ক আগামী দিনে আরও সুদৃঢ় হবে। সার্বিক বিচারে বলা যায়, তুরস্কের ভূমিকার ইতিবাচক দিকগুলো সবাইকে আশান্বিত করছে। আর সিরিয়ার বিপ্লবে তুরস্কের এই ইতিবাচক সহায়তা অব্যাহত থাকলে বহুকাল থেকে অস্থিরতার চাক্কিতে পিষতে থাকা মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত এই ভূখণ্ডে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

সাত. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

১. বিশ্ব রাজনীতিতে সিরিয়ার বিপ্লবের প্রতিধ্বনি

সিরিয়ার বিপ্লব একটি আঞ্চলিক ঘটনাকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল আলোচনায় পরিণত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি ক্ষুদ্র দেশ থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন গোটা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এখানে আমরা পশ্চিমাবিশ্ব থেকে শুরু করে আরব লিগ পর্যন্ত—সবার ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়ার খুবই সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ পেশ করব :

ক. পশ্চিমাবিশ্ব : দ্বৈত ভূমিকার প্রতিফলন

পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রথমদিকে সিরিয়ার বিপ্লবের প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রকাশ করলেও তাদের ভূমিকা ছিল দ্বৈত। একদিকে তারা সিরিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন জানায়, অন্যদিকে তাদের কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো কখনো কখনো বিপ্লবীদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলি আল খাজিম বলেন : 'পশ্চিমা দেশগুলো গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বললেও তাদের প্রকৃত অবস্থান ছিল নিজস্ব স্বার্থরক্ষার দিকে। সিরিয়ার জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য তাদের সহায়তা ছিল অনেকাংশে সীমিত।'

খ. রাশিয়া ও ইরানের ভূমিকা : শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে জোট

রাশিয়া ও ইরান সিরিয়ার বিপ্লবের সরাসরি বিরোধিতা করেছে। বাশার আল আসাদের শাসন রক্ষা করতে তারা সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ শুরু করে। বিশেষ করে রাশিয়ার বিমান হামলা এবং ইরানের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সহায়তা সিরিয়ার বিপ্লবীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ মিডিয়া বিশ্লেষক টমাস ল্যামবার্ট বলেছেন : 'রাশিয়া ও ইরান সিরিয়ার পরিস্থিতিকে নিজেদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তাদের হস্তক্ষেপ বিপ্লবের গতিকে পরিবর্তন করেছে এবং সিরিয়ার জনগণের সংগ্রামের পথ কঠিন করেছে।'

গ. আরব লিগ : দ্বিধাগ্রস্ত ভূমিকা

আরব লিগ সিরিয়ার বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে বাশার আল আসাদের শাসনের নিন্দা জানালেও, তাদের কার্যকর ভূমিকা ছিল অপ্রতুল। সিরিয়ার রাজনৈতিক সংকট সমাধানে তারা কয়েকটি কূটনৈতিক উদ্যোগ নিলেও এগুলো খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। আল-জাজিরার আরব বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাহির আল সাব্বাগ উল্লেখ করেন : 'আরব লিগ তাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সিরিয়ার জনগণের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি।'

ঘ. চীন : নিরপেক্ষ অবস্থানের আড়ালে

চীন সিরিয়ার বিপ্লবে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও, তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে ভেটো দিয়ে আসাদের শাসন টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। এই অবস্থান চীনের আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি অংশ—যেখানে তারা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলে।

ঙ. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলো সিরিয়ার বিপ্লব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিপ্লব চলাকালীন মানবিক সহায়তার অভাব ও শরণার্থীদের দুর্দশা নিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল

বিভিন্ন দেশের এবং সংস্থার ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার ফলে সিরিয়ার বিপ্লব একটি বহুমুখী সংকটের রূপ ধারণ করে। পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বৈত ভূমিকা, রাশিয়া ও ইরানের সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং আরব লিগের নিষ্ক্রিয়তা বিপ্লবের গতি ও ফলাফলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। তবে এটাও সত্য যে, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার এই জটিল পরিস্থিতিসত্ত্বেও সিরিয়ার জনগণ তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।

আট. রূপান্তর, পরিণাম ও প্রভাব

১. বিপ্লবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর

সিরিয়ার বিপ্লব কেবল একটি রাজনৈতিক বিদ্রোহ ছিল না; এটি একটি জাতির ঐতিহাসিক পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠনেরও সূচনা ছিল। আহমাদ আল-শারার নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের মাধ্যমে সিরিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবের ফলাফল ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকেই ছড়িয়েছে—যা একদিকে জনগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে তাদের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি করেছে।

ক. সামাজিক প্রভাব : শরণার্থী সংকট

বিপ্লবের পুরো সময়ের সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের কারণে প্রায় ১৩ মিলিয়ন মানুষ শরণার্থী হিসেবে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, যার ফলে বৈশ্বিক শরণার্থী সংকটের সূচনা হয়। তবে এই বিপ্লব সাধারণ মানুষের মধ্যে এক নতুন আত্মচেতনার জন্ম দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই তাদের অধিকার।

এখন আহমাদ আল-শারার সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, শরণার্থীদের যারা দেশে ফিরে আসছে, তাদের পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

খ. রাজনৈতিক প্রভাব : নতুন নেতৃত্বের সূচনা

আহমাদ আল-শারার নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সরকার সিরিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছে। ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের অঙ্গীকার দেশকে এক নতুন পথে পরিচালিত করছে। বাশার আল আসাদের পতনের মধ্য দিয়ে একদলীয় শাসনের অবসান ঘটেছে। বলা যায়, সিরিয়ার বিপ্লব রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। আর জন্ম দিয়ে একটি নতুন নেতৃত্বের।

গ. অর্থনৈতিক প্রভাব : পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ

যুদ্ধের ফলে সিরিয়ার অর্থনীতি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তেল, গ্যাস ও কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে গেছে—যা দেশটির অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল। এখন সিরিয়ার অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য অপরিহার্য। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আবার সহজও হবে না।

অবশ্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে তুরস্ক, কাতার ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সহায়তা এবং বিপ্লবী সরকারের প্রতি এই দেশগুলোর ইতিবাচক মনোভাব সিরিয়াকে আশার আলো দেখাচ্ছে।

২. সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি : পুনর্গঠনের পথে

আজকের সিরিয়া একটি নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। তবে গৃহযুদ্ধের ক্ষত এখনো গভীর। দেশটির জনগণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে। আর এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর।

নয়. বিপ্লবের বার্তা এবং সিরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ন্যায়বিচার, অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য শুরু হওয়া সিরিয়ার বিপ্লব এখন শুধু একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে নয়, বরং এক নতুন মানবিক চেতনার উন্মেষ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবের বার্তা ছিল স্পষ্ট—যতই কঠিন পরিস্থিতি হোক, জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। এই আন্দোলন শুধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, বরং শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই; যা মানবিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য এক সাহসী সংগ্রামও।

এটি শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, বরং এর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিপ্লবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপ্লবীরা যে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন, তাতে তাদের মানবিক দৃষ্টিকোণটি ছিল স্পষ্ট : তারা একটি উন্নত, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই মানবিক বার্তাটি আজও সিরিয়ার জনগণকে আশার আলো দেখাচ্ছে।

সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি অনেক জটিল। তবে একথা বলাই যায় যে, আগামী দিনের জন্য সিরিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি জনগণ ও সরকার একসঙ্গে কাজ করতে পারে। যদিও এখনো অনেক কাজ বাকি, তবুও সিরিয়ার ভবিষ্যৎ এখনো আলোয় ভরা। সিরিয়ার সরকার যদি জনগণের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে এবং অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুনর্গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তারা তাদের দেশকে শান্তি ও স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকদের মন্তব্য : সিরিয়া যদি রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, একইসঙ্গে আর্থিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ হয়—তবে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে পারে। এই উদ্দেশ্য অর্জনে বিপ্লবী শক্তির ভূমিকা অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

—আল-জাজিরাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষক, সাংবাদিক ও বিশ্লেষকদের প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।

এক ক্লিকে সব খবর, সব দিক...

INN

@INNBANGLA

হাতের মুঠোয় পৃথিবী

ফেসবুকে আমাদের সংবাদ দেখতে ভিজিট করুন :
www.facebook.com/INNPortal

ইতিহাসের আয়নায় বিশ্বভ্রমণ

বাতায়ন
পাবলিকেশন

শপ নং-১৮, কওমী মার্কেট দ্বিতীয় তলা
৬৫/১, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
জিমেইল : batayanpublication2023@gmail.com
ফোন : 01973406304
ওয়েবসাইট : batayanbd.com